ভারতবর্ষ

শ্রাবণ, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

দেশবন্ধুর ব্রত

(বৎসরান্তে স্মৃতি-তর্পণ)

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

বিরাট মনের বিরাট সৃষ্টি—বিরাট জীবনের বিরাট অনুষ্ঠান-মাত্রই অজর ও অমর। তাহা রূপে, রসে, ভাবে, গৌরবে প্রাণশক্তিতে ও সৃজনীশক্তিতে বহুধা বিতত হইয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। বস্তু-জগতে তাহা অনেক সময় ধরিত্রীর ভূষণের রূপ ধারণ করে—কিন্তু মনোজগৎকে তাহা ভাঙিয়া গড়ে। ঐ বিরাট অনুষ্ঠানের যতটুকু আকারে, গঠনে, গুরুত্বে, ও শ্রীসৌষ্ঠবে প্রকট—জনসাধারণ জ্ঞাতসারে ততটুকু বুঝে, ঢের বেশী তারা অজ্ঞাতসারে পায়। কবি, শিল্পী, রসিক ও ভাবুকগণ তাহার রসময় ও ভাবময় স্বরূপটী পান। কিন্তু তাহাতেও উহার সার্থকতার পরিমাণবোধ নিঃশেষিত হয় না। দার্শনিক ও ঐতিহাসিকগণ দেখেন তাহার প্রাণশক্তি, সৃজনীশক্তি বহু শাখায় প্রবাহিত হইয়া দেশে ও কালে—দূর ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত হইয়া জাতীয় জীবনকে কিরূপে ভাঙিয়া গড়িতেছে—দেশের ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি ও সমাজদেহের নাড়ী-ধাতুকে কিরূপে বিবর্ত্তিত করিতেছে।

মোগল ভারতের বিরাট অনুষ্ঠান,— প্রেমিক সম্রাটের বিরাট উৎসর্গ মর্ম্মর-রূপ ধরিয়া তাজমহলের সৃষ্টি করিয়াছে। তিন শতাব্দী ধরিয়া উহা ধরার রম্য ভূষণ স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। উহাতে পর্য্যটক, পরিব্রাজক, প্রেমিক, রসিক ও শিল্পী স্ব-স্ব আদর্শের চরিতার্থতা দেখিয়া আনন্দ পান। কিন্তু উহাতেই উহার সার্থকতা পরিচ্ছিন্ন নয়। তাহার রসরূপ, স্বপ্নরূপ কবির লেখনীকে, চিত্রকরের তুলিকাকে ও ভাস্করের ছেদনীকে যুগে যুগে নব নব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে প্রণোদিত করিতেছে। শিল্পীর মনে ভাবময় আদর্শরূপে বিরাজ করিয়া তাহাকে শুধু দ্রষ্টা মাত্র নহে, স্রষ্টাও করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতেও বিরাট অনুষ্ঠানের বিরাটত্ব পরিমেয় হইয়া উঠিল না।

সম্রাট-কবি এই তাজমহল গঠনের জন্য যে দূরদূরান্ত, দেশদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র শিল্পীকে একত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক একজন ধীমান্ বা বিট্পাল ছিলেন না। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর অধীনে অসংখ্য কারুকর আদেশ পালন করিত। ফলে এই বহু-বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানটি কেবলমাত্র তাজমহল সৃষ্টি করে নাই, সহস্র সহস্র শিল্পীকেও সৃষ্টি করিয়া দেশে দেশে প্রেরণ করিয়া শিল্পজগতে একটা যুগান্তর আনিয়াছে। তাজমহল একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়,—মোগলযুগের নালন্দা।

এইরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় চিত্তরঞ্জনের বৈচিত্র্যময় কর্ম্মঘন, রসনিবিড়, ভাবসংহত বিরাট জীবন। ইহা বাঙালীর চিত্তকে ভাঙিয়া গড়িয়াছে। এক দিন চিত্তরঞ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙিতে গিয়াছিলেন,—ভাঙা হয় নাই,—ভালই হইয়াছে; কারণ তাহাতে মন্দের সঙ্গে অনেক ভালও বিধ্বস্ত হইত। চাপ-বলে তিনি যাহা করিতে পারিতেন, তপোবলে তাহা হইতে ঢের বেশী করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-রূপ বিদ্যাপীঠের ছাত্র হইতে হইলে ঐ নিম্নতর বিদ্যাপীঠও চাই। তাঁহার জীবন-বিদ্যালয়, আমাদের শিক্ষার যাহা কিছু অসংস্কৃত, অমার্জ্জিত, বিকৃত, শূদ্রভাবাপন্ন,—হীন ও বিজাতীয়—সে সমস্তকে পরিশুদ্ধ, মার্জ্জিত, পবিত্র ও আমাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। উভয় শিক্ষায়তন পরিপূরক-পরিপূর্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই আজ মনে হয় চিত্তে বাণীর আসনপদ্ম বিকাশের জন্য দেশবন্ধুর জীবন-সূর্য্যের কিরণ চাই—নতুবা মনোমৃণাল কেবল মরালের পদভারেই ন্যুব্জ হইয়া নীরতলেই মগ্ন রহিবে। সমগ্র বিনিয়োগ না জানিলে শরভারাক্রান্ত তূণ কেবল মেরুদণ্ডকে ন্যুব্জই করিবে। এই বিনিয়োগ বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র চিত্তরঞ্জনের জীবন-বিদ্যালয়। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" মেধা, বিদ্যাবুদ্ধি, বহুশ্রুত ও প্রবচনে লাভ কি, যদি আত্মশক্তি লাভই না ঘটে? আত্মা ত "বলহীনেন লভ্যঃ" নয়। চিত্তরঞ্জনের জীবন এই আত্মশক্তি লাভের ব্রহ্ম-বিদ্যাশ্রম। জাতীয় শিক্ষায়তন তিনি গড়িয়া যাইতে পারেন নাই—এ কথা স্থূল-দর্শীরাই বলিবে। বিজ্ঞেরা জানেন তাঁহার জীবনই সেই শিক্ষায়তন। তাঁহার জীবনের ব্রতটিকে বিশ্লেষণ করিলেই এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন ত্যাগী, দানবীর। কিন্তু তাঁহার উৎসর্গে এমনি একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে, এ বিষয়ে কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা চলে না। তাঁহার উৎসর্গ-ধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা লক্ষ্য করি :—

(১) তাঁহার যশোলোভ ছিল না, অপযশকেও তিনি ভয় করিতেন না। তাঁহার অধিকাংশ দানই গোপনে সম্পাদিত।

(২) পিতৃঋণ-ভার-ন্যুব্জ-স্কন্ধে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন—তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সমস্তই তাঁহার স্বোপার্জ্জিত।

(৩) এই আকণ্ঠ ভোগমগ্নতার যুগে তিনি সৌভাগ্যের সমস্ত লোভনাস্বাদন লাভ করিয়াও সর্ব্বস্ব বর্জ্জন করেন।

(৪) ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা তাঁহার দান-ধর্ম্মের প্রকৃতিকে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন করে নাই।

(৫) দানে তিনি বে-হিসাবী ছিলেন, টাকা গুণিয়া দান করিতেন না—দানের হিসাব রাখিতেন না—নিঃসম্বল হইয়াও দান করিতেন—ঋণ করিয়াও দান করিতেন। দানে মাত্রাজ্ঞান, পৌর্ব্বাপর্য্যবোধ বা যোগ্যাযোগ্য বিচার কিছুই ছিল না।

(৬) প্রার্থীর প্রার্থনার আংশিক পূরণ করিয়াই তুষ্ট হইতেন না।

(৭) জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে দান করিতেন।

(৮) বিনাসর্ত্তে বিনা বাধ্যবাধতায় দান করিতেন—গ্রহীতা কোনরূপে লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ না করে সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

(৯) উদারতার দ্বারা চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে ও সৎপ্রবৃত্তি উদ্বোধনের আশায় অতিবড় পাষণ্ডকেও আশ্রয় দান করিতেন।

(১০) সন্তানগণকে সমগ্র ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। সন্তানবৎসল পিতার পক্ষে ইহা নির্ম্মম আত্মোৎসর্গ।

(১১) দান করিতে পাইলেই আনন্দ অনুভব করিতেন—দানান্তে স্বর্গীয়ানন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়া জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া যাইত।

(১২) কোন দৈবী-শক্তির প্রত্যাদেশে বা কোন

দৈবীশক্তি-সম্পন্ন নরদেবতার অনিবার্য্য প্রভাবেই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন নাই।

(১৩) দানের জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার দাবী ছিল না—অকৃতজ্ঞতার জন্য কখনো আক্ষেপ করেন নাই—কে কি সাহায্য পাইয়াছে তাহা তাঁহার মনেও থাকিত না।

অর্থাৎ তিনি নিঃসম্বল হইয়া ঋণ করিয়াও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, বিনা সর্ত্তে, বিনা চুক্তিতে, বিনা যুক্তিতে, প্রতিদান, কৃতজ্ঞতা, যশ বা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা না করিয়া, প্রাণপ্রিয় সন্তানকে ও পরিজনগণকে বঞ্চিত করিয়া, সম্পূর্ণ স্বোপার্জ্জিত ধন নির্ব্বিচারে, প্রফুল্ল চিত্তে, লীলাচ্ছলে দান করিয়াছেন। স্বেচ্ছাশোধ্য পিতৃঋণ পরিশোধে মহৎ জীবনের আরম্ভ, বিশ্বের ঋণ পরিশোধ করিতেই যেন তাঁহার জীবন। তাঁহার দান ও উৎসর্গ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিল না—দৈবীশক্তি বা গুরুমন্ত্রের প্রত্যাদেশে তাঁহার ত্যাগলিপ্সা জন্মে নাই। উদার প্রেমে মুক্তহস্তে তিনি আনন্দের সহিত বিত্তের বিনিময় করিয়া গিয়াছেন।

কেবল করুণায় বিগলিত হইয়াই তিনি দান করেন নাই। দয়ালু, প্রার্থীকে দান করেন বটে, কিন্তু নিজেকেও একেবারে বঞ্চিত করেন না। অপরের দুঃখ নিবৃত্তি অপেক্ষা আপনার অন্তরের কারুণ্যগত বেদনা-নিবৃত্তির দিকেই তাঁহাদের অধিকতর দৃষ্টি থাকে। সেই বেদনার গাঢ়তার অনুপাতে দানেরও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়। দয়ালু হৃদয়ের সংসারযাত্রায় ইহা অবশ্য-করণীয় ব্যয়—মায়ামুগ্ধ মহাপুরুষের ইহা বিধিনির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড। দুঃখরাজের চরণে রাজভক্ত প্রজা এ রাজস্ব দিতে বাধ্য। এ দানের অন্তরালে অর্থের প্রতি মমতার অভাব নাই।

চিত্তরঞ্জন পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যও দান করেন নাই। যাঁহারা পুণ্যলোভে দান করেন, তাঁহাদের ত্যাগও এক প্রকারের ভোগ—তবে এ ভোগ দেহের নয়,—আত্মার; এর পুরস্কার শুষ্ক যশ নয়,—সরস পুণ্য। নিস্পৃহ চিত্তরঞ্জনের পুণ্যফলেও লোভ ছিল না। প্রকৃত বৈষ্ণবের মতই তিনি বলিতে পারিতেন—"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ" কিছুই আমি চাহি না—আমি চাই "পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন।" চিত্তরঞ্জনের দানের লক্ষ্মী ছিল করুণা—কিন্তু তাঁহার দানসত্রের অন্নপূর্ণা ছিল অর্থে নিস্পৃহতা। দেশবন্ধুর এই অর্থে নিস্পৃহতা—আত্মপ্রসাদ, স্বর্গীয় সুখ-লালসা বা পুণ্যপিপাসা হইতেও উচ্চতর সাধনান্তরের প্রেরণা—করুণা হইতেও গরীয়সী। ভক্তমালের সনাতন,—"যে ধনে ধনী হইয়া মণিরেও মণি গণনা করেন নাই", তাহারি খানিক তিনি পাইয়াছিলেন। ইহা সেই তপোলভ্য নিষ্কামতারই অভিব্যক্তি, যে নিষ্কামতার সঙ্গে শকুন্তলাকে বিদায় দিবার সময়, মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছিলেন,—"জাতো মমায়াং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।" চিত্তরঞ্জন তাঁহার দানকে গচ্ছিত-ধন-প্রত্যর্পণ-স্বরূপ মনে করিতেন।

নিস্পৃহ চিত্তরঞ্জন শেষে বুঝিলেন—অর্থে মানবের চরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না—উহা দানেরও যোগ্য নহে—আদানেরও যোগ্য নয়। কিন্তু উৎসর্গই যাঁহার সংসারাশ্রমের মূল বন্ধন, তিনি উৎসর্গ না করিয়া থাকিবেন কি করিয়া? তাই যাহা কিছু অসার তাহাকে দানের অযোগ্য ভাবিয়া যাহা কিছু মানব-জীবনের সার, পবিত্র ও অমর, তাহাই দান করিতে লাগিলেন। রঘু যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করিলেন, তখন নিঃস্ব রঘুর দ্বারে এলেন প্রার্থী হইয়া কৌৎস। রাজপ্রাসাদে একখানিও তৈজসপত্র নাই, তাই মৃৎপাত্রে রঘু অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিলেন—সেই মৃৎপাত্রের অর্ঘ্যই রঘুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

নিঃস্ব দেশবন্ধু আত্মার দানসত্র খুলিলেন—তিনি দান করিলেন দেহমনের সকল সুখ—নিদ্রা-সুখ—অশন-সুখ—বসন-সুখ। উৎসর্গ করিলেন—নেত্র, শ্রুতি, রসনা, কণ্ঠ, অঞ্জলি, দুটী বাহু—এক কথায় সমগ্র দেহ। সমর্পণ করিলেন, তাঁহার শক্তি-ভক্তি; ধ্যান-স্বপ্ন, চিন্তা-চেষ্টা, শিক্ষা-দীক্ষা, সমগ্র সত্তা—ইহ-জীবনের সর্ব্বস্ব। বিরাট পুরুষের সবই বিরাট। এই বিরাট উৎসর্গেই চিত্ত-শিক্ষায়তন গঠিত।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসে তিনি ছিলেন আদর্শ হিন্দু—হিন্দুধর্ম্মের অন্তরাত্মার শাশ্বত প্রকৃতিরই সন্ধান পাইয়া, তিনি তাঁহার নখচুল চর্ম্ম বা খোলস লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁহার মতে কয়েকটি আচার, অনুষ্ঠান, সংস্কার বা রীতিপদ্ধতিতেই ধর্ম্ম পর্য্যবসিত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নীরস ন্যায়শাস্ত্রও তাঁহাকে তৃপ্ত করে নাই। বহিরঙ্গের শুদ্ধি অপেক্ষা চিত্ত-শুদ্ধিকেই তিনি বড় মনে করিতেন। তিনি জানিতেন,—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।" সহস্র তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার

মধ্যে তিনি ভূমাধনের সন্ধান করিয়াছেন—তাঁহার কাব্যে ও জীবনে এই সন্ধানই মূলসূত্র। এই অমৃতধনের সন্ধান করিতে তাঁহাকে শুদ্ধাশুদ্ধি, উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার না করিয়াই এমন অনেক ক্ষেত্রে যাইয়া পড়িতে হইয়াছে—যেখান হইতে ঋতম্ভর সত্যরক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারো উদ্ধার নাই।

তিনি জানিতেন "রসো বৈ সঃ"—তাই রসবর্জ্জিত কোন উপাসনাই তাঁহাকে তৃপ্ত করে নাই। আদর্শ হিন্দু মনের দুর্দ্দম মুমুক্ষুতা তাঁহার সমস্ত সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে—এই মুমুক্ষুতাই তাঁহাকে দেশের মুক্তির জন্য অস্থির করিয়াছিল।

সত্ত্ব ও রজোগুণের অপূর্ব্ব মিলনে তাঁহার আদর্শ ভীমকান্ত ধীরোদাত্ত জীবন গঠিত। একেবারে—

True to the kindred points of heaven and home.

শঙ্খগদায়, দীপক এবং মল্লারে।
সন্ধ্যারাগে চন্দ্রিকাতেও রক্তজবা কহ্লারে।

অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল তাঁহার জীবনে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আদর্শ বাঙালীর স্বপ্ন মূর্ত্ত হইয়াছিল চিত্তরঞ্জনে। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির অপূর্ব্ব সংহতি—চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণোৎকর্ষ তাঁহাকে যুগাবতার—জাতীয় জীবন-গঠনের প্রজাপতি—জাতীয় যুগে একাধারে হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পর-বিরোধী ভাব ও বৃত্তিনিচয়ের এরূপ অপরূপ সামঞ্জস্য এ যুগে অন্য কোন জীবনে দৃষ্ট হয় না।

নিস্পৃহ চিত্তরঞ্জন নিজ ব্রতে, সাধনায় ও তপস্যায় এমনি তদ্গত ছিলেন যে, ঐহিকতার বা দৈহিকতার প্রতি তাঁহার কোন মমতাই ছিল না। জানিতেন,—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তু মা ফলেষু কদাচন।" তাই যোগক্ষেমের জন্য চিন্তা করেন নাই—জানিতেন "যোগক্ষেমাং বহাম্যহং" যিনি বলিয়াছেন, তিনি সতত যোগযুক্তগণকে প্রবঞ্চনা করেন নাই।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ" এই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম তিনি বুঝিতেন। জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যতীত স্বধর্ম্ম পালন হইতে পারে না। সেজন্য তিনি নিধনও বরণ করিয়াছেন, তবু পরধর্ম্মের সহিত সন্ধি করেন নাই। তাই বলি, দেশবন্ধু যদি হিন্দু নহেন—তবে কি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনই যাঁহাদের উপাস্য দেবতা, বল্লাল সেনই যাঁহাদের চিত্তলোকের সম্রাট, তাঁহারাই প্রকৃত হিন্দু ?

তিনি ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব—'তৃণাদপি সুনীচ, তরোরিব সহিষ্ণু, অমানিনে মানদ।' অহিংসায় রতি ছিল। নাম কীর্ত্তনে মতি ছিল—বৈষ্ণবের ক্ষমা তিতিক্ষা তাঁহার ছিল,—রঘুনাথের মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্যই কেবল তাঁহাকে প্রকৃত বৈষ্ণব বলিতেছি না। তাঁহার বৈষ্ণবতা কেবলমাত্র ভাবাবেশে, প্রেমাশ্রুপাতে ও রসমগ্নতায় পর্য্যবসিত হয় নাই। শ্যামের মুরলীরব তাঁহাকে চঞ্চল করিয়াছিল—এই চিরশ্যামবঙ্গদেশে তিনি সৌম্যশ্যামের ভৌমরূপ দেখিয়াছিলেন—এই শ্যামদেশই শ্যাম বেশ ধরিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল। চণ্ডীদাসের রাধার মতই তিনি অভিসারেই ছুটিয়াছেন—কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়া। এই অভিসার-পথ শ্রাবণধারায় পিচ্ছিল, কণ্টকময়, তমসাচ্ছন্ন অহিসঙ্কুল, কিন্তু অনন্যলক্ষ্য, শ্যামগতপ্রাণ, আত্মহারা মিলনাগ্রহ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। এই যে প্রেমের জন্য আত্মবিলোপ—এই যে তদীয়তায় মদীয়তার বিসর্জ্জন,—এই যে অকৈতব অহৈতুক প্রীতি—ইহাই দেশবন্ধুকে প্রকৃত বৈষ্ণব নামের যোগ্য করিয়াছে। এক দিন বাঙালীর চিত্তই ব্রজভূমি গড়িয়াছিল, আজ আবার বাঙালীর 'চিত্তই' নবব্রজভূমি গড়িয়া গেল। চিত্তরঞ্জনের ধর্ম্মজীবন গৌড়বঙ্গে নবচৈতন্যচরিতামৃত। উহাই চিত্তবিদ্যাপীঠের ধর্ম্মতত্ত্ব। চিত্তরঞ্জন ধর্ম্মকে কর্ম্মের মধ্যে জীবন্ত করিয়া জীবনের সাধনায় সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া যেমন ধর্ম্মগুরু, কাব্যের সহিত সাধনার যোগ সাধন করিয়া এবং স্বপ্নকে সত্য রূপ দান করিয়া তেমনি সাহিত্যগুরু।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন কবি, বঙ্গদেশের প্রাচীন ভক্ত কবিগণের নিকট তাঁহার রসদীক্ষা। স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও সাধকতার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সেজন্য চাতুর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যের প্রতিই তাঁহার অধিকতর লোভ ছিল। তাঁহার কাব্য 'বিলাস কলাস্বকুতূহল' চরিতার্থ করিবে না। তিনি নূতন কোন ভাবধারা, রচনাভঙ্গী বা রসবিলাসের প্রবর্ত্তক নহেন। কিন্তু তিনি ত শুধু কাব্যরচনা করেন নাই—তিনি নিজেই ছিলেন শরীরী কাব্য, মূর্ত্তিমান ছন্দোমাধুর্য্য। তাঁহার চিন্তা, চেষ্টা, স্বপ্ন, জাগরণ, হাস্য, দৃষ্টিগতি, তাঁহার প্রতি রক্তকণা ছিল কবিত্বময়। ছন্দে বলিতে গেলে বলিতে হয় :—

ভক্তরসিক চিত্ত তোমার সজীব চির তারুণ্যে
জীবন তোমার কাব্য-সরস রামায়ণের কারুণ্যে।
অশ্রু প্রাবৃট কাব্য মরণ জিনেছে সে মেঘদূতেও,
কায়মনোবাক্ কর্ম্মে কবি অমর কবি মৃত্যুতেও।
তোমার জীবন কাব্যখানি ভারতবাণীর কণ্ঠহার,
স্বর্গারোহণ সর্গটি তার অন্তে চরম চমৎকার।
এ যে সত্তোজাগ্রতদের জীবন-ঊষার নবীন বেদ
মুক্তি বোধন সূক্তে ভরা এর প্রতি ভাগ পরিচ্ছেদ।

জীবনে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে—রচনায় যাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা যদি সামান্যই হয়—তিনি জীবনে যে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছেন তাহা অসামান্য। মরণেও তিনি বঙ্গভারতীর ভাণ্ডারকে অশ্রুমৌক্তিকে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন উদয়ন কথার ন্যায় তাঁহার কথা যুগে যুগে নবনব কাব্যের জন্ম দান করিবে।

জীবনের সমগ্র লীলা ও স্বপ্ন-বৈচিত্র্যকে একত্র করিয়া বিচার করিলে তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ কবি জগতেও দুর্লভ। তিনি কবিত্বের অভিনয় করিতে জন্মান নাই। যে ধ্যানময়, ভাবময় মুহূর্ত্তগুলি কবি-জীবনে মাঝে মাঝে প্রবুদ্ধ হয় মাত্র, সেই মুহূর্ত্তগুলি নিরন্ধ্র, নিরন্তরাল ভাবে ঘনীভূত হইয়া তাঁহার আয়ুষ্কাল রচনা করিয়াছে। তিনি ছিলেন কাব্য-সরস্বতীর বহিশ্চর রূপময় মূর্ত্তি। তাই তাঁহার জীবন মরণের অপূর্ব্ব মহাকাব্য 'চিত্তবিদ্যাপীঠের' অধিতব্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

নদী যেমন এক কূল ভাঙে অন্য কূল গড়ে—তিনিও তেমনি রাষ্ট্রনীতির এক দিক ভাঙিয়া অন্য দিক গড়িয়াছেন। স্বরাজ প্রাপ্তির বাধাগুলিকে যেমন একহাতে ভাঙিতে চাহিয়াছেন—অন্যহাতে তেমনি ঐ স্বরাজলাভের উপযুক্ত জীবন ও মন গড়িয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্রে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে, উপদেশে, আদেশে, অনুরোধে, সেবাব্রতে, নেতৃত্বে, চুক্তিতে, নানা ভাবে নানা রূপে তাঁহার সৃজনীশক্তি জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছে।

চিত্তরঞ্জনই প্রথম জাতীয় আন্দোলনের নগর-সঙ্কীর্ত্তনকে নগর ছাড়িয়া পল্লীর পথে পথে লইয়া যান মৃদঙ্গ-নিনাদে সবার সুপ্তি ভাঙাইয়া। সরকারের দুয়ারে সারাদিন কড়া না নাড়িয়া তিনি মাটীর খাঁটী মালিকদের দ্বারে দ্বারেই করাঘাত করিয়াছেন। নগরের সহিত পল্লীর নূতন করিয়া যোগসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছেন। বাঙ্‌লা দেশ নগর-সর্ব্বস্ব নহে, উহা পল্লীসংহতি—এ কথা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার রাজনীতি-চর্চ্চা বিলাতীর অনুকরণ মাত্র নহে—উহা বাঙালীর নিজস্ব প্রজানীতি চর্চ্চা।

আগেকার দেশপ্রীতি জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত ছিল না—কঠোর ব্রতে উহা সত্য-রূপও ধরে নাই। উহা ছিল বাক্‌সর্ব্বস্ব, নানা ভঙ্গীর অভিনয় মাত্র,—রসনা ও লেখনীর বিলাস, অবসর-কাল বিনোদের জন্য শুষ্ক যুক্তির খেলা, যশ উপার্জ্জনের প্রক্রিয়া এবং তর্কশাস্ত্র ও সাহিত্যালঙ্কারের অঙ্গ স্বরূপ। দেশবন্ধু দেশপ্রীতির বাঙ্ময় রূপকে প্রথম চিন্ময় রূপ দিলেন,—যাহা বিলাসমাত্র ছিল তাহাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার মত স্বাভাবিক জীবন-ধর্ম্ম করিয়া তুলিলেন। খেলাকে কর্ম্মের ঘর্ম্মে গলাইয়া দিলেন। যশ অর্জ্জনের প্রয়াসকে অযশ সহ্য করিবার ক্ষমতায় পরিণত করিলেন—আর যাহা ছিল সাহিত্যের অলঙ্কার তাহা হইল কারার শৃঙ্খল। আর যাহারা দেশপ্রীতির অভিনয় করিয়া করতালির সাধুবাদ লাভ করিত—তাহাদের কাহারো দাড়ী, কাহারো পরচুলা, কাহারো জটা, কাহারো রাজবেশ ধরিয়া টান দিয়া তাহাদের কদর্য্য রঙমাখা সঙসাজা, ন্যক্কারজনক মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন। সব ভূয়ো ভণ্ডামি ফাঁকী ঝুঁটো জাল যেখানে যা ছিল, ধরা পড়িয়া গেল।

এক হিসাবে পূর্ব্বের আন্দোলনকে রাজনীতি বলা যাইতে পারে ; কারণ উহা রাজার দ্বারাই নীত হইত। রাজাই ছিলেন সে সকলের প্রবর্ত্তক—প্রজার অন্তর হইতে উহা উঠিত না। সরকারের বেত্রাঘাত অথবা বিলাতী কাগজের লেখনীর আঘাতে উহার জন্ম হইত। বাংলা বিভাগ হইতে জালিয়ানাবাগ পর্য্যন্ত একই প্রথা। এ আন্দোলন তত দিনই চলিত, যত দিন না সরকার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেন ; অথবা যত দিন না রসনা ক্লান্ত হইয়া পড়িত। বাহিরের উত্তেজনার অপেক্ষা না করিয়া অন্তর হইতে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার লাভের জন্য যে আন্দোলন—দেশবন্ধুই তাহার প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এ আন্দোলন সাময়িক নহে, ইহা জাতীয় জীবনের চিরসহচর। প্রকৃত দেশাত্মবোধের প্রেরণায়

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্দীপনায় যে আন্দোলন, তাহা আত্মার প্রতি মুহূর্ত্তের সাধনা—তাহা জীবনের তপস্যা—তাহাতে বিশ্রাম নাই—ক্রমভঙ্গ নাই—সন্ধি নাই—সর্ত্ত নাই। চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধের সাধনা মানবতার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা লাভের জন্য তপস্যা, দাস জীবনের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির জন্য সাময়িক আন্দোলন মাত্র নহে। যিনি শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে সর্ব্বদাই অঙ্গে শৃঙ্খলভার অনুভব করিতেন, তাঁহার সাধনাকে রাজনীতিক আন্দোলন মাত্র বলিলে মানবাত্মার দৈবী প্রেরণারই অমর্য্যাদা করা হইবে। তিনি জানিতেন ভিক্ষায়, শাঠ্যে বা ভয় প্রদর্শনে ঐহিক ঋদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে, স্বরাজসিদ্ধি মিলিবে না।

তিনি জানিতেন, "স্বরাজ সুরু আত্মা হতেই আত্মাতে; তাই শক্তি চাই, মসীর বলে অসির বলে পেশীর বলে মুক্তি নাই।" তাই তিনি স্বরাজ চাহিয়াছেন স্বজাতিরই কাছে। তিনি স্বরাজ ভিক্ষা করিয়াছেন দেশের লোকের কাছে। পররাজ হাতে তুলিয়া স্বরাজ দিতে পারে না—স্বরাজ দেশের লোকের মনেই ভ্রূণাবস্থায় রহিয়াছে। দেশের লোক সমবেত শক্তি দিয়া ত্যাগ ও সংযমের সাহায্যে তাহাকে পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলুক—ইহাই দেশের কাছে ভিক্ষা। সরকারের কাছে প্রার্থনা,—তাঁহারা যেন আসন্ন-জন্মা জাতককে কংস বা হেরোদের চক্ষে না দেখেন।

কেহ কেহ বলেন—চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ সাধনার পথটি ঠিক নহে। কিন্তু স্বয়ং ভগবান না বলিয়া দিলে কোনটি ঠিক পথ তাহা ধরা যে কঠিন তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে না। ঠিক পথটি কি জানিতে হইলে বেঠিক পথগুলি কি তাহাও জানিবার প্রয়োজন আছে। বেঠিক পথের সংখ্যা পরীক্ষার দ্বারা যত কমিয়া আসিবে, ঠিক পথের সন্ধান ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। ইহাকেই বলে 'তৎ—ন' 'তৎ—ন' সন্ধান। তৎ—ন, তৎ—ন, নেতি—নেতি করিতে করিতেই 'তদদ্রে' পৌঁছান যাইবে। দেবতার প্রত্যাদেশ না পাইলে এই প্রথা ছাড়া গত্যন্তর কি? সে যত ভুলই করুক 'টিকিমুণ্ডে চড়িয়া' তার যত ভুলই ধরুক, মৃগ্যদ্রব্য সেই একদিন পাইবে যে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছে। "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"। ইহা ছাড়া স্বরাজলাভের পথটি তাঁহার ভুল হইতে পারে, কিন্তু স্বরাজলাভের দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষায় ও মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগাত্মিকা তপস্যায় ত আর ভুল নাই। মুক্তিকে যাঁহারা তপস্যালভ্যা মনে করেন, তাঁহারা এই তপস্যাকে নিষ্ফল মনে করিতে পারেন না। প্রাণের যে ব্যাকুলতম মুমুক্ষুতা—দেশবন্ধু দেশের চিত্তে জাগাইয়া দিয়াছেন—তাহা ত ভ্রান্ত নহে—অসত্য নহে—স্বপ্ন বা মতিভ্রম নহে এবং ইহা ব্যর্থ হইবারও নয়। তাঁহার চেষ্টায়, চিন্তায় ও কার্য্যপ্রণালীতে যতই ভ্রান্তি থাকুক, তিনি সাধনার মন্ত্র দিয়াছেন ও দীক্ষিতগণের অনুসরণীয় করিয়া গিয়াছেন,—পথিকগণকে উৎসাহ-দীপনা ও অনুপ্রাণনার সহিত যথেষ্ট পাথেয় দিয়া গিয়াছেন—প্রত্যাসন্ন স্বরাজের ভার বহন করিবার যোগ্য শক্তি তিনি বাহুতে বাহুতে সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন।

শত্রুপক্ষ জিজ্ঞাসা করে, তাঁর আন্দোলনে কি লাভ হইয়াছে? দেশবন্ধুকে পরাজিত করিবার জন্য রাজপুরুষ-গণের উৎকণ্ঠা ও প্রাণপণ চেষ্টা, বিদেশী সংবাদপত্রের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও দেশের লোকের অপূর্ব্ব জয়োল্লাস হইতে বোঝা উচিত—কি লাভ হইয়াছে দেশবন্ধুর বিজয়ে। কিন্তু চিত্তের সাধনার ফল চিত্তলোকেই খুঁজিতে হইবে। বাঙালীর চিত্তে আত্মবল, আত্মপ্রত্যয়, নির্ভীকতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কি বাড়িয়া যায় নাই? শূদ্রভাব, জড়তা, অবিশ্বাস, গতানুগতিকতা, অমূলক সঙ্কোচ ও ভয় কি অনেকটা দূর হয় নাই? বাঙালী বাক্য অপেক্ষা কর্ম্মকে বড় মনে করিতে, ঐক্য ও সংহতির মূল্য বুঝিতে, ব্রতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে, আদর্শের জন্য স্বার্থবলি দিতে—রাজপ্রসাদের প্রলোভন জয় করিতে—সংঘের ইচ্ছার শাসনে আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে—সত্যের জন্য পারিবারিক জীবনকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে—আপনাদের জাতীয় অধিকার ও মনুষ্যত্বের দাবী বুঝিতে ও সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলার মূল্য বুঝিতে শিখিয়াছে। বাঙালী যাহা পাইয়াছে তাহা তাহার ওজঃ তেজঃ রস ও রক্তে, জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে—পৃথক্ করিয়া তাহা দেখান যায় না।

স্বরাজ মিলে নাই বটে,—কিন্তু দেশবন্ধু স্বরাজের পথে আমাদের মনকে অনেকটা আগাইয়া দিয়াছেন। যদি কখনো স্বরাজের সরোজ ফুটে, তবে তাহা অনন্তশয়নে শায়িত চিত্তরঞ্জনের নাভিমৃণালেই ফুটিবে।

চিত্তরঞ্জন চিত্তলোকের সম্রাট হইলেন কিসে? কেবল

কি ত্যাগ বলে? তাঁহার অদ্ভুত ধীশক্তি, ভূয়োদর্শন, নেতৃত্ব করিবার ও সম্প্রদায় গঠন-পরিচালন করিবার ক্ষমতা, বাক্‌পটুতা ও যুক্তিপরম্পরা, অসাম্প্রদায়িক উদারতা, অক্ষুণ্ণ সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, ওজস্বিতা ও মনস্বিতা, সংযম, ক্ষমা, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, দুঃখ বিপদে অবিচলতা, অধ্যবসায় সবই তাঁহার অসাধারণ ছিল। প্রভুত্বে তাঁর লোভ ছিল না—তাই প্রভুত্ব তাঁহাকে গুণমুগ্ধ হইয়া বরণ করিয়াছিল। তিনি যে হাল একবার ধরিতেন—তুমুল তুফানেও তাহা ছাড়িতেন না। তিনি ছিলেন সবার পথের সাথী—রথের রথী হইয়া নেতৃত্ব করেন নাই। বাতায়নে বসিয়া তিনি আদেশ দিতেন না—সকল অভিযানে তিনি থাকিতেন সবার আগে—প্রথম আঘাত লইতেন নিজে বুক পাতিয়া। তিনি "জাতির হরফের ...রপরা," খেতাবের তাজপরা প্রতিনিধি ছিলেন না,—লোহার শিকলপরা, কাঁটার মুকুট পরা ধর্ম্মগুরু ছিলেন। Chillon কারাগারকে Bounivard যেমন তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন,—দেবব্রত যেমন ধীবরের প্রাঙ্গণকে পুণ্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন—তেমনি তিনি কারার নরককে স্বর্গ করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রকেও কারাচণ্ডীর পাষাণবেদীতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। চিরকলুষ-কলঙ্কিত দুষ্কৃতিপুঞ্জের আশ্রয়ভূমি কারা যেন পতিতপাবনের চরণ স্পর্শে শতযুগের পুঞ্জীভূত পাপ হইতে কিছুদিনের জন্য মুক্ত হইল। শাক্যসিংহের সহিত বস্ত্র বিনিময় করিয়া পশুবধ-কিণাঙ্কিত-হৃদয় কিরাত যেন দিব্যবিভূতি লাভ করিল।

সুভদ্রার সারথ্যে একবার পার্থ জয়ী হইয়াছিলেন। বাসন্তীদেবী অভিমন্যু-জননীর ন্যায়ই এই নবীন পার্থকে সহায়তা করিয়াছিলেন; তিনি স্বামীর কেবল মাত্র সহধর্ম্মিণী ছিলেন না—মৈত্রেয়ীর ন্যায় সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহমর্ম্মিণী ছিলেন। দেশবন্ধুর দিগ্বিজয় আপন সংসার হইতেই সুরু হইয়াছিল।

'ভোগবতীর' কূলে বলিরাজের আধিপত্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার বৈতরণীর কূলে নূতন সিংহাসনের জন্য প্রচ্ছন্ন লোভও ছিল না। এইরূপ অসংখ্য কারণে চিত্তরঞ্জন জনচিত্তেশ্বর হইয়াছিলেন। জনমতের বত্রিশ পুতুল সহজে তাঁহাকে সিংহাসনে বসিতে দেয় নাই। জনসংঘ মতামত সম্বন্ধে বড়ই চঞ্চলমতি ও অবিবেচক এ অপবাদ, এ পরিবাদ প্রবাদের রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু জনসংঘ যখন বহুবার প্রবঞ্চিত হইয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আপনাদের ভাগ্যকে—আপনাদের হৃদয়-মনকে নিঃসংশয়ে, নিঃসঙ্কোচে একজনের হস্তে সমর্পণ করে, তখন সে অশেষবিধ পরীক্ষা করিয়াই লয়। তাহাদের মহত্ত্ব-বোধের আদর্শের চরম সীমায় কোন মহাপুরুষ আসন পাতিয়া বসিলে, তাঁর সমক্ষে তাহাদের অবনত হইয়া পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে মহাপুরুষের নির্দেশমত সর্ব্বক্ষেত্রে চলিবার সাহস ও শক্তি তাহাদের না থাকিতে পারে, তবু তাহাদের চিত্তে ভক্তির গভীরতা আদর্শের তুঙ্গতার সমানুপাতেই জন্মিবে। অক্ষম যাহারা তাহারা শক্তির অভাবের জন্য আপনাদিগকেই ধিক্কার দিবে; কিন্তু পূজা করিতে ছাড়িবে না। বাংলার জনমণ্ডলী চিত্তরঞ্জনকে স্বার্থের প্রেরণায় নেতৃত্ব দেয় নাই—প্রেমের প্রেরণায় বন্ধু বলিয়া, ভক্তির প্রেরণায় গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছিল। ধর্ম্মগুরু যে ভাবে অসংখ্য ভক্ত ও শিষ্য লাভ করেন, দেশবন্ধুও সেইভাবে অসংখ্য মনের নায়কত্ব লাভ করিয়াছেন।

বিশ্বোদ্ভাসক সূর্য্যালোক জীব-মাংসপিণ্ডে নয়নের উদ্ভেদন করিয়াছে—মহাসমুদ্রের গর্জ্জন সেই পিষ্ট পিণ্ডে শ্রুতির বিকাশ সাধন করিয়াছে—দেশবন্ধুর বিরাট উৎসর্জ্জন—তাঁহার মহাতপস্যার দীপ্তিই কি ব্যর্থ হইতে পারে?

এই জাতি যতই জড় অসাড় হউক—বহুযুগের অন্ধকূপের পঙ্কগিমে জ্ঞানগোচর যতই বিলুপ্ত হোক্—উদ্বোধকের দুর্নিবার শক্তির প্রভাবে সে জাগ্রত হইবেই—শ্মশানেও যাহা জীবন জাগায়—পাষাণেও যাহা চৈতন্য জাগায়, জীবদেহেই কি তাহার প্রভাব পরাস্ত হইবে?

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫।

ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। মাতুলের বর্ণনাটাকে মূর্ত্ত-রূপে সম্মুখে পাইয়া, বিস্মিত ভাবে দ্বারের বাহিরে থামিয়া পড়িলাম। সকালের সেই যুবকদ্বয় বেদানা ছাড়াইতেছিল। বাবুটি আমার দিকে চাহিয়া যেন সঙ্কোচ-চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

"সঙ্কোচের কোন কারণ নাই—আমি আপনারি মত একজন" বলিয়া, ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

"আমি বড় দুর্ব্বল, সহসা দাঁড়িয়ে উঠতে পারি না" বলিতে বলিতে বাবুটি দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন ও বসিতে দিবার একটা-কিছুর জন্য—ঘরের এদিক ওদিক চাহিতেই, আমি তাঁর শয্যায় বসিয়া পড়িলাম।

মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া তিনি বলিলেন—"দেখুন দিকি—এঁরা আমাকে গাছতলা থেকে তুলে এনে বেদানা খাওয়াবার তরে ব্যস্ত;—আমি কি করে মুখে তুল্‌বো! আমার তরে এ ঐশ্বর্য্যের আয়োজন ক'রবেন না,—আমার"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নত নয়নে বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

বুঝিলাম—কোনো গোপন স্থানে তাহা আঘাত করিতেছে। বলিলাম—"আপনাকে দেখে কে না বুঝবে আপনি পীড়িত; ওটা এখন তো ঐশ্বর্য্য নয়—আপনার ঔষধ। ওর সঙ্গে এখন তো অন্য কোনো ভাব মিশতেই পারে না। ঐশ্বর্য্য হ'লে কি মৃৎপাত্রে উপস্থিত হ'ত,—ও যে ওর সব অহঙ্কার ছেড়ে—মায়ের বুক থেকে স্নেহ-সরস হয়ে আসছে।"

তিনি মিনিট খানেক অবাক হয়ে আমার মুখের ওপর চেয়ে থেকে, শেষ একটি নিশ্বাস ফেলে যেন আবিষ্ট ভাবে বললেন—"দয়াময় তাঁর কৃপার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে চলেছেন। রোগ না হ'লে কত বড় অভাগ্য নিয়েই আমাকে যেতে হ'ত!—ক্ষমা করবেন,—আপনি কে?"

"আমি একজন অতি সাধারণ লোক,—অল্প কয়েক দিনের জন্য এখানে এসেছি। জয়হরির কাছে আপনার অসুখের কথা শুনে দেখতে এলাম।"

আবার তিনি আমার মুখে একদৃষ্টে চেয়ে সিক্ত কণ্ঠে বললেন—"আমাকে দেখতে এসেছেন! পথের জিনিস ছিলাম,—ঘর পেয়ে,—হৃদয় পেয়ে—আজ আবার বাঁচতে ইচ্ছা হয়!" এই বলে একটা হতাশের নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বুকে হাত ঘষ্‌তে লাগলেন,—যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন।

বলিলাম—"এত হতাশ হচ্ছেন কেন',—আপনি সত্বরই ভাল হয়ে উঠবেন। আজ আর বেশী কথা কয়ে কাজ নেই,—একটু বিশ্রাম করুন।"

তিনি একটু সামলে বললেন—"এখন আমি ভাল আছি, এই সময় যতটুকু পারি বলি। আপনারা আমার শেষ সহায়—আপনাদের আর কবে পাব'!"

তিনি বাধার অবকাশ না দিয়া বলিয়া চলিলেন,—"প্রায় তিন বৎসর আমি ভয়ানক অজীর্ণে দিন দিন জীর্ণ হচ্ছিলাম। এখানে আসার তৃতীয় দিনেই আমি নিজেকে রোগমুক্ত অনুভব করলাম। অতবড় অজীর্ণ—যা আমাকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে' এই অবস্থায় এনেছে, তা যে কোন্ অলৌকিক শক্তি-সংঘাতে সরে গেল, বলতে পারি না! পাণ্ডাজি—যিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁকে আমি বারবার বলেছিলাম,—"আমি একেবারেই নিঃস্ব, বাবার মন্দিরে পড়ে থাকতে এসেছি।"—বলা সত্ত্বেও তিনি আমাকে স্থান দেন; আর আমার রুগ্নাবস্থায় যা আহার ছিল—এক পয়সার সাবু আর এক পয়সার মিছরি, জলে সিদ্ধ করে দুইবারে খাওয়া—তাও তিনি দেন। এখন জানছি—তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। আমি যে আশাহীন নিঃস্ব তা বুঝতে পারেন নি;—আমার যে ভবিষ্যৎও নেই তা তিনি কি করে বুঝবেন! ভেবেছিলেন—পত্র লিখে টাকা

আনিয়ে নেবে,—তীর্থের ঋণ কোনো বাঙ্গালী ভদ্রলোক রাখেন না। যাক্,—পূর্ব্বে জল সাবুও আমার হজম হচ্ছিল না, ক্ষুধা একেবারেই ছিল না। এখানে আসার পর রোগমুক্তি আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ক্ষুধা—আমার মস্ত বিপদ হয়ে দেখা দিলে। আমি ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হ'তে লাগলুম,—পাথর খেলেও বোধ করি হজম্ হ'ত! কিন্তু সেই এক পয়সার সাবু খেয়েই থাকতে লাগলুম। আমি নিজে তো জানি—আমি কপর্দ্দকশূন্য নিরুপায়,—যা পাচ্ছি তা আমার ভিক্ষান্ন। নিঃস্বের ক্ষুধা যে উপদ্রবেরই নামান্তর! আমি ক্ষুধার কথা কি করে ব'লবো,—কা'কে বলবো, আমার কোন্ অধিকার আছে! কি করি—ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় তিন দিন ছট্‌ফট্ করেছি,—নিকটে একটা নদী নাই যে অঞ্জলি পূরে আকণ্ঠ জল খাই।

"একটা কুকুর সেই গলিতে ঘুরে বেড়ায়,—আমারি মত কঙ্কাল ব'য়ে। যাত্রীদের খাদ্যাবশিষ্ট সামনে পড়লেও খেতে পায় না,—সে যে রুগ্ন, দুর্ব্বল! ক্ষুধার জ্বালায় সে ছুটে যায় কিন্তু অন্য কুকুর দেখলে এগুতে পারে না! তার সামর্থ্যের সঙ্গে যাবার দাবীও সে হারিয়েছে! তখন সে হতাশ বিষণ্ণ মুখে কুয়াতলায় গিয়ে কাদাজল খেয়ে, আমারি ঢেলের পাশে এসে শুয়ে পড়ে। সে রূপও হারিয়েছে—কেউ তার দিকে চেয়েও দেখে না। এমনি করেই কি মারতে হয় প্রভু!

"চতুর্থ দিনের বৈকাল পর্য্যন্ত সে-ই আমার মনটাকে দখল করে—অন্যমনস্ক করে রাখলে। কিন্তু আর তো পারি না! প্রাণ বলে' উঠ্‌লো—"বাবা তিন চারখানা ঢেলের পরেই তুমি রয়েছ, এই ঢেল ক'খানা কি তোমারো দৃষ্টির অন্তরায় হ'ল! তবে আর কে দেখবে! আমি—পেলে খাই, ও যে পেয়েও খেতে পাচ্ছে না ঠাকুর!"

"সামনের বট-গাছটায় দু'তিনটে চিলের বাস ছিল,—বাচ্ছা হয়েছিল। তাদের মায়েরা এক একবার এসে বাচ্ছাদের কিছু খাইয়ে যাচ্ছে,—দেখতে লাগলুম। মনে হ'ল,—আজ চারদিন ক্ষুধায় মরছি—মা তুমি কোথায়! আকাশের দিকে চাইলুম। শূন্য হ'তে একটা চিলের পা' থেকে একটা কি খসে—কুকুরটির মুখের কাছে পড়লো। চেয়ে দেখি—দু'খানা লুচি! নিমেষে চারদিক দেখে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি খেতে লাগলো। ঠিক্ অনুভব করতে লাগলুম—যেন আমিই খাচ্ছি! ভারি তৃপ্তি বোধ হচ্ছিল। এখন আর তো আমি মানুষ নই,—আমি তার মতই ক্ষুধা-পীড়িত প্রাণী। আমার কাছে আর তফাৎ ছিল না,—শেষ পর্য্যন্ত যেন না থাকে। এই মানুষের খোলটাই আমাকে অভিমান দিয়ে বড় কষ্ট দিয়েছে, বড় বঞ্চনা করেছে। ভদ্র মধ্যবিত্তের মত দুঃখী আর সহিষ্ণু দুনিয়ায় নেই,—তার বেশ, তার শিক্ষা, তার ব্যবহার—তার সত্যকে চেপে মেরেছে। এই আবরণ সে আমরণ বহন ক'রে আত্মসম্মানের দাসত্ব ক'রে চলেছে—তার কাছে সে জোড়হাত। সে আত্মমর্য্যাদার মুখচেয়ে মৃত্যু স্বীকার করে,—সত্যের মর্য্যাদা রাখতে পারে না।

"তখন ঘুমের আমার বড় দরকার, তাহ'লে ক্ষুধার জ্বালাকে কিছুক্ষণ ফাঁকি দিতে পারি—কিন্তু তা হয় না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, ভাবলুম এই তৃপ্তিটা নিয়ে শুয়ে পড়িগে—ঘুম আসতে পারে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলুম; পেছন থেকে কে আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে সামলে শুইয়ে দিলে। চেয়ে দেখি স্ত্রীলোক,—এদের বাড়ী দুধ দেয়,—আমার দিকে বিস্ময়-করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বল্‌লে 'তোমার শরীরে যে কিছু নেই! তোমার হাতটা ধরতে আমার মনে হ'ল এ কি মানুষের হাত! বড় ভয়ও হ'ল। তুমি দুধ খাও না কেন! তোমাকে দুধ খেতে হবে।" আমার মর্ম্মে যেন মায়ের কথার সাড়া এল,—আমার চোখের সামনে মাতৃমূর্ত্তি দেখলুম—আমাকে দুধ খেতে আদেশ করছেন। কোথায় গেল আত্মাভিমান! সত্য সহজেই বুক ছেড়ে মুখে বেরিয়ে এল—"মা, দুধ আমি কোথায় পাব,—আমার ত পয়সা নেই!" এই বলার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনের আত্মাভিমানের মড়্‌চে-ধরা ধর্ম্মটা খস্ করে খসে পড়ে গেল—আমি যেন তার দন্ত-কর্কশ ধ্বনিটা পর্য্যন্ত শুনতে পেলুম।

"তিনি কেবল বললেন (ক্ষমা ক'রবেন, আমি তাঁকে তিনিই ব'লব) "আমার ছেলেরা দুধ খেয়ে যা বাঁচে তাই আমি বেচি। এখন একটু খাও—খেতে হবে।" এই বলে আমাকে আধসের-টাক্ দুধ খাইয়ে বল্‌লেন "আমি এই সময় রোজ খাইয়ে যাব।" তিনিই আমাকে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমার ক্ষুধার পক্ষে তা কিছুই নয়—ক্ষুধা ছিল তার সাতগুণ। দুবেলা দুটি ভাত পাবার তরে

ছট্‌ফট্‌ করেছি। গত দু'দিন থেকে prostration এসেছে। আর দাঁড়াতে বসতে পারছি না। আমার বোধ হয়—"

জয়হরি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছিল—সহসা দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া বেদানার খুরিখানা লইয়া "আগে এই কটা খেয়ে ফেলুন তো" বলিয়া নিজে হাতে করিয়া তাহার মুখে দিতে লাগিল। "সবগুলো খাওয়া চাই" বলিয়া একটি ছোকরার হাতে খুরীখানা দিয়া আবার দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

"যদি আঠার দিন আগে এই ভাইটি দিতেন!" বলিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে বলিলেন "ওঁর কথা রক্ষা না করলে আমার ওপারেও রক্ষা নাই। আমি এখন সব স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সকালে গাছতলায় অসহায় প্রাণটা যখন 'গেলুম গো' করে উঠেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ওই ভাইটির প্রাণও "গেলুম গো" বলে প্রতিধ্বনি পাঠিয়েছিল!"

বলিলাম "আপনাকে বড় বেশী কথা কওয়াচ্ছি—নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে,—আরও অবসন্ন হয়ে পড়বেন,—থাক্।"

"নীরবে বৎসর চলে গেছে,—কতকাল কথা কইনি। নিঃস্বকে দেখলে সবাই সরে যায়, আলাপে ভয় পায়। কারুর দোষ নেই, অভাব যে বড় ভয়ের জিনিস। তার উপর আমি পীড়িত। মানুষ আনন্দ চায়—শান্তি খোঁজে, অভাবের স্মৃতিটাও যে ও-দুটিকে নষ্ট করে। তাই কথার পথ বন্ধ করে দেখার পথ খুলে রেখেছিলুম। প্রকৃতি আমাকে তাঁর সকল দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। আজ আমার চারদিকে উন্মুক্ত হৃদয়—আমাকে কথা কইতে দিন।"

(৫২)

সিঁড়িতে লোক উঠিবার শব্দ হইল। পরে শুনিলাম জয়হরি বলিতেছে—"এই ঘর।" দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখি হ্যাট্‌-কোট্‌-পরা সৌম্যদর্শন একটি ভদ্রলোক—প্রায় প্রবীণ। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি—ইনি এখানকার নামী ডাক্তার। পশ্চাতে জয়হরি।

ঘরে ঢুকিয়া জয়হরি মুস্কিলে পড়িয়া গেল—কোথায় তাঁহাকে বসাইবে। তিনি বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিলেন "ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন, এটা ত তোমার বাড়ী নয়,—আর আমিও ত বাঙালী—রোগীর বিছানাই আমাদের বরাসন।"

রোগীকে আর নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হইল না। তিনি স্বয়ং গিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। মিনিট কয়েক রোগীর দিকে নির্ব্বাক নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া যাহা যাহা জানিবার তাহা শুনিয়া লইলেন।

জরহরি চুপচাপ দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হার্টটা ভাল করে দেখতে হবে ডাক্তার বাবু। উনি বলছিলেন Prostration set in করেছে। আপনার তো এই সবে পনের মিনিট হয়েছে।

আমি অবাক্ হইয়া বিরক্তভাবে তাহার দিকে চাহিলাম,—তার এই অভদ্র ইঙ্গিতটায় সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

ডাক্তার বাবু সেটা বোধকরি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন "পরীক্ষা করব বই কি! আমাকে ত এক ঘণ্টা থাকতেই হবে—তুমি ত তার আগে ছেড়ে দেবে না।"

শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলাম মাত্র।

ডাক্তার বাবু ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া জয়হরিকে বলিলেন "ওটা prostration নয়। বেশী রকমের weakness বটে—অন্য কোনও গোলমাল নেই। উনি যখন নিজেই বলছেন আর অনুভবও করছেন ওঁর আসল অসুখ সেরে গেছে···খুব সম্ভবও তাই! এখন ওঁকে দেখবার ভার তোমার রইল। আমি কেবল সুবিধামত এক একবার খবর নিয়ে যাব।"

জয়হরি বলিল, "আমি কি দেখব! আপনি ওষুধ দেবেন না?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "ওষুধের আবশ্যক নেই। ওঁকে দেওয়া চাই—সকালে আধসের দুধ, বেলা এগারটার মধ্যে মাছের ঝোল আর ভাত, বৈকালে আধসের দুধ আর রাত নটার মধ্যে মাছের ঝোল ভাত। এখন এক সপ্তাহ নিয়মিত এই চলবে। এ সপ্তাহটা উঠে হেঁটে বেড়ান নয়—পড়ে গেলে ভয়ের কারণ আছে। এই সব তুমি দেখবে—তোমার ভার,—কেমন!"

জয়হরি বলিল "যে আজ্ঞে, সে আমি পারব। কিন্তু আপনারও রোজ আসা চাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "সে ত' বলেছি,—কিন্তু আমার কাজ করবে কখন?"

জয়হরি হাত জোড় করিয়া খুব বিনয়ের সহিত বলিল "আপনি যখন বলেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "কিন্তু এঁকে দেখবার ভার নিলে যে।"

জয়হরি চিন্তিত ভাবে বলিল, "ভোরে গেলে হয় না? আপনি যা বলেন!"

ডাক্তার বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তবে এ কয়টা দিন থাক—ইনি সেরে উঠুন। তার পর কিন্তু—"

সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "যে আজ্ঞে—সে আর বলতে হবে না,—এখানে আমার ত আর অন্য কোনও কায নেই।"

"বেশ—সেই কথাই ভাল, এখন ওঁর জন্যে যে একটু গরম দুধ দরকার।"

"এই যে" বলিয়াই জয়হরি দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

আমি বিমূঢ়বৎ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলাম; কিছু বুঝিতে না পারিয়া কেবল উৎকণ্ঠা বাড়িতেছিল।

ডাক্তার বাবু আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছোকরাটি কে মশাই,—আপনার কেউ?"

"কেন বলুন দেখি, আমি ওঁর দাদাবাবু।"

"নাঃ—বেশ লোক! খাড়া warrant কথাটা শোনাই ছিল—এই দেখলুম। বলে—'দাদার বড় অসুখ, আপনাকে এখুনি যেতে হবে, তা না ত অসহায় ব্রাহ্মণ বিদেশে মারা যাবেন—তাঁর স্ত্রীপুত্রও আছে।' বললুম—'দুজন লোক অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন, আগে ওঁদের রুগী দেখে আসি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরতে পারি ত যাব—ঠিকানা রেখে যান;—তানাত কাল সকালে।"

"বলে—'সে হবে না ডাক্তারবাবু—আমাদের দরকার আপনি বুঝতে পারছেন না।' বললুম—'ওঁদেরও ত দরকার—তানাত কেউ কি আসে,—না পয়সা দেয়!' তাতে বলে 'আপনার সে ভয় নেই ডাক্তার বাবু—আমি এক পয়সাও দেব না। ওদের পয়সা আছে—ওরা অন্য ডাক্তার নিয়ে যেতে পারবে।"

"যুক্তিটা যেমন সুন্দর তেমনই লাভের···। ভাবলুম—মাথার গোলমাল আছে,—হাঁকিয়ে দিই। কিন্তু বড় ক্লান্ত হয়ে এসে বসেছিলুম—উঠতে ইচ্ছা করছিল না,—কথাগুলো মন্দও লাগছিল না,—একটু চলুক না—এই হিসেবে বললুম, 'পয়সা দেবে না, যারা পয়সা দেবে তাদের অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠাবে—তুমি খুব লোক ত?' তখন কাতর হয়ে বললে, 'আমি মুখ্খু লোক—তাই আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না ডাক্তার বাবু, আমি কি বললে আপনি বুঝবেন তা যে আমি জানি না। যে পয়সা দিতে পারে না সে কি কিছুই দেয় না ডাক্তার বাবু!' এই বলে ছেলে মানুষের মত কেঁদে ফেললে। এই বার আমি মুস্কিলে পড়লুম। বললুম 'ও কি হে, তুমি জোয়ান পুরুষ মানুষ, তুমি—' আমাকে শেষ করতে না দিয়ে হাত জোড় করে বললে, "হ্যাঁ তা আমি খুব পারি,—রাঁধতে, জল তুলতে, বাসন মাজতে, যা বলবেন আমি রোজ এসে করে যাব—আপনি কিন্তু দয়া করে চলুন।' আমার পরিবার বোধকরি পাশের কামরা থেকে সব শুনেছিলেন, তিনি দোরটা খুলতেই তাঁর দিকে চেয়ে বললে, 'আপনি একবার বলুন ত মা, আমাদের বড় বিপদ—তা উনি বুঝতে পারছেন না।' তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'উনি যাবেন বই কি—এক্ষুনি যাবেন, তুমি যতক্ষণ ইচ্ছে রেখো।'

'আমি এক ঘণ্টার বেশী রাখব না মা।'

'তাই রেখো, কিন্তু কাল আমাকে ডেকে খবর দিয়ে যেও—তোমার দাদা কেমন থাকেন!' এ কথাও বলে দিলেন, 'ওঁর সব কথাই বুঝতে একটু দেরী হয়—তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা।' তার পর অনেক কথা!

"আমার আটচল্লিশ বছর বয়সে এমন একটি লোক দেখি নি—এরা সব কিছু করতে পারে, আবার অপরকেও সব কিছু করাতে পারে—পাগলের সঙ্গে এদের এই প্রভেদ। ভাল কথা—(রোগীর দিকে চাহিয়া) উনি আপনার কি রকম ভাই,—সহোদর?"

বাবুটি চক্ষু বুজিয়া বুকে হাত দিয়া ঘষিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই বলিলেন, "সহোদর ভাইএর স্নেহের সঙ্গে অজ্ঞাতে দেনা-পাওনার একটা দাবী থাকে—এঁর কেবল সেইটে নেই, অন্ততঃ পাওনার পরওয়া নেই। দীনেন্দ্র ছিলেন আমার সহোদর ভাই—ভগবান আমার বই পড়া ধারণাগুলোর ব্যর্থতা বুঝিয়ে দিতে তাকেই আবার মিলিয়ে দিলেন।"

ডাক্তারবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তা হ'তে পারে, কিন্তু বুকে অত' হাত বোলাচ্ছেন কেন? আমি কয়েকবার লক্ষ্য করলুম,—এটা কি অভ্যাস?"

"না ডাক্তারবাবু—অভ্যাস নয়। তিন বৎসরের ভাবনা চিন্তার তপ্তশ্বাসে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পুরে, জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে। চথে জল এলে একটু শান্তি পাই,—শুকিয়ে গেছে, সে আর আসে না! হৃদয়টা কিন্তু বাইরে এসে আত্মপ্রকাশ করতে চায়,—পারে না, আমাকে যন্ত্রণা দেয়। এই রকম করে' সামলাই।"

ডাক্তারবাবু তন্ময়বৎ শুনিতেছিলেন,—তাঁর একটা নিশ্বাস পড়িল। বলিলেন—"আপনার নামটা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আপনার কিছু কিছু আমার শোনা দরকার বলে মনে হয়। আপনি দেখছি শিক্ষিত লোক, ডাক্তারকে সাহায্য করবার মত' যেটুকু দরকার আপনি তা বোঝেন—"

বাবুটি বলিলেন—"বোঝাবুঝির শক্তি বোধ হয় না যে আর আমার আছে। যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁদের কাছে আমার কোনো সঙ্কোচ বা বাধা বোধ করবার মত' কিছুই নেই। তিন বৎসর প্রকাশের পথ না পেয়ে যারা আমাকে জীর্ণ করেছে' আর আমার মধ্যেই জীর্ণ হয়েছে, তারা মুক্ত হলে, আমি একটু হালকা হয়ে আরাম পেতে পারি।"

জয়হরি এক বাটী গরম দুধ লইয়া আসিল, এবং ডাক্তারবাবুকে বলিল—"এক ঘণ্টা হয়েছে—তা জানেন? আর দেরী করবেন না।"

"হ্যাঁ—এই উঠলুম বলে। একটা দরকারী কথা শুনে নিয়েই যাচ্ছি।"

"মাকে কিন্তু বলবেন—আমি এক ঘণ্টার বেশী থাকতে বলিনি, আপনিই দেরী করেছেন।"

আমি কেবল দেখিতে আর শুনিতে ছিলাম। সবটাই আমার কাছে আশ্চর্য্যবৎ ঠেকিতেছিল। রোগীর শয্যায় একখানা Wordsworth পড়িয়া ছিল, তাহাই নাড়াচাড়া করিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম—এই Wordsworthই জয়হরির কাছে মাইনর স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় স্বরূপে Word-book হইয়া থাকিবে! রোগীর সম্বন্ধে কিছু জানিবার ঔৎসুক্য যে না বোধ করিতেছিলাম এমন নহে। কিন্তু পরিচয় জিজ্ঞাসার লজ্জাকর পরাজয়ে, সে প্রলোভন—আপনার মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গটা তুলিয়া আমাকে উৎকর্ণ করিয়া দিলেন।

ডাক্তার বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জয়হরি বলিল—"তবে তামাক সাজি।"

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বলিলেন—"ও কাজটার কথা তো হয়নি;—আমি তামাক খাইনা।"

জয়হরি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনি তামাক খান না! তবে আপনার call (ডাক্) কি করে হয়! যে ডাক্তার তামাক খান—তাঁকেই তো লোক খোঁজে,—নাড়ী টিপেই গাড়ীতে পা বাড়াতে পারেন না। দুদণ্ড পাওয়া যায়।"

ডাক্তারবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"জয়হরির যুক্তিগুলি যেমন নূতন তেমনি অকাট্য! দেখছি ওঁদের গ্রামে আমার অন্ন হ'ত না!"

জয়হরি ছিল গুড়ুকের যম; তবে মাতুলের মত তোয়াজী ছিল না,—ভালমন্দ বাচিত না। তার টানে টানে ধূমাবতী মূর্ত্তিমতী হইতেন, কুয়াশার সৃষ্টি হইত! চাকরটা খুঁজিতে গিয়া দেখিতে পাইত না, ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিত,—"বাবু ঘরে নাই!" সে আমার সামনে তামাক খাইত না, অথচ কি করিয়া যে বাঁচিয়া ছিল, সেটাও আমার একটা চিন্তার বিষয় ছিল। তাই দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার সিগারেটের টিন্‌টা আমাকে বৈঠকখানায় ভুলিয়া যাইতে হইত।

ডাক্তারবাবু যেন একটু ব্যস্ত ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—এইবার সংক্ষেপে বলে ফেলুন তো—রোগটা দেখা দেবার কিছু পূর্ব্ব থেকে;—যা আপনি নিজে উল্লেখযোগ্য মনে করেন।"

তিনি বলিলেন—"না ডাক্তারবাবু, আমার সে সব আর আসবে না। আপনারা আমার দৈবলব্ধ শেষ আশ্রয়, আপনাদের কাছে আমি যতটুকু পারি বলে যাই,—তাতে আমি শান্তি পাব। তবে আমার জীবনের কোনো কথাটার মূল্য আর আমার কাছে নাই। তারা কেবল—নিদ্রার দুঃস্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় সাজা। যা আমার জীবনটাকে সংক্ষেপ করে দিলে—তা আমি সংক্ষেপেই বলে যাব। তার অনেক কথাই ডাক্তারবাবুর কাজে আসবে না, কিন্তু না বললেও আপনাদের রহস্যের মধ্যে রেখে যেতে হবে,—তাই বলা। আমাদের বাড়ী ছিল খিদিরপুরে। বাবা সামান্য চাকরি করতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র প্রয়াস

ছিল আমাদের দুই ভাইকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া। মায়ের দেখা দিলে রক্তপিত্ত।—তিনি দ্রুত অপটু হয়ে পড়ায়, আমি বি-এ পাস্ করার পরই আমার বিবাহ দেওয়া হয়। এম্-এ পড়তে পড়তে ল-য়ের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। এই আমার অতিরিক্ত পরিশ্রমের আরম্ভ।

"আমিও এম্-এ পাস্ হলাম, মাও দেহত্যাগ করে রোগমুক্ত হলেন। বাবা এ আঘাত সহ্য করতে পারলেন না,—তিন মাসের মধ্যেই হৃদরোগে মারা গেলেন। আমাকে বল সঞ্চয় করতে হল। দুইটি প্রাইভেট্ টিউসনি স্বীকার করে ল-টা দিলুম,—পাস্ হলুম। আমার "অনাথ" তখন হয়েছে, মাস সাতেক পরে "মলিনা"ও হল। পত্নীর খাটুনির অন্ত নাই। ছোট ভাই, দীনেন কিন্তু দিন দিন যেমন নীরব হয়ে এল',—নিভৃত খুঁজে বেড়ায়,—একান্তে থাকে! আমার পথদে' হাঁটে না—কি বাইরে কি অন্তরে!

"অবস্থার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনেও আমার আশা আকাঙ্ক্ষা আমাকে ঠেলে নিয়ে ছুটছিল,—দীনেন কিন্তু হাল্ ছেড়ে দিলে! উৎসাহের মধ্যে তার রইলো—তার বৌদিদিকে সাহায্য করাটা। দু'বছর সম্পূর্ণ করে' বি-এ আর দিলে না,—পড়া ছেড়ে দিলে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে—'কি হবে, পড়া তো হয়েছে, সবই এক কথা! তার চেয়ে ফি'র (feeর) টাকায় আপনি একটা ঝি রেখে দিন—অনাথের বড় অযত্ন হচ্ছে!'

"এখন তাদের কে দেখছে ভাই! কেউ আছে কি নেই তাও তো জানিনা!" উদাস মৃদু কণ্ঠে এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়া বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সামলাইয়া বলিলেন—"দীনেন্দ্রকে অনেক বোঝালুম,—কিছুতে উৎসাহিত করতে পারলুম না। সে বললে—"আচ্ছা—একবার দিন কতক ঘুরে আসি,—বাংলা দেশটা দেখে নি। শুধু বয়ের মধ্যে দিয়ে দেখলে আর তারপর জীবনটা টাকা রোজগারে উৎসর্গ করলে কেবল পেছিয়েই পড়া হয়,—জন্মটা বিফল হয়ে যায়। ফল কথা—তরুণ বয়সের আঘাতগুলা তাকে উৎসাহহীন করে দিয়েছিল,—সে ভগবানের মধ্যে আশ্রয় বা আরাম খুঁজছিল। আমি মনে মনে হাসলুম—কারণ দুর্ব্বলেরাই ওই আশ্রয় খোঁজে;—ব্যথাও বোধ করলুম,—বাধা দিলুম না।

"মাস চারেক পরে সে জ্বর নিয়ে ফিরে এলো। আমার প্রাণটা দমে গেল। সে হেসে বললে—"ও কিছু নয়, পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়েছে। কষ্টে ক্লান্তিতে বিপদে তাঁর কৃপা চাক্ষুষ করেছি, তার বাড়া লাভ আর কি আছে,—শান্তি বোধ করেছি।" ইত্যাদি।

"এ সব বকে কি! শুনে আমার ভয় হল—মাথা খারাপ হ'ল নাকি! যাক্, আমি ল-টা পাস্ ক'রে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলুম, সেও শয্যা নিলে। ডাক্তারেরা বললেন—থাইসিসের সূচনা। তাঁরা যা যা বললেন তাই করলুম,—শেষ বাড়ী বাঁধা দিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে রইলুম। যা ঘটবার তাই ঘটলো। ভাই গেল, বাড়ী গেল,—সর্ব্বস্বান্ত হয়ে আবার প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করলুম। তাতে চলে যাচ্ছিল। এইবার নিজের অজীর্ণ দেখা দিলে, অল্পদিনেই অপটু করে ফেললে। ডাক্তারেরা বললেন—সত্বর পশ্চিমে গিয়ে কোনো ভাল জায়গায় থাকা চাই—অন্ততঃ তিন মাস। হাতে মাত্র তিনশত টাকা জমে ছিল। অর্দ্ধেক স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে অর্দ্ধেক নিজে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম,—সে প্রায় তিন বছর পূর্ব্বের কথা। সে টাকায় কোনো প্রকারে পাঁচ মাস চালিয়ে ছিলাম;—তার পর আমাকে যে অবস্থায় পেয়েছেন সেই অবস্থায় কেটেছে। কোথাও রোগের উপশম হয় নাই। কি কি ভাবে কেটেছে—সে অনেক কথা। দুটি পয়সার অভাবে আজ নয় মাস কারুর সংবাদ নিতে পারিনি! এ শরীর নিয়ে ফিরেই বা ফল কি, যাবই বা কোথায়? শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। তখন আমি বহু দূরেও—টুণ্ডুলায়। তারপর—'এখানে এসেছি' বললে ঠিক বলা হল না,—'এখানে আনলেন।'

"কোথায় কি ভাবে আর কেমন করে' যে এই দীর্ঘ দিন কেটেছে, সেটা আমার নিজের কাছেই রহস্যময়। এত বড় অসম্ভব সম্ভব হওয়া আমি এখন নিজেই বিশ্বাস করতে বা মনে করতে পারি না। এই মাত্র স্মরণ আছে—চিন্তা, দৈন্য, অনশন, অনিয়ম, অনিদ্রা, অনিশ্চিতের উপর নির্ভর ও নির্ব্বাহ, যথা তথা যাপন, শরীর নিগ্রহ,—এরা আমাকে রোগের যন্ত্রণা আর স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা থেকে কোথায় সরিয়ে আড়াল করে' রেখেছিল!—সকলকেই বন্ধু ভাবে পেয়েছিলাম!

"আমার শিক্ষাই আমাকে সব চেয়ে ভুগিয়েছে। নিজের

জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে অস্বীকার করে, সহজে ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিতে পারিনি। দীনেন্দ্র বলেছিল—"একটা ভুল না হয় করলেন,—তাতে বড় বেশী ঠক্‌তে হবে না।" আমার অহঙ্কার কিন্তু তাতে সায় দেয়নি,—শিক্ষিতের কাছে সেটা যে আত্মপ্রবঞ্চনা,—সে যে প্রমাণ চায়! কিন্তু আড়াই বছরের বৈচিত্র্যময় অবস্থা আমাকে কতই দুরূহ সমস্যা আর সঙ্কটের ভেতর দিয়ে টেনে এনেছে—বিচার বুদ্ধির মধ্যে যার সমাধান নেই। কাঁহাতকই বা তাদের accident বলে' মন শান্তি পায়! কিছু বুঝতে না পেরে নিজের বিদ্যাবুদ্ধি শেষ লজ্জায় মাথা নুইয়েছে! দেখুন,—কি অবস্থায় যে মৃত্যু বলে' জিনিসটাকে পাওয়া যায় বলতে পারি না। আমি কতবারই সে সীমা অতিক্রম করে' গিয়েছি বলে' মনে হয়!"

ডাক্তার বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার নামটি শোনা হয় নি।"

"গণেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

ডাক্তার বাবু পুনরায় বলিলেন—"দেখুন গণেনবাবু, আমি ডাক্তার, আমার উচিত আপনাকে বিশ্রাম দেওয়া। আপনার মত একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের, কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ও রুগ্ন শরীরে, অপরিচিত অবলম্বনে প্রবাসে আড়াই বছর কাটানই একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! সে শোনবার ইচ্ছা আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু আজ নয়—আগে আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। আজ কেবল একটি মাত্র কথা শুনে উঠবো,—টুণ্ডুলা থেকে বৈদ্যনাথ অল্প পথ নয়—এলেন্ কি উপায়ে? সেখানে ছিলেনই বা কোথায়?"

"এ ব্যাপারটার মধ্যে তেমন বিস্ময়কর কিছুই নেই। আর উপায় বা উপায়-চিন্তা আমাকে কোনো দিনই নিজেকে করতে হয় নি,—কারণ সেটা সেই পারে যার কোনো একটা কিছুর উপর দাঁড়িয়ে ভাববার ভিত আছে। একটু আগে থেকেই বলতে হয়। এটোয়া খুব স্বাস্থ্যকর স্থান; কেবল স্থান আর আমাকে কতটুকু সাহায্য করবে! কোন' প্রকারে কিছুদিন কাটিয়ে কোনো ফল পেলুম না। কি করি,—কোথায় যাই! নিত্য ইষ্টেসনে এসে উদাস ভাবে ট্রেনের যাতায়াত দেখি, আর কত কি ভাবি। গার্ডেরা বোধ হয় লক্ষ্য করতো। সম অবস্থাই সমবেদনা আনে। একজন গার্ড একদিন নিজে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন,—খুব মধুর ও করুণ তাঁর কথাগুলি! একজন খাঁটি ইংরেজ—আমাকে ডেকে এমন ভাবে কথা কচ্ছেন! আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমি কেন নিত্য উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে থাকি,—এর পশ্চাতে কোনো কঠিন আঘাত আছে কি? তাঁর দ্বারা যদি সামান্য সাহায্যও সম্ভব হয় তো তা বলতে আমি যেন সঙ্কোচ বোধ না করি। ইত্যাদি। এ কি!

"বহুদিন পরে আমার বেদনাতুর হৃদয়ে সহসা কে যেন শীতল প্রলেপ দিলে। আমি আমার এখনকার অবস্থা ও মনোভাব তাঁর কাছে একটুও গোপন করতে পারলুম না,—তারা সহজ পথ পেয়ে বেরিয়ে গেল,—সে যেন আত্মায় আত্মায় কোলাকুলি! তিনি বললেন—"টুণ্ডুলায় অনেক বাঙ্গালী বাবু থাকেন—রেলে কাজ করেন; চল সেখানে তোমাকে পৌঁছে দি। কষ্ট হবে না,—স্থানও স্বাস্থ্যকর।" তাঁর সঙ্গে টুণ্ডুলায় চলে এলুম। ইষ্টেসনে পৌঁছে—তিনি আমাকে সঙ্গে করে কেলনার কোম্পানীর হোটেলে ঢুকে আমার জলসাবুর ও আর যা যা দরকার হবে তার ব্যবস্থা করে—তাঁর নিজের নামে বিল্ করতে বলে দিলেন। তার পর আমার করমর্দ্দন করে বললেন—"তুমি কেন হতাশ হচ্ছ বন্ধু—তোমার ত সবই রয়েছে,—তুমি সেরে যাবে। আচ্ছা—আবার দেখা হবে",—বলেই—ট্রেনে উঠে ফ্ল্যাগ দেখালেন। ট্রেন চলে গেল। আমার যেন স্বপ্ন ভাঙলো! ট্রেণখানা চলার সঙ্গে আমার হৃদয়টাতে টান্ পড়তে লাগলো,—আমার যে কতখানি ওর সঙ্গে চলেছে!

"সবে তিন সপ্তাহ হল—গার্ড সাহেবের পত্নী বিয়োগ হয়েছিল। হৃদয়ের শূন্য স্থানটা কিছু দিয়েই তিনি পূর্ণ করতে পারছিলেন না, বেদনা-ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলেন,—কোনো কিছুই তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। নিজের দুঃখকষ্ট—অপরের দুঃখকষ্ট মোচনে কমে,—ত্যাগের মাধুরী তৃপ্তি দেয়। তাঁর শোকার্ত্ত হৃদয় আমার মুখে প্রতিচ্ছবি পেয়ে সমবেদনায় আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমি তো এই আকস্মিক ঘটনার অন্য কারণ খুঁজে পাই না।

* * * *

"অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবু এখানকার রেলে কাজ করেন। অনেকেরি দিনরাত পালা করে খাটুনি। কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টারে স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন। যাঁরা একক

তাঁরা ৩৷৪ জনে মেস্ করে একটি কোয়ার্টারে কাটান। শুধু খাটুনি আর খাওয়া নিয়ে মানুষের থাকা কঠিন যদি আনন্দের অবকাশ না থাকে। সেটা তাঁরা করে নিয়েছেন। তাঁদের থিয়েটার, কন্‌সার্ট দুই-ই আছে আর তাতে খুব উৎসাহও আছে।

"যাঁরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে থাকেন—তাঁদের কোয়ার্টারে স্থান পাওয়া সম্ভবই ছিল না। আর মেসে গান বাজনা অভিনয়ের মধ্যে আমার মত পীড়িত অকর্ম্মণ্যের থাকা কোনো পক্ষেরই সুবিধার নয়। ওয়েটিং রুমে রাত্রে রেলের ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারিদের অবিরাম আসা যাওয়া, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদি। যাই কোথা। শীতবস্ত্র নেই,—একটু হাওয়ার আড়ালও পাই না। কখনো প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বেঞ্চে শুই, আবার উঠে এদিক ওদিক বেড়াই—না নিদ্রা, না স্বস্তি। এই ভাবে তিন দিন কাটলো, আরো দুর্ব্বল হয়ে পড়লুম, মাথা ঘুরতে লাগলো। যা একটু আশায় আলো ধরে যুঝছিলুম সেটুকু নিবে গেল। সেই দিন ভগবানের শরণ নিলুম—মানুষের শেষ অবলম্বন! দীনেন বলেছিল 'বড় বেশী ঠকতে হবে না।'

"শরীর মন তখন চিন্তা চেষ্টার বাইরে গিয়ে পড়েছে, আমি পরের জিনিসের মত একখানা বেঞ্চে পড়ে রইলুম। ক্লান্ত দুর্ব্বলদেহে সংজ্ঞা ছিল না। ঘণ্টার শব্দে আর লোকের গোলমালে ঘুম ভাঙলো। দেখি চার ঘণ্টা কেটে গেছে, একটু স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। এক্সপ্রেস আগের ইষ্টেসন ছেড়েছে, তাই যাত্রীদের এত চাঞ্চল্য। আমি যে বেঞ্চিখানিতে ছিলুম—তার আশে পাশে আর সামনে সস্ত্রীক একটি বাঙ্গালী বাবু ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে আর অনেকগুলি পোঁটলা পুঁটলি ট্রঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত,—কুলিরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটি ৩৷৪ বছরের ছেলে—বেঞ্চির ওপর, আমার পাশেই বসে একটা বল আর একটা কমলানেবু নিয়ে একমনে খেল্‌ছে। এত গোলমালে তার কোনো দিকেই নজর নেই। গাড়ী যত নিকট হ'তে লাগলো—চাঞ্চল্যও সেই পরিমাণে বাড়তে লাগলো। কুলিরা বাবুটিকে বললে—"বাবুজি গাড়ী আজ বহুৎ লেট্ হায়—আধা ঘণ্টাসে উপর,—যাস্তি ঠ্যারেগা নেহি, জল্‌দি ঠিক্ ঠাক্ কর্‌লেনা।" বাবুটি আরো ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন। গাড়ী ইষ্টেসনে না দাঁড়াতেই চারজন কুলি মোট্ নিয়ে ছুট্‌লো, বাবুটি স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে অনুসরণ করলেন।

"আমি সেইদিকেই চেয়েছিলুম। দু তিনবার ঘোরাঘুরির পর কুলিদের তাড়ায় একখান মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে তাঁরা উঠে পড়্‌লেন, তারাও তাড়াতাড়ি মোটমাটগুলি নাবিয়ে দিলে,—প্রথম ঘণ্টার ঘাও পোড়লো। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলুম। তখন চোখ ফিরিয়ে দেখি সেই ৩৷৪ বছরের ছেলেটি তখনো তার বল্ আর কমলা লেবু নিয়ে নিশ্চিন্তে খেলছে। কি সর্ব্বনাশ—গাড়ী যে এখনি ছাড়বে! বললুম "খোকা তুমি যাবে না?" তার চট্‌কা ভাঙ্‌লো, এদিক ওদিক দেখে, নেবে পড়ে "বাবা-বাবা," করে উঠলো। আমার সামর্থ্য নেই—তাকে কোলে করে' ছুটে গিয়ে দিয়ে আসি। তবু উঠে পড়লুম—তার হাত ধরে গাড়ীর দিকে চললুম,—দ্বিতীয় ঘণ্টাও দিলে। প্রাণটা শিউরে উঠলো। যতটা পারি দ্রুত চললুম। আমার ডাক সে গোলমালে তাঁদের কাছে পৌচচ্ছিলনা। আমরা যখন দু হাত তফাতে তখন গাড়ীতে মোসন্ দিলে!

"আমি এখনো জানিনা কি করে সেই ছেলেকে তুলে নিয়ে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলুম। দোরের সামনে মাত্র একহাত স্থান ছিল—আর সব মোটমাটে ভরা। তাঁরা তখনো তাই নিয়ে বিব্রত। আমি থর্ থর্ করে কাঁপছিলুম—অন্ধকার দেখে সেই মোটের উপরেই ঘুরে পড়ি। আশ্চর্য্য—বাইরে পড়িনি! যখন কথা কইতে পারলুম—তখন এক ইষ্টেসন্ পার হয়ে এসেছি। তার পর যা স্বাভাবিক—কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রভৃতি। আমি বললাম,—"এখন আমাকে আগের ইষ্টেসনে নাবিয়ে দিন, আমার টিকিট নেই;—একটু সাহায্য করলেই হবে—বড় দুর্ব্বল বোধ করছি।"

"তবে! এ অবস্থায়!—সেখানে কি আপনার কেউ আছেন, না—টুণ্ডুলায় ফিরে যাবেন?"

একটু হেসে বললুম—"আমার সব ইষ্টেসনই সমান,—সব লোকই আপনার লোক।"

ভদ্রলোকটি আমার অবস্থাটা বোধ হয় কতকটা অনুমান করে সহানুভূতির স্বরে বললেন—"যদি বাধা না থাকে তো জানতে পারি কি কোথায় গেলে আপনার সুবিধা হয়, বা কোথায় যাবার আপনার ইচ্ছা!"

"না,—কোনো বাধাই আর আমার নাই; সুবিধার চিন্তাও আমি ত্যাগ করেছি। তবে আজ দু'দিন মাঝে

মাঝে মনে হ'য়েছে—শেষটা বৈদ্যনাথের আশ্রয়ে গিয়ে পড়তে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হই,—তিনি যা হয় করুন। আর পারছিনা।"

বাবুটী বাধা দিয়ে সাগ্রহে বলে উঠলেন—"মাপ্ করবেন, আমি রেলওয়ে এজেণ্ট আপিসে কাজ করি, পাস্ নিয়ে সস্ত্রীক বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম, বাড়ী ফিরছি। আর দু'জনের আসবার কথা ছিল—তাঁরা আসতে পারেন নি। এতে আমার এক পয়সার খরচ নেই। আপনি অমত না করলে আমরা বড়ই শান্তি অনুভব করবো। তবে আপনার শীতবস্ত্রাদি বোধ হয় টুণ্ডুলায়"—

"না,—যা আমার গায়ে আছে এই আমার সব। তবে—ছোট একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে সামান্য দু একটা জিনিস ছিল,—সে গেলে কোনো ক্ষতিই নেই।" বাবুটি তাঁর স্ত্রীর দিকে চাইতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে তাঁদের মোটগুলির পাশ থেকে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ তুলে তাঁর স্বামীর হাতে দিতেই তিনি সেটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"এইটিই আপনার নয় তো? কুলিরা আমাদের পুঁটলি পাঁটলার সঙ্গে এটিও এনে ফেলেছে—ট্রেন ছাড়বার পর দেখতে পেলুম! তাই আলাদা করে রাখা হয়েছে।"

"আমি একটু হাসলুম, বললুম—"হ্যাঁ—আমারি বটে। ভগবানের ব্যবস্থা এগিয়ে চলে, তিনি এখনো আমার খবর রাখছেন।" একটা নিশ্বাসও পড়লো। যাক্,—তার পর তিনি আমাকে যশেডি ইষ্টেসনে নাবিয়ে দিলেন। পাণ্ডারা যাত্রী ভেবে ঘিরেছিল, তাদের একজনকে বললেন—"তুমি এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিও—কষ্ট না হয়। ওঁকে কোন বিষয়ে পেড়াপিড়ি কোরো না—একটু দেখো।" তার পর আমার নিষেধ সত্ত্বেও তার হাতে কিছু দেন,—কত তা জানি না। তার নামটিও জেনে নেন। কম্বল কয়খানি কখন দিয়েছিলেন তা আমি জানতে পারি নি।

"এই ভাবে আমার বৈদ্যনাথের আশ্রয়ে আসা বা আমাকে তাঁর নিয়ে আসা।"

আমরা নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। তেমনি অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, কাহারো মুখে কথা ফুটিল না।

গণেন বাবুই বলিলেন—"যাক্,—এখন কেবল একটি কথা নিবিড় হয়ে আজ কদিন প্রাণের মধ্যে জেগেছে, সেই আমাকে স্ত্রীপুত্রের কাছে অপরাধী করে রেখে নিয়ে চলল। সে ব্যথার ত রূপ নেই যে রেখে যাব।"

একটি ছোট নিঃশ্বাস পড়ল; তিনি চোখ বুজলেন। মিনিটখানেক নীরবে কাটবার পর তিনি বললেন "আর আমার বলবার কিছু নেই ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার বাবু নির্ব্বাক শুনিতেছিলেন, বলিলেন, "কিন্তু আমার যে কিছু বলবার আছে গণেন বাবু।"

তিনি ধীরে ধীরে চাহিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আপনি নিজেই অনুভব করেছেন—আপনার রোগ সেরে গেছে। তার চেয়ে বড় প্রমাণ ডাক্তারের হাতে নেই। এখন কেবল স্ত্রী পুত্রের কাছে অপরাধী থেকে যাওয়াটাই আপনাকে ব্যথা দিচ্ছে, এটাও রোগমুক্তির অন্যতম লক্ষণ—রোগে ও আশা সমই থাকে। আপনি সেরে গেছেন। আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—আপনি ও বৃথা চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিন—ওইটাই আপনার prostration এর কারণ। আমি আশা করি এক সপ্তাহেই আপনি বল পাবেন।" পরে জয়হরির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন এঁকে দেখা শোনা আর সময় মত খাওয়াবার ভার তোমার।"

জয়হরি সোৎসাহে বলিল—"সে আপনি দেখবেন আমি কি রকম খাওয়াই। আমি যেমন করে পারি—"

এইবার আমাকে বাধ্য হইয়া কথা কহিতে হইল। বলিলাম, "ডাক্তার বাবু, আহারের ওজন বোধটা জয়হরির খুবই কম। উনি যা করবেন ভাল ভেবেই করবেন বটে কিন্তু গণেন বাবু তা সইতে পারবেন কি না সন্দেহ।"

"তাই নাকি হে!"

"আজ্ঞে বিদেশে তেমন সুবিধে নেই, তবুও ভাল যা পাব যেমন করে হোক—তা দেখে নেবেন ওঁর কাছেই শুনবেন।"

"সর্ব্বনাশ!—তবে আর কাকে?" বলিয়া ডাক্তার বাবু সেই যুবকদ্বয়ের দিকে চাহিলেন।

জয়হরি কাতরভাবে বলিল, "আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন ডাক্তার বাবু—আমি আপনার ওখান থেকেও ত' আনতে পারি—কম খাওয়াব কেন? উনি যাতে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল পান—মাংস, হালুয়া"

গণেন বাবুর মুখে হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন, "ওঁর কথা আমি ঠেলতে পারব না ডাক্তার বাবু, ওঁকে আপনি ঠিক করে বুঝিয়ে বলে দিন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এখন এক সপ্তাহ মাগুর মাছের ঝোল আর পুরাতন চালের ভাত দুবার খাবেন, আর দুবার আধসের করে দুধ। সুবিধা হয় ত ফলের মধ্যে বেদানা আর নেবু—ব্যাস্। বুঝলে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বুঝেছি, কিন্তু—"

"এখন এক সপ্তাহ কিন্তু টিন্ত নয়।"

সেই যুবকদ্বয় বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমরা তিনজন রইলুম, কোন রকম অনিয়ম কি অসুবিধা হবে না।"

"বেশ, তবে এখন উঠতে পারি জয়হরি!"

"আমি ত আপনাকে কখন উঠতে বলেছিলুম! আপনি তামাকের স্বাদ পেলে দেখছি ভোর হয়ে যেত। আমি কিন্তু মার কাছে মুখ দেখাতে পারব না।"

"না না—কাল তোমার যাওয়াই চাই। গণেনবাবুকে খাইয়েই যেও। আমি অপেক্ষা করব। ওইখানেই কাল খাবে, আর যদি কিছু কাজ থাকে,—বুঝলে!"

পরে দু এক কথার পর ডাক্তার বাবু উঠিলেন, আমিও উঠিলাম।

নামিয়া দেখি জয়হরি আমাদের পূর্ব্বেই নীচে নামিয়া অপেক্ষা করিতেছে! ডাক্তার বাবুকে সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক করে বলুন, কোনও ভয় নেই ত, ওঁর ছেলে মেয়ে আছে ডাক্তারবাবু!"

"রোগের জন্যে ত ভয় নেই, ভয় কেবল তোমার জন্যে। মঙ্গল ইচ্ছা আর পেট এ দুটো যে এক জিনিস নয় সেইটে মনে রাখলে ভয়ের কোনও কারণই নেই।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি গাড়ীতে উঠিলেন।

রাস্তার ওপারেই আমাদের আস্তানা; আমরাও বাসায় পৌঁছিলাম।

জয়হরি জিজ্ঞাসা করিল "ডাক্তারবাবু কি বললেন বুঝতে পারলুম না।"

বলিলাম, "গণেনবাবুকে খাওয়ানো সম্বন্ধে খুব সাবধান হতে বললেন। যা ব্যবস্থা করে গেলেন ঠিক সেইটেই করা চাই। অন্য কিছু দেওয়া না হয়।"

বাণেশ্বর আসিয়া জয়হরিকে সংবাদ দিল, "সব হয়ে গেছে—মা ডাকছেন।" সে ভিতরে চলিয়া গেল।

দেখিতেছি ক্রমে আমি সাংখ্যের দ্রষ্টায় দাঁড়াইয়া গেলাম। জগতে অনেক জিনিসই দিন রাতের মত আসে—চাহিতে হয় না,—ভাবনাটাও তাহাদেরই একজন। আজ কিন্তু শরীর মন দুই-ই অবসন্ন হইয়াছিল। আমার অজ্ঞাতেই ভাবনার বাহিরে গিয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে ভাবিতাম আমার ভবিষ্যৎ বলিয়া যাহা ছিল তাহা চুকাইয়া ফেলিয়াছি, এখন কেবল স্রোতাধীন থাকা,—"রয়েছে দীপ না আছে শিখা"—আজ তাহাতে সন্দেহ আসিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

রস-তত্ত্ব

শ্রীঅনিলকুমার বসু এম-এ

সন ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' মাননীয় অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ মহাশয়ের 'রস-তত্ত্ব' শীর্ষক একটী জ্ঞানগর্ভ ও চিন্তাকর্ষক দার্শনিক প্রবন্ধ বাহির হয়। কিন্তু রচনায় যেরূপ মৌলিকতার পরিচয় আছে এবং সত্যসাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে, তদনুরূপ তাহার কোনও আলোচনা এতাবৎ বাহির হয় নাই বলিয়া, আজিকার এই আলোচনায় আমি কয়েকটী কথা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন, পরেশবাবু কর্ত্তৃক উহার একটী আলোচনা বাহির হইয়াছিল; কিন্তু মূল প্রবন্ধ ও সমালোচনা পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে দেখা যায়, সমালোচক লেখকের প্রধান বক্তব্য বিষয় লইয়া বিশেষ কিছুই আলোচনা করেন নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত সমালোচনা সম্বন্ধে আমি কোনও কিছু বলিব না। মূল প্রবন্ধই আমার আলোচ্য বিষয়।

এ কথা প্রথমে স্বীকার করিতেই হইবে, জটিল ও দুরূহ দার্শনিক তথ্য সরল ও সরস ভাষায় লিখিতে অধ্যাপক

মহাশয় অদ্বিতীয়। তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই নিমিত্তই পরম উপভোগের সামগ্রী হয়। সুতরাং সমালোচক যিনিই হউন না কেন, অধ্যাপক মহাশয়ের ভাষা ও লিখিবার ভঙ্গীর উপর তাঁহার বলিবার যে কিছুই থাকিতে পারে না, এ কথা না বলিলেও চলে। তবে মূল বক্তব্য লইয়া তাঁহার সহিত আমার দুই এক স্থানে মতভেদ আছে; তাহাই আমি এই আলোচনায় লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রবন্ধের মূল কথাগুলি প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। আমাদের মনের মধ্যে দুইটী প্রবাহ বহিতেছে—একটী জ্ঞান-প্রবাহ ও অপরটী রস-প্রবাহ। দ্রব্যে আমরা যে রসের কথা বলিয়া থাকি, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; সাহিত্যে যে রসের কথা বলি, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—মনের দ্বারা গ্রহণীয়। রস-প্রবাহ জ্ঞান-প্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ ভাবও কল্পনা করা চলে না। রস ও জ্ঞান যে মনের পৃথক বৃত্তি, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণেরও মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। Knowledge ও Feeling চিত্তের দুইটী পৃথক ধর্ম্ম। জ্ঞান বস্তু-গুণ-পরিচায়ক এবং Feeling অথবা অনুভূতি সুখ-দুঃখ-লক্ষণা। এই অনুভূতির দ্বারাই রসের আস্বাদন হয়। জ্ঞান ও বিচারের দ্বারা যতক্ষণ আমরা বস্তুর গুণ বিশ্লেষণ করি, ততক্ষণ আমরা রসের কোনই সন্ধান পাই না। কিন্তু এইরূপ করিতে করিতে কখন সেই জিনিষের মধ্যে একটী চাখিয়া দেখিলাম, আর অমনি প্রাণে রস-ধারার সঞ্চার হইল। পরিশেষে জ্ঞানের উপর নিন্দাবাদ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা হইয়াছে। রস শুধু প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগায় না; ইহা আত্মাতে এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি আনাইয়া দেয়। জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ। বিচার, বিশ্লেষণ অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না; অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিক কোনও বিষয় সম্বন্ধে মন ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং শেষকালে নেতিবাদে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু রসের নিষেকে যখন মন সরস হয়, তখন তাহার অনুভূতির পরিধি অনেক দূর বিস্তৃত হয়। দার্শনিক যেখানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন,—কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তি-বলে প্রবেশ করেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, প্রবন্ধে লেখক মহাশয় একটী জ্ঞানতত্ত্বের (Theory of Knowledge) অবতারণা করিয়াছেন। দর্শন, তথা সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সত্য নিরূপণ অথবা সত্য উপলব্ধি করা। এই সত্য উপলব্ধি চিত্তের কোন্ বৃত্তির দ্বারা সাধিত হয়, তৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। সে সমস্ত মতের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা শুধু দেখিব, লেখক মহাশয়ের এতৎ সম্বন্ধে মত কি ও তাহা কতদূর সঙ্গত।

মনের যে বৃত্তির দ্বারা আমরা বিচার ও বিশ্লেষণ করি, জ্ঞান অর্থে তাহাই বুঝিতে হইবে—সুতরাং ইহাকে আমরা Intellect অথবা Understanding বলিব। চিত্তের যে বৃত্তি দ্বারা চরম সত্যের দর্শন লাভ হয়, তাহাকে 'রস' বলা হইয়াছে। অনুভূতি (Feeling) দ্বারা এই রসের আস্বাদন হয়।

বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা যে চরম সত্যের সাক্ষাৎ লাভ হয় না, এ কথা খুবই সত্য এবং এ সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমার মতদ্বৈধ নাই। এই তর্কজাল-বিস্তারক বৈশ্লেষিক বুদ্ধিবৃত্তির উপর নিন্দাবাদ শুধু যে ভারতীয় ঋষিগণই করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু পাশ্চাত্য বহু দার্শনিকও দেখাইয়াছেন, এই Intellect অথবা Understanding চরম সত্যে উপনীত হইতে একেবারে অসমর্থ। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া', 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন' এ সব আমাদের দেশের পুরাতন ঋষিবাক্য। সেন্ট বার্ণাড্ (St. Bernard), একহার্ট (Eckhart) প্রমুখ পাশ্চাত্য Mysticগণ এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। আদর্শবাদী কান্টের (Kant) 'Antinomies of the Understanding' সুবিদিত; এবং তাঁহারই অনুসরণ করিয়া Bradley তাঁহার Appearance and Reality গ্রন্থে বৈশ্লেষিক বুদ্ধিবৃত্তির অক্ষমতা দেখাইয়াছেন। বের্গস (Bergson) Intuitionএর পক্ষ লইয়া Intellectএর বিস্তর নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে লেখক মহাশয়কে আমরা Mystic বলিব, অথবা জ্ঞানবিরোধী (Anti-Intellectualist) Bergsonian বলিব? একটু প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে—Mysticগণ এবং জ্ঞানবিরোধী Bergson Intellectএর সম্বন্ধে যে সকল দোষ দেখাইয়া Intuitionism প্রচার করিয়াছেন, লেখক সেরূপ কোনও কথা বলেন নাই। বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্ব্বাসনে

দিয়া এক রহস্যময় সত্যের উপলব্ধি করা যায়, অথবা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল Realityকে বিকৃত করিয়া এক মিথ্যা জড়জগতের সৃষ্টি করে—এ সকল কোন মতই প্রবন্ধে নাই। রসের সীমা যে বুদ্ধি-বৃত্তির সীমাকে অতিক্রম করিয়া আরও অধিক দূর অবধি বিস্তৃত, এই কথাই এ প্রবন্ধে আছে।

তবে কি লেখক মহাশয়কে আমরা Kantian বলিব? Plato, Aristotle, Spinoza ইঁহারাও বিচারশীল Intellect অপেক্ষা সত্যদর্শনলাভে সমর্থ আর এক উচ্চতর বৃত্তির কথার উল্লেখ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ দার্শনিক Hegelও Understanding অপেক্ষা Reasonকে বড় বলিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয়ের মতকে উহাঁদের মতের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করা যায় কি না? উত্তরে বলিতে হয়—না; এবং এইখানেই লেখক মহাশয়ের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। Plato, Aristotle এবং Spinoza, ইহাঁদের Intuition জ্ঞানাতিরিক্ত হইলেও জ্ঞান হইতে অভিন্ন নয়; উহা জ্ঞানেরই চরম পরিণতি। যাহা কিছু সাধারণ বুদ্ধির অগম্য তাহাই, বুদ্ধির পরিণতি যে Intuition, তাহা দ্বারা পাওয়া যায়—এই কথাই ঠিক। Understanding দ্বারাই চিত্তে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। সুতরাং যাহা কিছু সাধারণ জ্ঞানের উপরে তাহা ঐ Understandingএরই চরম পরিণতি দ্বারা পাওয়া যাইবে—ইহা স্বাভাবিক।

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন—"জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ, অথবা রসনিষিক্ত মনের পরিধি জ্ঞান অপেক্ষা অনেকদূর বিস্তৃত।" ইহার অর্থ এই হয় যে, intellect যাহা জানাইতে পারে না, রস তাহা জানায়। ইহার উত্তরে আমরা বলি—রসকে জ্ঞানের সাধন বলা যায় না। যাহার কাজ আনন্দ দান করা—তাহা অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিকের বার্ত্তা কিরূপে বহন করিয়া আনিবে? আর তাহাই যদি পারে, তাহা হইলে তাহাকে "জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র" এরূপ কথা বলা অনুচিত। আনন্দ জ্ঞানেরই পরিণতি—এই কথা বলা আরও যুক্তিসঙ্গত হইবে। বর্ত্তমান সমালোচনায় আমার এই দুইটী প্রধান বক্তব্য; সুতরাং ইহাদের একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

উপনিষদে ব্রহ্মকে চিদানন্দ বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম চিন্ময় অথবা বিজ্ঞানঘন। তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং সেই জন্যই তিনি আনন্দ। পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দ একই কথা। তাই ব্রহ্মকে কখনও বা আনন্দময় বলা হয়। সুতরাং আনন্দ পরিপূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ স্বরূপ। আমাদের প্রাণের আনন্দ হইতে আমরা জানিতে পারি—আমরা সত্যের সন্ধান পাইয়াছি; সেইজন্য উপনিষদে সত্যম্ এবং আনন্দম্ একই কথা। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা পড়িয়া যদি কিছু না বুঝি, তবে আনন্দও কিছুই পাই না। যখন উহার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করি, তখন আনন্দও পাই। গণিত-বিজ্ঞানবিৎ নিউটন্ যখন মাধ্যাকর্ষণী শক্তি আবিষ্কার করিলেন, এবং Archimedes যখন জলের Specific gravity আবিষ্কার করিয়া, 'Eureka' 'Eureka' বলিয়া চীৎকার করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের প্রাণে যে আনন্দের রসধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, উহা সম্যক্ জ্ঞানেরই পরিণত ফলস্বরূপ আনন্দ।

শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলিতেছেন—রস হইতেই আনন্দ আসে, রস না থাকিলে আনন্দ থাকিত না। তাহাই যদি হইল, তবে আবার তাহা হইতে অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিকের (Metaphysical) জ্ঞান কিরূপে সম্ভব? এরূপ কথা বলায় অধ্যাপক মহাশয়ের Theory of Knowledgeএ দ্বিত্ব দোষ (Dualism in Theory of Knowledge) আসিয়া পড়ে—চিত্তে এক বৃত্তি আছে, যাহা শুষ্ক, নীরস, অসম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মায়; এবং আর এক "স্বতন্ত্র" বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা অতিজাগতিকের সরস আনন্দময় জ্ঞান হয়। অধ্যাপক মহাশয় হয়ত বলিবেন "রসের বিজ্ঞাপনী শক্তি আছে, অথবা রস জ্ঞানের সাধন এমন কথা আমি বলি নাই; প্রাণে রস থাকার নিমিত্ত নীরস জ্ঞান সরস হয়, এই কথাই বলিয়াছি।" তাহার উত্তর আমি বলি যে, তাহা হইলে "জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ...অতীন্দ্রিয় আতিজাগতিক বিষয় সম্বন্ধে মন ধারণা করিতে পারে না... কিন্তু রসের নিষেকে যে মন সরস হইয়াছে, তাহার অনুভূতির পরিধি অনেক অধিক। দার্শনিক যেখানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তি বলে প্রবেশ করে' এ সকল কথা পরিহার করা উচিত; কারণ এস্থলে রসের অতীন্দ্রিয় সম্বন্ধে (metaphysical) বিজ্ঞাপনী শক্তি আছে এই কথা সূচিত হইতেছে।

'দার্শনিক যেখানে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, কবি, শিল্পী ও ভক্ত সেখানে দিব্যশক্তির বলে প্রবেশ করিতে পারেন' এস্থলে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহাশয়ের কবি, শিল্পী ও ভক্তের উপর পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হইতেছে; কারণ তিনি কবি, শিল্পী ও ভক্তকে দিলেন 'দিব্যশক্তি' এবং গরীব দার্শনিককে Intuition হইতে বঞ্চিত করিলেন। আমরা বলি, একমাত্র দার্শনিকই এই দিব্যশক্তির (Intuition) অধিকারী ; এবং কবি, শিল্পী ও ভক্তকে চরম সত্যের উপলব্ধি করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে দার্শনিক কবি, দার্শনিক শিল্পী ও দার্শনিক ভক্ত হইতে হইবে। জ্ঞানকে ফাঁকি দিয়া সত্য জানা যায়—ইহা আমার মন বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না। লেখক মহাশয় বলিতেছেন 'জ্ঞানী দেখেন ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ আবছায়া মাত্র এবং বাধ্য হইয়া অজ্ঞেয়তাবাদে আসিয়া উপনীত হন'। ইহারও উত্তরে আমরা ঐ একই কথা বলি। দার্শনিক যখন Intellectএর গণ্ডীর মধ্যে থাকেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে এ সকল কথা ঠিক। কিন্তু তিনি যখন আমার পূর্ব্ববর্ণিত Intuitionএ আসিয়া উপনীত হন, তখন তিনি সত্যের সম্পূর্ণ বিগ্রহ দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হন। একমাত্র দার্শনিকই এই আনন্দের অধিকারী। "জ্ঞানী গঙ্গার মোহানা খুঁজিতে গিয়া বরফে আড়ষ্ট হইয়া পড়েন। কঙ্করোপলের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসেন ; কিন্তু ভাবুক ব্যক্তি গঙ্গার শীকর-শীতল বাতাস খাইয়া গঙ্গাজল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া তৃপ্ত হয়েন"—আমরা বলি এই শীকর-শীতল বাতাস খাইবার ও গঙ্গাজল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিবার অধিকারী 'ভাবুক' ব্যক্তি নহেন, তৃষিত, কঙ্করোপলে ক্ষত-বিক্ষত জ্ঞানী।

মূল প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, বলিলাম। পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমার মতামত যদি কোথাও ভ্রান্ত হয়, শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। আর আমার আলোচনা দুই এক স্থলে বিরুদ্ধ হইলেও, আশা করি, তিনি তাহাতে রুষ্ট হইবেন না। কারণ সত্যপিপাসু দার্শনিকগণ সকল মতবাদকেই সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

১

মৌন তুমি, তাই এরা এত মিথ্যা কহে !
জানে তব রুদ্রপাণি বজ্র নাহি বহে
দম্ভ দিতে দর্পিতেরে ! তুমি সংজ্ঞাহারা
পাষাণ প্রস্তর শিলা, অন্ধকার কারা !
জীবের জীবনধারা—নির্ঝরিণী নদী
যে বক্ষে লভিয়া জন্ম নিত্য নিরবধি
করুণা অমৃতস্তন্যে বসুধা বাঁচায়,
তাহারে বাঁধিবে এরা জড়ত্ব খাঁচায় !
অনন্ত রত্নের খনি নিত্য যার দান,
সে হ'ল নির্জীব নিঃস্ব—অহল্যা পাষাণ !
যোগী তুমি মৌনবাক্—এরা চাহে কথা,
সমাধি যে ভিত্তিহীনবর্ব্বর-বারতা !
দেবাত্মা কহে না কথা, মগ্ন সৃষ্টিকাজে—
বাড়িছে মিথ্যার ধুলা তাই বিশ্বমাঝে !

২

শঙ্কর করেন বাস সমুচ্চ কৈলাসে,
জগন্মাতা—জন্ম তাঁর শৈলরাজ বাসে
মেনকা মায়ের কোলে ! স্পর্দ্ধা ত অল্প না !
কার্য্যক্লীব কবিদের অলীক কল্পনা।
সেই সত্য, এরা যারে সত্য বলি মানে
আপন সঙ্কীর্ণ দুটি দৃষ্টিমাঝখানে ;
দুদিনের বিজ্ঞানের তথ্যে রাখে বাঁধা
বিশ্বের বিধানবার্ত্তা না মানিয়া বাধা
অন্তরের দিক্ হ'তে ; আত্মায় প্রলাপ
দুর্ব্বলের সৃষ্টি বলি দেয় অভিশাপ ;
অর্থছাড়া নিরর্থক সকলি বিশ্বের,
নিখিল গৌরব বাঁধা যাহাতে নিঃস্বের।
সেই শিক্ষা শ্রেষ্ঠ যার যত আস্ফালন,
বাকী সব মিথ্যা মাত্র, ভীরুর স্বপন !

প্রার্থনা

শিল্পী—মহম্মদ আবদার-রহমান চগ্‌তাই

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১৯)

রেখা প্রিন্সিপ্যালকে বলিয়া, খুব ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাশে পড়াইবার ভার চাহিল। ভার পাইয়া সে আনন্দিত হইল। সে ভাবিল যে এই ছোট মেয়েরা তাকে দুই বছরেই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। আট নয় বৎসর করিয়া অন্ততঃ তারা থাকিবে। তা' ছাড়া ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিয়া, খেলিয়া, তাদের সব ছোট ছোট কান্না-হাসি, খেলা-ধুলায় যোগ দিয়া, সে মনের ভিতর এমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দেব সন্ধান পাইল যে, সে আপনি অবাক হইয়া গেল। তার ছাব্বিশ বছরের যৌবনের তলায় যে তৃষিত মাতৃহৃদয় লুকাইয়া ছিল, সে এখন ঝাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল,—সে আকুল ভাবে শিশুদের কাছে আত্মসমর্পণ করিল।

এই ছোট মেয়েদের পড়াশুনার চেহারা ফিরিয়া গেল। স্কুল-গৃহ একটা খেলাঘর হইয়া দাঁড়াইল—আর রেখা তাদের খেলার সাথী। বড় কেউ যদি তাদের খেলায় যোগ দেয়, তাতে শিশুদের যে আনন্দ, তাহা বলিবার নয়। তাহারা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। এই খেলার ভিতর দিয়া রেখা যে তাদের কোন ফাঁকে কেমন করিয়া অনেকটা লেখাপড়া শিখাইয়া দিল, তাহা তারা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিল না। রেখা যখন কাহাকেও কোনও একটা জিনিষ পড়িতে বলিত, তখন সে চেয়ারে বসিয়া বেঞ্চের কাছে দাঁড়ান মেয়েকে পড়িতে হুকুম করিত না। হয় সে উঠিয়া সেই মেয়ের কাছে যাইত, না হয় সে মেয়েকে কাছে ডাকিয়া লইত। কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া শিশুর সেই কোমল মসৃণ গালের সঙ্গে মুখ লাগাইয়া সে তাকে পড়িতে বলিত। শিশু আনন্দের নেশায় মশগুল হইয়া পড়িয়া যাইত। ক্লাশের আর সবাই ছটফট করিত, কখন রেখা তাহাদের ডাকিবে!

এক একটা মেয়ে বড় বোকা। অন্য শিক্ষয়িত্রীরা তাদের গালাগালি দেন বা অগ্রাহ্য করেন। রেখা তাদের কোলে টানিয়া লইয়া তার সঙ্গে আলাপ করিত। খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে তার মনের সন্ধান লইত। তার ব্যর্থতার ব্যথায় রেখার নিজের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। ঠিক কোন-খানে তার বাধিতেছে সেই কথাটা আবিষ্কার করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। আর তাহার সন্ধান পাইয়া সে ঠিক সেইখান হইতে তার শিক্ষা আরম্ভ করিত। আর সে এমন করিয়া স্নেহ ও উৎসাহ দিয়া মেয়েটির অন্তর ভরিয়া দিত যে, তার চরিত্র একদম বদলাইয়া যাইত। সে শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইত, শিখিবার শক্তি পাইত।

রেখাকে এ মেয়েরাও আর সবার মত রেখাদি' বলিত। কিন্তু রেখা তাদের বলিল, তাকে মাসিমা বলিতে হইবে। সকলে তাহাকে মাসিমা করিয়া লইল। "মাসিমা"র ভিতর

যে "মা"টুকু ছিল, তার মাধুর্য্যেই তার অন্তরে অপূর্ব্ব সুধা বর্ষণ করিত।

রেখার জীবনে এখন আর কোনও কাজ ছিল না। স্কুলে ও বোর্ডিংএ সে এই মেয়েদের ভিতর ডুবিয়া তন্ময় হইয়া থাকিত—তার আর কোনও কাজ বা মন বসাইবার আর কোনও বিষয় ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে সে মনে করিত সৌরীনের কথা। সে কোথায়? কি করিতেছে? রেখার কথা তার একবারও মনে পড়ে কি না সে কথা ভাবিত। কিন্তু কোনও মতেই সে সৌরীনের কোনও সন্ধান পাইল না।

সুচরিতার বিবাহ পাটনায়ই হইল। রেখার তাতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেখানে গিয়া সে প্রসঙ্গক্রমে শুনিতে পাইল যে, দেশবিখ্যাত বাগ্মী নিত্যরঞ্জন বাবু এ বিবাহে আসিয়াছেন। বরটি না কি নিত্যরঞ্জনের খুড়তুত ভাই। অনেক পুরাতন কথা মনে উঠিল। নিত্যরঞ্জনের উপর তার অনেক দিনকার পুরাতন আক্রোশ ছিল; কেন না, নিত্যরঞ্জন ছিল সৌরীনের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং রেখার বিরুদ্ধাচারী। সে পুরাতন বিরাগ পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। সে দেখিতে পাইল, নিমন্ত্রিত সমস্ত মেয়েছেলের দল আকুল হইয়া নিত্যরঞ্জনকে সুধু একবার দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেল। জানালার কাছে ভিড় ঠেলিয়া ছুঁচও প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতে রেখা প্রাণের ভিতর দারুণ জ্বালা অনুভব করিল।

কিন্তু তার সমস্ত বিরোধ ছাপাইয়া উঠিল তার কৌতূহল। নিত্যরঞ্জন সৌরীনের যত বড় শত্রু হোক, সে যত তুচ্ছ ও নগণ্য হোক, সে সৌরীনের আত্মীয় ও সৌরীনের খবর রাখে। তার কাছে সৌরীনের খবর লওয়া যায় কিরূপে? সে ছটফট করিতে লাগিল।

বিবাহ হইয়া বরকন্যা যখন বাড়ীর ভিতর আসিল, রেখা তখন বরের সঙ্গে আলাপ করিল। প্রসঙ্গক্রমে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি সৌরীন বাবুকে চেনেন?" জিজ্ঞাসা করিয়াই সে বুকের ভিতর দারুণ আন্দোলন অনুভব করিল। কি জানি এ কি বলিবে ভাবিয়া তার অন্তর কাঁপিতে লাগিল—যদি সৌরীনের কোনও অমঙ্গল সংবাদ পায় তাই ভাবিয়া সে ব্যাকুলও হইল।

বর বলিল, "কোন্ সৌরীন বাবু?"

তখন রেখার মনের ভিতর একটা নিদারুণ ক্ষোভ জ্বলিয়া উঠিল। সৌরীনকে যে এ চেনে না—বাঙ্গলা দেশের কোনও লোক যে সেই ত্যাগী মহাত্মাকে চেনে না—এ কথা তার অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল। আর কিছু না হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র বলিয়া তো সবাই তাকে চেনে,—যে Finance Departmentএর চাকরীর জন্য এ ব্যক্তি লালায়িত, সে চাকরী পাইয়া যে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাকে তো অন্ততঃ চেনে। সুতরাং "কোন্ সৌরীন?" এ প্রশ্নের ভিতর রেখা একটা স্পর্দ্ধাভরা অবজ্ঞার ছায়াপাত লক্ষ্য করিল—এ নিত্যরঞ্জনের ভাইয়ের যোগ্য বটে!

রেখা বলিল, "না, আপনি বোধ হয় তাঁকে চেনেন্ না,—তিনি আপনার পাঁচ ছ' বছরের সিনিয়ার,—আমাদের এক বছর আগে পাশ ক'রেছিলেন।"

বর বলিল, "ও সৌরীন-দা, তাঁকে চিনবো না কেন?"

রেখা বাঁচিল,—বরের উপর তার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় আছেন বলতে পারেন কি?"

"না; সাত আট বছর হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। ছ বছর আগে তিনি গ্রামে এসে তাঁর সম্পত্তি বেচে গিয়েছেন শুনেছি। আমি তখন দেশে ছিলাম না।"

"সম্পত্তি বেচেছেন? কেন?"

"তা জানি না। বোধ হয় কিছু ব্যবসা করবেন। তা ছাড়া, শুনলাম, দেনা-পত্তরও না কি তাঁর হ'য়েছে। আপনি তাঁকে চেনেন?"

রেখা কষ্টে বলিল, "কলেজে থাকতে তাঁর সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল।" আর কথা বলিতে তার সাহস হইল না। তার বুক ফাটিবার উপক্রম হইতেছিল। দারুণ উৎকণ্ঠা ও আবেগে তার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটাইয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রেখা নিত্যরঞ্জনের কাছে চিঠি লিখিয়া তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। চিঠি পাইয়াই নিত্যরঞ্জন ছুটিয়া আসিল।

রেখা তার অন্তরের সব বিরুদ্ধতা কষ্টে দমন করিয়া বিশেষ সৌজন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে বড় কষ্ট দিলাম। অনেক দিন হ'ল আপনার বন্ধুর কোনও

খবর জান্‌তে পারি নি। কাল শুনলাম, তিনি না কি তাঁর সব সম্পত্তি বেচে ফেলেছেন। কেন হঠাৎ এমন ক'রলেন, আর তিনি কোথায় কি ক'রছেন, সেটা জানবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আপনি নিশ্চয় তাঁর খবর জানেন।"

নিত্যরঞ্জন অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিল, "আপনি যে আমাকে কি লজ্জা দিলেন, তা' আমি ব'লতে পারি না। সৌরীনের খবর আমার রাখা অত্যন্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু অনুতপ্ত হ'য়ে স্বীকার করছি যে, সে খবর আমি এত দিন মোটেই রাখি নি। আমার এ ত্রুটির কোনও ক্ষমা নেই। তা' আমি এবার গিয়ে সর্ব্বাগ্রে সমস্ত সংবাদ নিয়ে তার পর আপনাকে জানাব।"

"তিনি কি ক'রছেন বলে আপনার মনে হয়?"

"আমি কিছুই ব'লতে পারছি না। এ কথা আজ আপনার কাছে বলতে হ'চ্ছে যে কত লজ্জার সঙ্গে, তা' কি বলবো।"

রেখার প্রাণ এ কথায় যে সব দারুণ আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল, সেগুলিকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিতেও রেখার ভয় হইতেছিল। এত দিন তবে সে মূর্খের মত সুধু চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে সৌরীনের উপর অভিমান করিয়া মাঝে মাঝে কাঁদিয়াছে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সে এই ভাবিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে যে, সৌরীনকে সে বাধামুক্ত করিয়া যে মহত্ত্বের পথে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে, সে পথে সে পায় পায় অগ্রসর হইয়া হয় তো এত দিনে বিরাট কোনও কর্ম্ম করিয়া, নিজের অক্ষয় গৌরব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছে। সে স্বপ্ন এত মিথ্যা, যে, নিত্যরঞ্জনের মত বন্ধুও সৌরীনের কোনও খবরই রাখে না। তা' ছাড়া, এমন বিপন্ন সে হইয়াছে যে, তার পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছে। আর রেখা যে এত দিন ধরিয়া তার বেতনের প্রায় সমস্ত টাকা সঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে—কেবল সৌরীনের হাতে সমর্পণ করিয়া তার মহৎ কার্য্যের সহায়তা করিবে বলিয়া। তার ব্যাঙ্কে আজ পোনেরো হাজার টাকা, আর সৌরীনকে বিপন্ন হইয়া তার ভদ্রাসন শুদ্ধ সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইয়াছে!—এ সব রেখার দোষ, সেই তো এমন করিয়া সৌরীনকে ছাড়িয়া দিয়াছে যে, সৌরীন তার ঠিকানা পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। হয় তো সে ঠিকানা জানিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। তাই তার এত বিপদের ভিতর সে রেখাকে কিছুই জানায় নাই।

নিত্যরঞ্জন চলিয়া গেলে, রেখা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সৌরীনের সংবাদ জানিবার জন্য সে এত ব্যগ্রতা অনুভব করিল যে, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। ঘরের এক পাশ হইতে আর এক পাশে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নানা রকম অদ্ভুত উপায় তার মনে হইতে লাগিল, কিন্তু কোনওটাতেই কোনও ফল হইবে মনে হইল না। অনেকক্ষণ অনবরত ছুটাছুটি করিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া সে শুইয়া পড়িল।

(২০)

লীলা ঠিক করিল, নিত্যরঞ্জন রেখার পুরাতন প্রণয়ী। অনেক দিন বিচ্ছেদের পর দেখা হইয়াছে, তাই রেখা এমন ব্যথিত হইয়াছে। সে আস্তে আস্তে রেখার মাথার কাছে বসিয়া, তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুমি এমন বিচলিত হ'চ্ছ কেন ভাই? কিসের দুঃখ তোমার?"

এ সহানুভূতির কথায় রেখার দুই চক্ষু বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে অনেকক্ষণ মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া শেষে বলিল, "আমার দুঃখ লোকের কাছে বলবার নয়।"

"আমার কাছেও নয়?"

রেখা অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "না ভাই, এ কারো কাছে বলবার নয়। কি বলবো? কেউ তো এ বুঝবে না। আমি একজনকে ভালবাসতাম, সে আমাকে বোধ হয় ভালবাসতো। আমাদের বিয়ে হ'ল না, দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়লুম। এ কথা শুনে লোকে এক-আধটু আহা উহু করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভাববে যে, এ তো সর্ব্বদাই হ'চ্ছে—এর জন্য এতটা বাড়াবাড়ি কেন? কেন না, এর তলায় যে সব বড় বড় কথা আছে, সে কথা তো লোককে বুঝান যাবে না।"

"তিনি কি অন্য কাউকে বিয়ে ক'রেছেন?"

কথাটায় রেখার অন্তর যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে জোরের সহিত বলিল, "না, সে অসম্ভব—তিনি তেমন হাল্কা লোক নন।"

"তবে তুমি ওঁকে বিয়ে কর না কেন?"

"সেই জন্যই তো বলছি ভাই, আমার কথা কেউ বুঝবে

না। এ কথা কাউকে বলবার জো নেই। বিধাতার এই বিধান লীলা, আমরা তুজন তুজনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসবো, অথচ আমাদের মিলন হ'বে না।"

লীলা বলিল, "সত্যিই তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। তোমাদের বিয়ের অন্তরায়টা কি ?"

"সে কথা শুনলে তুমি হাসবে। অন্তরায় সুধু এই যে, তাঁর অন্তরটা প্রকাণ্ড, আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র আধারে সে ধরে না।"

রেথাকে স্নেহালিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া লীলা সস্নেহে বলিল, "আমাকে সব কথা খুলে বলবে না ভাই ? তোমার কথাগুলো যে হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে।"

রেখা কাঁদিয়া বলিল, "না ভাই, ক্ষমা করো। তাঁর ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য হ'য়েছি—তাঁর বিরাট অন্তর তিনি আমার কাছেই সুধু খুলে দেখিয়েছেন। আমি তাঁর গোপন কথা অন্যের কাছে বলে তাঁর সে মহত্বের অপমান করবো না। আর কেউ তো তাঁকে আমার মত বুঝবে না।"

"কিন্তু আমি বুঝবো, তুমি বল আমায়।"

"না ভাই, এ ব্যথা আমার গোপন সম্পদ, তোমার মত বন্ধুকেও এ বলবার জো নেই। তা ছাড়া, গুছিয়ে বলতে আমি পারবোও না। আমি যা জেনেছি তার বেশীর ভাগ আমার অন্তরের অস্পষ্ট অনুভূতি মাত্র ; তা কথায় গুছিয়ে বলতে গেলে এত ভুল হয় তো হ'বে যে তুমি ভুল বুঝবে।"

"আচ্ছা, একটা কথা বল, বিয়েটা ভাঙ্গলে কে ? তিনি না তুমি ?"

"আমিই ভেঙ্গেছি লীলা। আর সেজন্য আমার সুধু তুঃখ নেই তা নয়। এতবড় ত্যাগ করতে পেরেছি বলে' আমার বেশ গর্ব্ব হয়।"

ইহার কিছু দিন পরে নিত্যরঞ্জন রেথাকে জানাইল, সে এখন পর্য্যন্তও সৌরীনের কোনও সংবাদ পায় নাই। সে নানা দিকে অনুসন্ধান করিতেছে। সব কাজ ছাড়িয়া সে তাহার সন্ধান জানিয়া রেথাকে জানাইবে।

ইহার তুই মাস পরে রেথা নিত্যরঞ্জনের আর এক চিঠি পাইল। তাহাতে সে লিখিল, সৌরীন ময়মনসিংহে কিছু দিন পূর্ব্বে জুতা ও কাপড়ের দোকান করিয়াছিল। সে দোকানের বাবদে অনেক দেনাপত্র হওয়ায় সে কোথায় পলাইয়াছে, তার সন্ধান কেহ জানে না। তার নামে অনেক টাকার ডিক্রী লইয়া মহাজনেরা সন্ধান করিতেছে।

এ পত্র পড়িয়া রেথা একেবারে বসিয়া পড়িল। এই কি তবে তার সর্ব্বস্ব ত্যাগের ফল—এই সৌরীনের মহৎ ত্যাগ-ব্রতের পরিসমাপ্তি ! এই কি সেই দেবতা, যাকে সে অন্তরে স্থাপন করিয়া দিনরাত শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়াছে ! রেথাকে বিবাহ করিলে জীবন সার্থক হইবে না বলিয়া যে রেখার কাছে মুক্তি লইয়া গেল, সে কি না তার পর একখানা কাপড়ের দোকান ফাঁদিয়া ব্যবসা করিতে বসিল, আর তার পর মহাজনদের ঠকাইয়া পলাইল !

কিন্তু তখনি তার মনে হইল, ইহা অসম্ভব। রেথাকে না হয় সৌরীন অশ্রদ্ধায় ছাড়িতে পারে। কিন্তু সে তো কাপড়ের দোকান করিবার জন্য Finance Departmentএর বড় চাকরী ছাড়িয়া দেয় নাই। আর প্রাণ গেলেও তার মত মহাপ্রাণ যুবক কখনও কাহাকেও ঠকাইতে পারে না। নিত্যরঞ্জন সব খবর পায় নাই। হয় তো সৌরীন অর্থকষ্টে বিপন্ন হইয়া মারা গিয়াছে, হয় তো সে বিপদে কেহ তাহাকে সাহায্য করে নাই। রেথার এত টাকা যার জন্য জমান রহিয়াছে, সে যদি অনাহারে, কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবে রেথার তুঃখ রাখিবার যে ঠাঁই থাকিবে না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া রেথা তার কর্ত্তব্য স্থির করিল। ক্রমে তার মনে সন্দেহ রহিল না যে, সৌরীন ঋণজালে জড়িত হইয়া কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রেথা তো তার জীবিত-কালে কিছুই করিতে পারিল না, এখন অন্ততঃ তার কলঙ্ক মোচন করিয়া তার কর্ত্তব্য পালন করিবে।

(ক্রমশঃ)

প্রথম বাঙ্গালী *

শ্রীহিমাংশুবালা ভাতুড়ী

১। হাইকোর্টের জজ প্রথম-বাঙ্গালী
রমাপ্রসাদ রায়

২। হাইকোর্টের চীফজাষ্টিস প্রথম বাঙ্গালী
স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

৩। হাইকোর্টের আই-সি-এস (অস্থায়ী) জজ প্রথম বাঙ্গালী
বিহারীলাল গুপ্ত

৪। এরোপ্লেনে উঠেন প্রথম বাঙ্গালী রমণী
রাণী মৃণালিনী

৫। হাইকোর্টের আই-সি-এস্ (স্থায়ী) জজ প্রথম বাঙ্গালী
স্যার বসন্তকুমার মল্লিক

৬। স্যার উপাধি পান প্রথম বাঙ্গালী
স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাতুর

৭। ডিভিসনাল কমিশনার প্রথম বাঙ্গালী
রমেশচন্দ্র দত্ত

৮। সার্জ্জন জেনারল প্রথম বাঙ্গালী (অস্থায়ী) কর্ণেল
মন্মথনাথ চৌধুরী আই-এম-এস্

৯। মুন্সেফ হইতে হাইকোর্টের জজ প্রথম বাঙ্গালী
স্যার প্রমদারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। পোষ্ট্ এণ্ড টেলিগ্রাফের অ্যাসিষ্ট্যান্ট্ ডিরেক্টার জেনারল
প্রথম বাঙ্গালী—রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাতুর

১১। অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল প্রথম বাঙ্গালী
মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য

১২। অ্যাড্ভোকেট জেনারেল প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

১৩। ফুটবল খেলায় কৃতিত্ব লাভ করেন প্রথম বাঙ্গালী
শিব ভাতুড়ী ও বিজয় ভাতুড়ী

১৪। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বার প্রথম বাঙ্গলী
স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

১৫। স্বরাজ্য-নীতির প্রধান প্রবর্ত্তক প্রথম বাঙ্গালী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

১৬। আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট্ প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

১৭। ইংরাজী কবিতায় যশস্বিনী হন প্রথম বাঙ্গালী মহিলা
তরু দত্ত

১৮। পদার্থ-বিজ্ঞানে কৃতিত্ব লাভ করেন প্রথম বাঙ্গালী
আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

১৯। বিলাতে লর্ড সভার সভ্য প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

২০। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রথম বাঙ্গালী
মধুসূদন গুপ্ত

২১। ভারতের বাহিরে নাট্যকলায় কৃতিত্ব দেখান প্রথম বাঙ্গালী
নিরঞ্জন পাল ও সীতা দেবী

২২। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মহিলা সভ্যা প্রথম বাঙ্গালী মহিলা
স্বর্ণকুমারী দেবী

২৩। মিলিটারী ফাইনান্সিয়াল অ্যাড্ভাইসার প্রথম বাঙ্গালী
স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

২৪। ইংরাজী কাব্য-লেখক প্রথম বাঙ্গালী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

২৫। রেভিনিউ বোর্ডের প্রথম বাঙ্গালী মেম্বার
স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

২৬। আধুনিক যুগের দয়ার সাগর প্রথম বাঙ্গালী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

২৭। ষ্টান্ডিং কাউন্সিল হন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

২৮। পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করেন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

২৯। ভারতে দার্শনিক কবি প্রথম বাঙ্গালী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০। আধুনিক যুগের ত্যাগের আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রথম বাঙ্গালী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

৩১। ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রথম বাঙ্গালী
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩২। অধ্যবসায় দ্বারা সামান্য চাকুরী হইতে চরম উন্নতির আদর্শ দৃষ্টান্ত
প্রথম বাঙ্গালী—স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

* এই তালিকায় প্রকাশিত মহোদয়গণের আলোক-চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ এই সংগ্রহ-কার্য্যে সহায়তা করিলে কৃতজ্ঞ হইব।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

৩৩। কেমব্রিজে স্মিথ প্রাইজ পান প্রথম বাঙ্গালী
ভূপতি সেন

৩৪। লণ্ডন বিশ্ববিত্যালয়ের ডি-এসসি প্রথম বাঙ্গালী
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

৩৫। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম বাঙ্গালী মহিলা সভানেত্রী
সরোজিনী নাইডু

৩৬। পোষ্ট্ এণ্ড্ টেলিগ্রাফের ডিরেক্টার জেনারল প্রথম বাঙ্গালী
জ্ঞানেন্দ্রপ্রসন্ন রায়

৩৭। বিলাতের ক্যাবিনেটের সভ্য প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

৩৮। চীফ এঞ্জিনিয়ার প্রথম বাঙ্গালী
রাজেশ্বর মিত্র

৩৯। চীফ সেক্রেটারী প্রথম বাঙ্গালী
স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪০। ইম্পিরিয়াল সার্ভিসে নাইট উপাধি পান প্রথম বাঙ্গালী
স্যার বসন্তকুমার মল্লিক আই-সি-এস

৪১। ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের কর্ণেল প্রথম বাঙ্গালী
কে, পি, গুপ্ত

৪২। তিব্বত ভ্রমণকারী প্রথম বাঙ্গালী
রাজা রামমোহন রায়

৪৩। ডেপুটী কমিশনার অব্ পুলিস প্রথম বাঙ্গালী
রায় পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর

৪৪। ভারতের বাহিরে প্রথম হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক বাঙ্গালী
স্বামী বিবেকানন্দ

৪৫। ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সমর্থক প্রথম বাঙ্গালী
রাজা রামমোহন রায়

৪৬। স্যানিটারী কমিশনার প্রথম বাঙ্গালী
কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত

৪৭। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন প্রথম বাঙ্গালী
নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

৪৮। বিশ্ববিত্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার প্রথম বাঙ্গালী
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৯। কিংস কাউন্সেল হন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

৫০। ভারতের বাহিরে প্রথম বাঙ্গালী বাগ্মী
কেশবচন্দ্র সেন

৫১। সসম্মানে আই-সি এস পদত্যাগ করেন প্রথম বাঙ্গালী
সুভাষচন্দ্র বসু

৫২। ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্য চিত্রকলায় কৃতিত্ব লাভ করেন
প্রথম বাঙ্গালী—শশিকান্ত হেষ

৫৩। ভারতের বাহিরে সৈনিক বিভাগে কৃতিত্ব লাভ করেন
প্রথম বাঙ্গালী—কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

৫৪। ভারতের বাহিরে প্রাচ্য গীত বাত্তে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন
প্রথম বাঙ্গালী মহিলা—সত্যবালা দেবী

৫৫। প্রাচ্য চিত্রকলার প্রবর্ত্তক প্রথম বাঙ্গালী
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৬। গভর্ণর প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

৫৭। নোবেল প্রাইজ পান প্রথম বাঙ্গালী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৮। কংগ্রেসের সভাপতি প্রথম বাঙ্গালী
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৯। বেলুনে উঠেন প্রথম বাঙ্গালী
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬০। ব্যারিষ্টারী পাশ করেন প্রথম বাঙ্গালী
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর

৬১। আই-সি-এস, পরীক্ষায় শীর্ষস্থানীয় হন প্রথম বাঙ্গালী
স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৬২। বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য প্রথম বাঙ্গালী
স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

৬৩। কেমব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী
র‍্যাংলার আনন্দমোহন বসু

৬৪। লর্ড উপাধি পান প্রথম বাঙ্গালী
লর্ড সিংহ

৬৫। আই-সি-এস পরীক্ষা পাশ করেন প্রথম বাঙ্গালী
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৬। রয়েল সোসাইটীর সদস্য প্রথম বাঙ্গালী
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এফ-আর-এস

অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে ও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি; ভ্রম-প্রমাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। শেষোক্ত দশটী নাম ইতঃপূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ময়মনসিংহের মহিলা-কৃত্তিবাস

শ্রীচন্দ্রকুমার দে

বনে অনেক সময় এমন ফুল ফুটে, রাজোত্তানেও যাহার তুলনা মিলে না। কিন্তু সে বনফুলের সৌরভ কেহ উপলব্ধি করিতে, কিম্বা সে সৌন্দর্য্য কেহ ভোগ করিতে পারে না। বনের ফুল বনে ফুটে, বনেই শুকায়। চন্দ্রাবতী এইরূপ একটি বনফুল। ময়মনসিংহের "নল থাগড়ার বন" আলোকিত করিয়া, এক সময়ে এই সুরভি কুসুম ফুটিয়াছিল।

বহু দিন পূর্ব্বে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশের কোনও অজ্ঞাতনামা পল্লীতে বসিয়া একজন মহিলা কবি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন—এ কথা ভাবিতে গেলেও প্রাণ আনন্দরসে ভরিয়া উঠে। বাস্তবিক সে দিনের কথা ময়মনসিংহের পক্ষে অতীব গৌরবের কথা। শুধু রামায়ণ নহে—কবি চন্দ্রাবতী নানাবিধ মেয়েলী সঙ্গীত, ছড়া ইত্যাদি রচনা করিয়া, অল্প বয়সে কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যাঁহার কবিতা লোকের প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে সর্ব্বদা প্রিয়জনের স্মৃতির ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসিয়া বেড়ায়,—ছোট-বড় নাই, স্থান-অস্থান নাই, ঘাটে-মাঠে, যেখানে-সেখানে যাঁহার সঙ্গীত সর্ব্বদা মানুষের মুখে মুখে ফেরে, তিনিই সাধারণের প্রাণের কবি। চন্দ্রাবতী পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের সর্ব্ব-সাধারণের প্রাণের কবি ছিলেন। বহু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি—সেই অপূর্ব্ব মন-প্রাণ-মাতান সঙ্গীত। মাঠে কৃষক-শিশুর মুখে, অঙ্গনে কুল-কামিনীর মুখে, ঘাটে-বাটে, যেখানে-সেখানে, মন্দিরে, প্রান্তরে, বিজনে, পুলিনে সেই সঙ্গীত—বিবাহে, উপনয়নে, অন্নপ্রাশনে, ব্রতে, পূজায় সেই সঙ্গীত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাণে আসিয়া বাজে—মরমের ভিতর প্রবেশ করে। সেই সঙ্গীতের মৃদুতর শেষ চরণটিতে মহিলা-কবির স্মৃতিটি আনিয়া দেয়। প্রায়ই শুনি 'চন্দ্রাবতী ভণে' 'চন্দ্রাবতী গায়'। শ্রাবণের মেঘভরা আকাশ-তলে ভরা নদীতে যখন বাইকগণ সাঁঝের নৌকা সারি দিয়া বাহিয়া যায়—তখন শুনি সেই চন্দ্রাবতীর গান। বিবাহে কুলকামিনীগণ নববধূকে স্নান করাইতে—জল ভরণে যাইতেছে—সেই চন্দ্রাবতীর গান। তার পর স্নানের সঙ্গীত—ক্ষৌরকার বরকে কামাইবে তাহার সঙ্গীত—বর-বধূর পাশা খেলা—সে কত রকম!

এখন দেখা যাক—এই চন্দ্রাবতী কে? শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে—আজও যাঁহার গান, যাঁহার ছড়ায় মানুষ এমন ভাববিভোর হইয়া রহিয়াছে—তিনি কে? ময়মনসিংহের জন্য তিনি এমন কি করিয়াছেন যে, আজও তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ ময়মনসিংহবাসী তাঁহার চরণোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন? আজও ময়মনসিংহের ক্রিয়াকাণ্ড, উৎসব-সকলে চন্দ্রাবতী-স্মৃতি বিজড়িত। সমস্ত পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ প্লাবিত করিয়া চন্দ্রাবতীর গান। সেখানে আনিয়া দেয় পৃথিবীর অপ্রাপ্য বস্তু—শীতল করে তাপিত প্রাণ।

চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের একমাত্র কন্যা—কল্পবৃক্ষের সুধাফল। চন্দ্রাবতীর পিতার পরিচয় অনাবশ্যক। ইনি প্রাচীন সাহিত্যের একটি সম্মানিত রত্নাসনের অধিকারী। প্রসিদ্ধ মনসা-ভাসান রচকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বংশীবদন কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, সুধু তাহাই নহে; মনসা-মঙ্গলের একজন প্রসিদ্ধ গায়কও ছিলেন। প্রবাদ আছে—তাঁহার গান শুনিয়া ভাটিয়ার নদী উজান বহিত—বনের পশুরা মুগ্ধ হইয়া পড়িত,—শাখের পাখীরা কাকলী বন্ধ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশ এই প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষের অন্ন-সংস্থান করিয়া দিতে পারিত না। কবি ভাসান গাহিয়া অতি কষ্টে জীবিকার্জ্জন করিতেন। চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণে তাঁহাদের বংশ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পারিবারিক দুঃখকাহিনী অশ্রুর অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃঃ দ্বিজ বংশীর মনসা-মঙ্গলের রচনা শেষ হয়। বংশীদাস—বৃন্দাবন, লোচন-

দাসের সমসাময়িক কবি। এই পদ্মাপুরাণে কবি চন্দ্রাবতীর অনেক ভণিতা দৃষ্ট হয়। পুরাণ রচনায় কন্যা পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপা ছিলেন। দেখা যায়, ১৫৫০ হইতে ১৫৭৫ খৃঃ মধ্যে চন্দ্রাবতী জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রাবতী স্বীয় রামায়ণের প্রারম্ভে বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন —

ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘড়ণী
বাঁশের পালায় ঘড় ছনের ছাউনী
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়

* * * *

দ্বিজ বংশীপুত্র হইল মনসার বরে
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে
ঘড়ে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি
চালকড়ি যাহা পান মনসার বরে
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে

* * *

বাড়াতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী
তার ঘড়ে জন্ম লৈল চন্দ্রা অভাগিনী

বন্দনায় চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন—

সুলোচনা মাতা কন্দুম দ্বিজবংশী পিতা
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা
মনসা দেবীরে বন্দি করি কর যোর
যাহার প্রসাদে হইল সর্ব্ব দুঃখ দুর
ব্রহ্মপুত্র নদ বন্দি সর্ব্বদেবময়
যাঁর জলে স্নানে নাহি পুনজন্ম হয়

* * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।

চন্দ্রাবতী তাঁহার আত্মজীবনী সম্বন্ধে স্বীয় বিরচিত রামায়ণে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত কি? কি কারণে পিতা তরুণী কন্যাকে রামায়ণ রচনার উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কবি নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। নয়ানচাঁদ ঘোষ নামক এক প্রাচীন পল্লীকবি মধুরাক্ষরা ভাষায় চন্দ্রাবতীর জীবনের এক বিয়োগান্ত কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া মহিলা-কবির জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

নয়ানচাঁদের কাব্যের প্রারম্ভ—

"চারকোণা পুষ্কুণীর পারে চাম্পা নাগেশ্বর
ডাল ভাল পুষ্প তোল কে তুমি নাগর
আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐ না নদীর পার
কি কারণে তোল কন্যা লো মালতীর হার"

চন্দ্রাবতী পিতার জন্য পুষ্প চয়নে আসিয়াছিলেন। উচ্চ-শাখায় স্তবকে স্তবকে চাম্পা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছিল। সাজি হস্তে চন্দ্রাবতী সেই ফুলগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। দৈবাৎ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন প্রতিবাসী জয়ানন্দ। চন্দ্রাবতী ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। জয়ানন্দ অগ্রসর হইয়া ফুল সমেত চাম্পাশাখা নত করিয়া ধরিলেন, চন্দ্রাবতী ফুল তুলিতে লাগিলেন। ফুল তোলা শেষ হইল; সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্ব্বিকার-হৃদয়া যোগ-শান্ত তপশ্চারিণীর মনের মধ্যে, সাংসারিক প্রেমের সুখ দুঃখের একটা আকস্মিক লহরী বিদ্যুতের মত খেলাইয়া গেল। চন্দ্রাবতী ফুল তুলিয়া লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। জয়ানন্দও ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়া গেলেন। কেহ কাহাকেও নিজ মনের ভাব বুঝিতে দিলেন না। কেবল তাঁহাদের উদাস দৃষ্টি ও অলস পাদবিক্ষেপ-প্রণালী দেখিয়া কতক বুঝিল ঐ আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথ, আর কতক বুঝিল পথিপার্শ্বস্থ মূক তরুলতা।

কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া পিতা বংশীদাস চিন্তিত হইলেন। চন্দ্রাবতী পরমা সুন্দরী। বয়সে তরুণ হইলেও তিনি অল্পকাল মধ্যেই কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার অনন্যসাধারণ রূপগুণের ব্যাখ্যা শুনিয়া বহু সম্ভ্রান্ত যুবক তাঁহার পাণিগ্রহণে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু চন্দ্রার প্রাণের দেবতা সেই জয়ানন্দ। সেদিনকার মিলনোত্থানে সেই অযাচিত সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রাবতী তাঁহার হৃদয়-দেবতার পদে সমস্ত জীবন-যৌবন উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছিলেন।

বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গেল। এমন সময় এক বিষম অনর্থ ঘটিল। অলক্ষ্য হইতে নিদারুণ বিধাতা কল ঘুরাইলেন। মুর্খ যুবক এক মুসলমান রমণীর

প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। সে বুঝিল না—কি অমূল্য রত্নই না সে হেলায় হারাইল !!!

অদৃষ্টের এই ঘাত-প্রতিঘাতে চন্দ্রার কোমল হৃদয়টি ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বহু দিন পরে মন স্থির করিয়া শিবপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। কন্যা স্নেহময় পিতার চরণে দুইটি প্রার্থনা জানাইলেন। একটি শিবমন্দির স্থাপন—অন্যটি তাঁহার চিরকুমারী থাকিবার বাসনা। কন্যাবৎসল পিতা উভয় প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন—সেই সঙ্গে দুহিতাকে সংসারের সুখ-দুঃখের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিলেন। পাছে অন্য চিন্তায় চন্দ্রার তরুণ হৃদয়ে কোনও ভাবান্তর ঘটে, সেই জন্য বংশীদাস কন্যাকে অবসর কালে রামায়ণ লিখিতে আদেশ করিলেন। চন্দ্রাবতী কায়মনোবাক্যে শিবপূজা করিতেন, ও অবসর কালে রামায়ণ লিখিতেন।

ইতোমধ্যে আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। চির-অনুতপ্ত চন্দ্রাবতীর সেই প্রণয়ী যুবক তুষানলে পুড়িয়া পুড়িয়া দুর্ব্বিষহ জীবনভার সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দ্রাবতীর নিকট একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ কামনা করিল। চন্দ্রাবতী পিতাকে সমস্ত জানাইলেন। পিতা অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুমি যে দেবতার পূজায় মন দিয়াছ, তাঁহারই পূজা কর। অন্য কামনা হৃদয়ে স্থান দিও না। চন্দ্রাবতী একখানা পত্র লিখিয়া যুবককে সান্ত্বনা করিলেন। এবং সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান শিবের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে উপদেশ দিলেন।

অনুতপ্ত যুবক পত্র পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাবতীর স্থাপিত শিবমন্দিরের পানে ছুটিয়া চলিল। চন্দ্রাবতী তখন শিবারাধনায় তন্ময়; মন্দিরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। হতভাগ্য যুবক আসিয়াছিল চন্দ্রাবতীর কাছে দীক্ষা লইতে—অনুতপ্ত দুর্ব্বিষহ জীবন প্রভুপদে উৎসর্গ করিতে—কিন্তু পারিল না। চন্দ্রাবতীকে ডাকিতেও সাহস হইল না। অঙ্গনের ভিতর সন্ধ্যামালতীর ফুল ফুটিয়াছিল; তারই দ্বারা কবাটের উপর চারিছত্র কবিতা লিখিয়া চন্দ্রাবতীর নিকট, বসুন্ধরার নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিল।

পূজাশেষে চন্দ্রাবতী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। আবার যখন দ্বার রুদ্ধ করেন, তখন সেই কবিতা পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়াই বুঝিলেন—দেব-মন্দির কলঙ্কিত হইয়াছে। চন্দ্রাবতী জল আনিতে নদীতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, সব শেষ—অনুতপ্ত যুবক তাঁহার নিকট হইতে জন্মের শোধ বিদায় লইয়া নদীস্রোতে জীবন-স্রোত মিলাইয়া দিয়াছে!

বনফুল শুকাইয়া উঠিল। তার পর এক দিন শিবপূজার সময় সহসা তাঁহার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। হতভাগ্য ময়মনসিংহ সেদিন অকালে যে মহারত্ন হারাইয়াছিল, আর তাহা ফিরিয়া পাইল না।

যদিও চন্দ্রাবতী তাঁহার জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে তৎকৃত রামায়ণের বন্দনায় কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই, তথাপি নিম্ন-ধৃত দুইটি পদ দ্বারা নয়ানচাঁদের বর্ণিত চন্দ্রাবতীর জীবন-কাব্যের সমর্থন করা যাইতে পারে—

"বাড়াতে দরিদ্র জ্বালা কষ্টের কাহিনী—
তার ঘড়ে জন্ম লৈল চন্দ্রা অভাগিনী

প্রথম ছত্রটিতে দেখা যায়, চন্দ্রাবতী আজীবন পিতার গলগ্রহ হইয়া, তাঁহার দরিদ্র জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শেষ ছত্রে "চন্দ্রা অভাগিনী" এই একটি মাত্র কথায় সেই আজন্ম-দুঃখিনী মহিলা-কবি যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখে বঞ্চিত ছিলেন, আমরা তাহার আভাস পাইতেছি। অল্প বয়সে সেই যোগশান্ত মনস্বিনী, হৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ দুঃখভার চাপিয়া রাখিতে, অশ্রুকে নিরুদ্ধ করিতে—সুন্দর রূপে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-কাহিনীর আশা আমরা একেবারেই করিতে পারি না।

(চন্দ্রাবতীর রামায়ণ)

চন্দ্রাবতীর সম্পূর্ণ রামায়ণ সংগৃহীত হয় নাই। মাঝে মাঝে খণ্ডিত ভাবে যাহা পাওয়া গিয়াছে, আমরা তাহাই লইয়া আলোচনা করিব। ইহা কতিপয় মেয়েলী সঙ্গীতের সমষ্টিমাত্র। ময়মনসিংহের স্ত্রীলোকেরা বিবাহ-উৎসবে সূর্য্যব্রতাদি উপলক্ষে ইহা সুরে গান করিয়া থাকেন। ইহার ভাষা পল্লীতটিনীর মত মৃদুমন্থর-গামিনী অথচ সতেজ কবিত্বপূর্ণ। কবিতাগুলির সারল্য ও অনাড়ম্বর মাধুর্য্য শ্রোতার মনকে অল্পেই অভিভূত করিয়া তোলে। ইহাতে কোনও অবান্তর কথা নাই, বাহুল্য বর্ণনা নাই। সরল সংক্ষিপ্ত কথায় রামায়ণের প্রত্যেকটি ঘটনাচিত্র কবি নিপুণ হস্তে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। অথচ তাহা এত উজ্জ্বল, এত সুন্দর, এত করুণ, এত মর্ম্মস্পর্শী যে, শরতের মুক্ত জ্যোৎস্নার মত নিজে ফুটিয়া দুরূহ গিরিশৃঙ্গ হইতে সমুদ্রের

তলদেশ পর্য্যন্ত কোথায় কি আছে, চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দেয়।

চন্দ্রাবতীর সম্পূর্ণ রামায়ণের আলোচনার আমাদের স্থানাভাব। তাহার প্রয়োজনও নাই। অন্যান্য প্রচলিত রামায়ণ হইতে, এই মহিলা রামায়ণের যেটুকু নূতনত্ব ও বিশেষত্ব, আমরা তাহাই লইয়া আলোচনা করিব।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত এই রামায়ণ সরল মিত্রাক্ষরে লিখিত। কেবল সুরে গীত হয় বলিয়া রচনায় একটুকু বৈলক্ষণ্য আছে। প্রায় প্রত্যেক ছত্রের মধ্যভাগে অথবা শেষভাগে গো লো রে প্রভৃতি বাহুল্য শব্দ পাওয়া যায়। সম্ভবত তাহা সঙ্গীত-সৌকার্যার্থে। এই সকল শব্দ তুলিয়া দিলে, সরল পয়ার ছন্দই অবশিষ্ট থাকে।

আদিকাণ্ড—এই কাণ্ডের অনেকাংশ পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে রামচন্দ্রাদির জন্মে কোনও নূতনত্ব, বিশেষত্ব নাই। তাহা সর্ব্বাংশে প্রচলিত অন্যান্য রামায়ণেরই অনুরূপ। কিন্তু সীতার জন্ম ও নাম করণ সম্বন্ধে একরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমরা তাহাই লইয়া আলোচনা করিব।

সীতার জন্ম—পূর্ব্ব সূচনা। রাবণ রাজা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমেই স্বর্গের দুয়ারে গিয়া হানা দিলেন। রাক্ষস সেনার প্রচণ্ড দাপটে স্বর্গের মনঃশিলা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে দেবতারা স্বর্গ ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন।

তখন রাজা পারিজাত বৃক্ষ ছিল গো নন্দন কাননে
ডালে মূলে উপারিয়া গো লইল রাবণে
ঐরাবত হাতী লৈল গো উচ্চৈশ্রবা ঘোড়া
লইল পুষ্পক রথ গো শূন্যে দেয় ত উড়া
মনিমুক্তা লৈল কত গো না যায় গনন।
ঝাড়িয়া মুছিয়া লৈল গো ভাণ্ডারের ধন।"

তার পর সেই রাক্ষস-সৈন্যের দুর্জ্জয় অভিযান মর্ত্ত্যভূমি অভিমুখে অগ্রসর হইল। মর্ত্ত্যের রাজগণ অবনত মস্তকে রাবণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ভাণ্ডারের ধনরাশি বিজেতা রাক্ষস-রাজের চরণে ঢালিয়া দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। এইরূপে অন্তরীক্ষবাসী, পাতালবাসী, নাগ, যক্ষ সকলে বিনাযুদ্ধে পরিহার মাগিয়া রাক্ষসরাজের পদে শরণ লইল।

এইবার অরণ্যবাসী মুনিগণের পালা। মুনিগণের মধ্যে কেহ কৌপীন, কেহ কমণ্ডলু দিয়া রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইলেন। এ-ও সম্বল যাঁহাদের ছিল না তাঁহারা কুশাগ্রে চিরিয়া বুকের রক্ত রাজকর স্বরূপ প্রদান করিলেন। রাবণ সেই যোগ-সম্বল নিরীহ মুনিগণের রক্ত রত্ন কৌটায় ভরিয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাক্ষসরাজ মুনি-রক্তপূর্ণ রত্নকৌটা মন্দোদরীর হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, ইহাতে তীব্র বিষ আছে। এ বিষে দেবতারও প্রাণ নষ্ট হইবে।

"সতত আমার বৈরী যত দেবগণ
অমর হইয়াছে তারা অমৃতকারণ—'
ইন্দ্র-যমে আনিয়াছি লঙ্কায় বান্ধিয়া
সবারে মারিব এই বিষ খাওয়াইয়া।"

রাণী মুনি-রক্ত-পূর্ণ রত্ন-কৌটা যত্ন-পূর্ব্বক ঘরে তুলিয়া রাখিলেন।

এইরূপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল জয় করিয়া রাজা নিঃশঙ্ক মনে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কুবের হইল ভাণ্ডারী—একাদশ রুদ্র দেহরক্ষক—দ্বাদশ আদিত্য ছত্রধর—পবনের হাতে চামর।

বরুণ আসিয়া রাজার চরণ পাখালে
লঙ্কাপুরা পা'রা দেয় শমন কোটালে"

চিরযৌবনা দেব-গন্ধর্ব্ব-কন্যা সহ রাজা দিনরাত অশোক-কাননে বিহার করেন। এই অভিমানে রাণী মন্দোদরী—

"যে বিষ খাইলে মরে দেবতা অমর
আমি কেন নাহি খাই সেই কালজর"

প্রাণঘাতী বিষ ভাবিয়া রাণী মুনির রক্ত পান করিলেন।

"দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডানি
বিষ খাইয়া গর্ভবতী হইলেন রাণী ;

দশ মাস দশ দিন অন্তে রাণী এক আশ্চর্য্য ডিম্ব প্রসব করিলেন। এই ডিম্ব প্রসূত হওয়া মাত্র রাজ্য জুড়িয়া প্রবল ভূমিকম্প হইল। কনক লঙ্কার বিরাট প্রাসাদ সকলের স্বর্ণ চূড়া সুবর্ণ কলস ও পতাকা সহ ভূলুণ্ঠিত হইল।

সমুদ্র-জল সকল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লঙ্কার পাহাড়ে আগুন দেখা দিল ; সিংহাসনের উপরে সিতঙ্গ ও ধ্বজদণ্ড সহ ভুতলে লুটাইয়া পড়িল। রাবণ চিন্তিত হইয়া রাক্ষস জ্যোতির্ব্বিদগণকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা

গুণিয়া বলিল—এই ডিম্ব হইতে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, সে রাক্ষস-বংশের নিধন স্বরূপা হইবে—

"আর এক কথা শুন রাক্ষসের পতি—
কন্যার লাগিয়া বংশে না জ্বলিবে বাতি।"

তখন—

"কেহ বলে কাট ডিম্ব কেহ বলে ভাঙ্গ
অনলে পুড়াইয়া কেহ বলে কর সাঙ্গ।

এই সংবাদে অন্তঃপুরে রাণীর মন কাঁদিয়া উঠিল। হাজার হউক মায়ের প্রাণ। রাণী রাজাকে অনুরোধ জানাইলেন—

"না ভাঙ্গ না পুড় ডিম্ব গো মোর মাথা খাও
যদি নাহি রাখ ডিম্ব সায়রে ভাসাও ॥

তখন রাণীর অনুরোধে—

"সোনার কটরা মধ্যে রূপার খিল দিয়া
সায়রে ভাসাইল ডিম্ব ভবাণী স্মরিয়া ॥

প্রায় ছয়মাস পর—

ঘনাইয়া আসিল সন্ধ্যা রবি বৈসে পাটে—
এমন সময় লাগল ডিম্ব জনক ঋষীর ঘাটে,—

মিথিলা নগরে এক দরিদ্র জেলে-দম্পতি বাস করিত। "জাল বায় মাছ ধরে ঘাটে দেয় খেয়া"। এ ছাড়া তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের আর কোনও উপায় ছিল না। অতি কষ্টে তাহারা দুঃখের দিনগুলি গুণিয়া গুণিয়া কাটাইতেছিল।

পিন্ধনে কাপড় নাই পেটে নাই ভাত
রাত্র দিবা কান্দে সতা শিরে দিয়া হাত ;

এক দিন মাধব জাল ফেলিয়া সেই রত্ন-কৌটা তুলিয়া ঘরে আনিল। সতা দেবতার দান ভাবিয়া, ধূপ ধূনা জ্বালিয়া, ধান্য-দূর্ব্বা দ্বারা সকাল-বিকাল সেই কৌটার পূজা করিতে লাগিল। ছোট-খাট করিয়া সেই কৌটার গায় পাঁচটি সিন্দূরের ফোঁটা আঁকিয়া দিল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই দিন হইতে সতার সকল প্রকার দুঃখ দারিদ্র্যের অবসান হইয়া গেল। সতাকে এখন আর মাছের ঝাঁপি মাথায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে হয় না।

এক দিন সতা স্বপ্ন দেখিল, সহসা যেন চাঁদের আলোতে তাহার নবনির্ম্মিত ঘরখানি ঝলমল হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই কৌটা হইতে এক আশ্চর্য্য রূপসী বালিকা বাহির হইয়া সতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছে—

"বাপ মোর জনকরাজা গো রাণী মোর মাও
কালুকা বিয়াণে লইয়া রাণীর কাছে যাও

পূর্ণিমার চাঁদের মত সেই রূপসী কন্যা এই বলিয়া আবার কৌটার মধ্যে প্রবেশ করিল। পর দিন সকালে সেই রত্ন-কৌটা অঞ্চলে বাঁধিয়া সতা মিথিলা রাজভবনে পাটরাণীর শয়ন-মন্দিরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল।

রাণী সতার কাছে সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নের কথা শুনিয়া রত্ন-কৌটা হাত পাতিয়া লইলেন, পরিবর্ত্তে—

"গজমতি হার এক পইড়ায় সতার গলে,

* * * *

ধামায় মাপিয়া দিলা রত্নাদি কাঞ্চন

কিন্তু সতা যোড়হাতে বলিল, আমি জন্ম-কাঙ্গালিনী—ধন-রত্ন কিছুই চাই না—তবে এক মিনতি—

"সপ্ন যদি সত্য হয় কন্যা জন্ম ইতে—
আমার নামেতে কন্যার নাম রাইখ সীতে"

সীতার নামকরণ। শুভ দিনে শুভক্ষণে রাজর্ষি জনকের ঘর আলোকিত করিয়া ডিম্ব হইতে এক কন্যা-রত্ন ভূমিষ্ঠ হইল।

"সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মী স্বরূপিনী—
মিথিলা নগরে উঠে জয় জয়ধ্বনি।

দেবের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কুললনাগণের হুলাহুলিতে মিথিলার আকাশ ভরিয়া গেল। স্বর্গে মর্ত্ত্যে আনন্দ ধরে না—

"হইল লক্ষ্মীর জন্ম মিথিলাভবনে

যথাসময়ে তখন—

"সতার নামেতে কন্যার নাম রাখে সীতা—
চন্দ্রাবতী কহে কন্যা ভুবন বন্দিতা ;

রাম বনবাস। তার পর হরধনুর্ভঙ্গ, রামের রাজ্যাভিষেক, বিবাহাদি উৎসবে বিশেষ কোনও নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নাই। তবে বনবিদায়ের মাত্র দুই একটি স্থান আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

কাল অভিষেক, আজ অধিবাস। নগরীতে আনন্দ ধরে না। পুরনারীগণের মঙ্গল-গীত ও হুলুধ্বনিতে অযোধ্যার আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিতেছিল। দ্বারে দ্বারে পুষ্প-পল্লবের মালা। আম্রসার শোভিত তীর্থ-জলভরা পূর্ণ

কুম্ভ। রাজপথের দুই ধারে রোপিত রম্ভাতরু সকলে বিচিত্র পতাকা সকল উড়িতেছে। আর

"চালে চালে উড়িতেছে নেতের নিশান।"

তপ্তকাঞ্চন-বরাঙ্গী পুরনারীগণ পুষ্পস্তবক হস্তে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছেন। অযোধ্যার মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দীন, তাহারও পর্ণকুটীরখানি আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—পুষ্পমালায় শোভিত, ঊষার আলোকে ঝলমল—দুঃখ-দৈন্যের করুণ হাসিটির মত শোভা পাইতেছে। রাজ্যবাসিনিগণ কাল নিশীথে যুবরাজের মঙ্গল-কামনায় সরযূ-তরঙ্গে যে মঙ্গল-দীপ ভাসাইয়াছিলেন, দিবসের কূলে আসিয়াও তাহা নিভে নাই—জলজ নক্ষত্রের মত ঢেউয়ের উপর ডুবিয়া ভাসিয়া শোভা পাইতেছে।

ঝঞ্ঝা নাই, মেঘ নাই—অকস্মাৎ অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদ-শিরে এ কি বজ্রাঘাত! সকলের মুখে 'হায় কি হইল' শব্দ। এত আনন্দ, এত নৃত্যগীত, বাদিত্র,—সহসা সব নিয়তির নির্ম্মম অট্টহাসির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকগণের হাহাকারে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। কৈকেয়ী জটা-বল্কল লইয়া রামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ্যের প্রিয়দর্শন যুবরাজ রাজকীয় বসন-ভূষণ অঙ্গ হইতে খুলিয়া, ধীরে ধীরে জটা-বল্কল পরিধান করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া নগরমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

কুক্ষণে পোহাইল আজ অযোধ্যায় নিশি
কৈকয়ীকে গালি দেয় বলিয়া রাক্ষসী

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সীতা—হার-কেয়ূর-কুণ্ডলাদিশোভিতা—রত্নপুষ্পসমালঙ্কৃতা রাজবধূ—কৈকেয়ীর নিকট হইতে একখানা বল্কল-বসন চাহিয়া লইলেন। সেই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া পুরবাসিগণ—

"হায় হায় বলিয়া কেউ শিরে কর হানে;
মূর্চ্ছিত হইয়া কেউ পড়ে ধরাসনে

এই স্থানে আর একটি করুণ দৃশ্য। এক কাঙ্গালিনী বহু আশায় বুক বাঁধিয়া অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসিয়া দেখে এই সর্ব্বনাশ! সীতা ধীরে ধীরে অঙ্গের রত্নালঙ্কার খুলিয়া কাঙ্গালিনীকে দিতে গেলেন।

"কাঙ্গালিনী ধরি কহে সীতার চরণ
পদছায়া দেহ দেবি! না চাই ভূষণ।"

ভিখারিণী চক্ষের জলে সীতার অলক্তক-রঞ্জিত পদযুগ ধুইয়া দিয়া চলিয়া গেল। বল্কল-বসনা রাজবধূ, কৈকেয়ীর পদধূলি মাথায় করিয়া পাটরাণীর শয়ন-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

সীতার চম্পক-কোমল করস্পর্শে কৌশল্যা চেতনা পাইয়া উঠিলেন। তখনই আবার বল্কল-বসনা পুত্রবধূকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সীতা সম্বিতহারা পাটরাণীর পদধূলি মাথায় লইয়া—সুমিত্রাদি শ্বাশুড়ীসহ পুরমহিলাগণকে বন্দনা করিয়া ঊর্ম্মিলার কাছে গেলেন।

ঊর্ম্মিলার নিকট বিদায় লইতে সীতা বলিতেছেন—

"দেবের দেবতা রৈল শ্বশুর-শ্বাশুড়ী।
আমি গেলে দেইখ্য তুমি অযোধ্যা নগরী॥
আমি গেলে দেইখ্য তুমি দাসদাসীগণে।
আমি গেলে দেইখ্য তুমি কাঙ্গাল-ব্রাহ্মণে॥"

এই স্থানে প্রচলিত অন্যান্য রামায়ণের সীতা অপেক্ষা চন্দ্রাবতীর সীতায় একটু বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। কৃত্তিবাসাদির সীতা স্বামী ধ্যান—স্বামী জ্ঞান—স্বামীই সব—স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধ্য দেবতা—স্বামী-সেবাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম—সুতরাং আমি স্বামী সঙ্গে বনে যাইবেন বলিয়া নিজেই ত্বরান্বিতা হইয়া বনে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কিম্বা অযোধ্যা-বাসীর কোন চিন্তা তৎকালীন কৃত্তিবাসাদির সীতার মনে উদিত হয় নাই। এই স্থানে সীতার ত্যাগ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, বনবাস-ক্লেশ-স্পৃহা নিতান্ত পতিনিমিত্তক বলিয়া আমরা তাঁহার চরিত্রে যে সন্দেহটুকু করিবার অবকাশ পাইতাম, চন্দ্রাবতী তাহা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এইটুকু প্রভেদের কারণ,—পুরুষ কবিগণ স্ত্রী-চরিত্র আঁকিতে গিয়া পুরুষের প্রতি স্ত্রী-জাতির যতটুকু কর্ত্তব্য, তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রাবতী নারী। যে মহতী সেবাপরায়ণতা-গুণে রমণী বিশ্বজননী রূপে পরিকীর্ত্তিতা, চন্দ্রাবতী সেই নারীর কর্ত্তব্য আরও একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই তাঁহার চক্ষে অযোধ্যার পশু পক্ষীটী পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। বিদায়কালে চন্দ্রাবতীর সীতা, ঊর্ম্মিলার কাছে অযোধ্যার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য-ভার সমর্পণ করিয়া যাইতেছেন।

চন্দ্রাবতীর ঊর্ম্মিলা—এই স্থানে বধূ ঊর্ম্মিলার কথা। নয়নে পলক নাই, অশ্রুও নাই—মুখে বাক্য নাই—সেই

চিরমৌনী রাজবধূ সীতাদেবীর সমর্পিত ভার নীরবে গ্রহণ করিলেন। ত্যাগেই তাঁহার শান্তি—দুঃখেই তাঁহার অভিরুচি—সংযমেই তাঁহার সুখ। ঊর্ম্মিলা যেন পরের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতেই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস—গৃহে বধূ ঊর্ম্মিলা না থাকিলে, সীতার বনবাস-সৌভাগ্য ঘটিত কি না সন্দেহ। ঊর্ম্মিলা সীতার বনযাত্রার পথস্বরূপ। শুধু তাই নয়—কুশ-কণ্টকাকীর্ণ বনপথের উপর দিয়া ঊর্ম্মিলা সীতার জন্য বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল কর্ম্মই নীরবে। বিশ্ব-সাহিত্যে এমন মূক চিত্র কোন কালের কোন কবি আঁকিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই ঊর্ম্মিলা-চিত্র অঙ্কনেই কবি-গুরুর সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব। সীতার সহস্র সহস্র অভিনব সংস্করণ বাহির হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঊর্ম্মিলার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতে দেখিলাম না। সীতা বনে গিয়া বনবাসিনী—ঊর্ম্মিলা রাজভবনে থাকিয়াও বনচারিণী। বিশ্ববিজয়ী মহাকাব্য নানাবিধ রসের উৎস স্বরূপ। তন্মধ্যে সীতা করুণ-রসের নির্ঝর-ধারা। কিন্তু ঊর্ম্মিলা সমস্তখানি রামায়ণ-নিংড়ানো শেষ এক ফোঁটা প্রেমাশ্রু। কবি-গুরু এই মূক রাজবধূর কথা বেশী কিছু বলেন নাই। তাহার কারণ—ঊর্ম্মিলার প্রতি উপেক্ষা নহে—অথবা সীতার অশ্রুজলে ঊর্ম্মিলা ভাসিয়াও যান নাই। আমাদের বিশ্বাস কেবলমাত্র সীতার সমর্পিত ভার গ্রহণের জন্যই ঊর্ম্মিলার সৃষ্টি। তাই যখনই তিনি ঊর্ম্মিলার কথা বলিতে গিয়াছেন, আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক অনেক পালা গায়ক ও নাটকে গীতাভিনয়ে এই মূক চিত্রটিকে অতিমাত্র মুখরা করিয়া তোলা হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের মহিলা-কবি এই মূক রাজবধূর চিরন্তন মৌন ব্রতটী ভঙ্গ করেন নাই।

"কেউ করে হায় হায় কেউ হানে বুক।
ঊর্ম্মিলা চাহিয়া আছে সীতাদেবীর মুখ"॥

বন-বিদায়—ইহার পর পৌরজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া জটা-বল্কল-পরিহিত যুবরাজ রথের উপর উঠিয়া বসিলেন। এক পার্শ্বে দিব্য ধনুক হস্তে সহচর লক্ষ্মণ, আর এক পার্শ্বে বল্কল-বসনা, শঙ্খালঙ্কৃতা, সিন্দুর-বিন্দুশোভিতা সীতাদেবী। রথ অযোধ্যাবাসীর বুকের উপর দিয়া সরযূর পরপারে চলিয়া গেল। হাট ভাঙ্গিলে লোক যেমন যে যার ঘরের দিকে ছুটিয়া যায়, অযোধ্যাবাসিগণ তেমনি রামশূন্য অযোধ্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কেউ বা সরযূর পরপারে কুটীর বান্ধিয়া যুবরাজের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রহিল। কেউ বা রথের পানে চাহিয়া চাহিয়া বহুদূর চলিয়া গেল। কেউ বা পথে আছাড় খাইয়া মূর্চ্ছিত হইল। অযোধ্যায় আজ গ্রস্তোদয় চন্দ্রগ্রহণ। আর সে গ্রহণ দুচার দণ্ডের জন্য নহে—ইহার ভোগ কাল পূর্ণ চৌদ্দ বৎসর।

পথে—গুহক চণ্ডালের সঙ্গে সখ্যতা সম্বন্ধযুক্ত কোনও ভণিতা চন্দ্রাবতীর রামায়ণে উদ্ধার পায় নাই। বনপথে চিত্রকূট গিরিশিখরে ভরত-মিলন। এই ব্যাপারে বিশেষ কোনও নূতনত্ব নাই। তবে এইমাত্র প্রভেদ—তপঃ-প্রভাবশালী মহামুনি ভরদ্বাজের যোগ-বলে চিত্রকূট পর্ব্বত দ্বিতীয় অমরাবতীতে পরিণত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, ঐন্দ্রজালিক করস্পর্শে যেন অলকার বৈভবরাশি চিত্রকূট গিরিশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—সেই মণি-মুক্তা-সমুজ্জ্বল মহার্হ রাজপ্রাসাদ, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, সুরধামের অমৃত, রত্নখচিত গজদন্তের পালঙ্ক, তদুপরি অনন্ত-বসন্ত-যৌবনা গন্ধর্ব্ব-যুবতী—এ সমস্ত আমরা চন্দ্রাবতীর রামায়ণে দেখিতে পাইতেছি না। এখানে দীন যোগী ভরদ্বাজের অতিথি-সেবার উপকরণ অতি সামান্য—বনের ফল আর ঝরণার জল। (ক্রমশঃ)

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় বিবিধ চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে স্থির করিলো অনন্তকে বিলোপ যা শাস্তি দিবার তাহা তো দিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অনন্তকে কোনো শাস্তিই না দেয় তাহা হইলে সে যে স্বামী-কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে; অতএব অনন্তকে তাহারও কিছু শাস্তি দেওয়া নিতান্তই উচিত। এই সঙ্কল্প স্থির হইতেই সে অনন্তর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলো। সে অনন্তকে কিরূপে কি শাস্তি দিবে কিছুই স্থির না করিয়াই অনন্তকে ডাকিয়া একবার তাহার সহিত মুখোমুখি করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য উভয়ের বাড়ীর মধ্যস্থিত কপাটের খিল খুলিয়া ফেলিলো। সে দেখিলো দরজার কপাট ওপার হইতেও বন্ধ করা আছে। সে বাহির হইতে ঘুরিয়া যে অনন্তর বাড়ীতে যাইতে পারে এ কথা তাহার তখন মনে হইলো না, তাহার কারণ সে আগে থাকিতেই স্থির করিয়া লইয়াছিলো যে অনন্তকে যে শাস্তি দিবে তাহা সে গোপনেই দিবে—তাহার স্ত্রীর কাছে ও উভয়ের চাকর-দাসীদের সম্মুখে তাহার অপমান সে প্রকাশ হইতে দিবে না, কারণ তাহাতে তাহার নিজের পত্নী মৃদুলারও অপমান জড়িত হইয়া আছে। কপাট বন্ধ আছে দেখিয়া মলয় দরজায় জোরে জোরে ঘা দিতে দিতে ডাকিতে লাগিলো—মিষ্টার রয়! মিষ্টার রয়!

আহুতি দরজা খুলিয়া হাসিমুখে বলিলো—সুপ্রভাত মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি! এতো সকালেই মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির আঁচলের গাঁঠছড়া ছাড়িয়ে যে উঠে পড়েছেন!

আহুতির রসিকতা মলয়ের ভালো লাগিলো না। সে বলিলো—মিসেস চ্যাটার্জ্জি বাড়ীতে নেই, কাল সন্ধ্যাবেলাই তিনি পুরী চলে' গেছেন।......

আহুতি হাসিতে হাসিতে বলিলো—ও! তাইতে মিষ্টার রয়ও কাল সন্ধ্যাবেলা অতো তাড়াতাড়ি করে' রওনা হলেন দার্জিলিঙে— বল্লেন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে! একজন বলে' গেলেন যাচ্ছেন দক্ষিণে আর একজন বলে' গেলেন যাচ্ছেন উত্তরে! হয় তো তাঁদের পূর্ব্ব থেকেই পরামর্শ ঠিক ছিলো যে তাঁরা মিলিত হবেন পশ্চিমে! মিষ্টার রয়ের বন্ধুটি যে কে এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি!

এই বলিয়া আহুতি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলো।

মৃদুলার চরিত্রের উপর আহুতির কলঙ্কারোপের ইঙ্গিতে মলয়ের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলো; অনন্তকে নাগাল না পাইয়া তাহারও উপরের ক্রোধ গিয়া পড়িলো আহুতির উপরে। তৎক্ষণাৎ তাহার মনের উপর দিয়া তড়িৎগতিতে এই চিন্তা বহিয়া গেলো যে এই ব্যাপিকা রমণী ইঙ্গিতে মৃদুলার চরিত্রে যে কলঙ্ক আরোপ করিতেছে সেই কলঙ্কের কালী উহার চরিত্রে লেপন করিয়া দিতে সে ইচ্ছা করিলেই পারে; এবং উহাকে কলঙ্কিত করিলে অনন্তকেও অপমানিত করিয়া তাহার কৃতকর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে; কিন্তু উহাকে কলঙ্কলিপ্ত করিতে গেলে সেও তো সেই কালীতে কলঙ্কিত হইয়া যাইবে! তখনই সে ইহাও স্থির করিলো যে সে কেবল মাত্র আহুতিকে তাহার নিকটে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া সেই লজ্জার পসরা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাহাকে উপেক্ষা ও ত্যাগ করিবে, সে নিজের শুচিতার হানি করিয়া মৃদুলার কাছে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধ কিছুতেই করিবে না। এই স্থির করিয়া মলয় হাসিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলো—আজ আমাদের দুজনেরই যখন জোড়ভঙ্গ হয়ে গেছে তখন আমরাই যুগলমিলন কর্‌বো— মুখ বদ্‌লানো হবে!

এই কথা বলিয়াই কলুষ-স্পর্শের লজ্জায় ও গ্লানিতে মলয়ের মুখ কালো হইয়া উঠিলো, তাহার দেহ ও মন নোংরা সামগ্রী স্পর্শের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলো।

মলয়ের ভাবান্তর দেখিয়া আহুতি প্রসন্ন সরল হাস্যের সহিত সহজ ভাবেই বলিলো—আপনি এখনো নিতান্তই

ছেলেমানুষ আছেন দেখ্‌ছি। একটু ফ্লার্ট্ কর্‌তে গিয়েও এতো লজ্জা! আপনি তো দুপুরবেলা আপিসে যাবেন? আপনি আপিস থেকে এলে আমি আস্‌বো......না হয় আপনি বিকালে আমার সঙ্গেই চা খাবেন দুপুরবেলাও আমার বাড়ী থেকেই খেয়ে আপিস যাবেন ..

মলয় স্থির করিয়াছিলো সে আজ আপিস কামাই করিয়া আহুতিকে লইয়া সমস্ত দিন যাপন করিবে এবং সমস্ত দিনের সহবাসের সুযোগে কোনো অবকাশে আহুতির দুর্ব্বলতা উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত প্রতিপন্ন করিয়া পরিহার করিবে। কিন্তু আহুতির কথার পরে সে আর বলিতে পারিলো না যে সে আজ আপিস কামাই করিবে তাহাকে লইয়া সমস্ত দিন যাপন করিবার জন্য; সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিলো—না, আমার বামুন রয়েছে সেই আপিসে যাবার আগে রান্না করে' দেবে......

তখন আহুতি বলিলো—তবে আমার বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণ রইলো আপনার...আমি এখন স্নান কর্‌তে যাই, স্নান কর্‌তে বেলা হলে আমার মাথা ধরে...

আহুতি চলিয়া গেলো। মলয়ের মনে হইলো সে যেনো আপনার কাছেই অত্যন্ত ক্ষুদ্র সামান্য হইয়া গেছে!

মলয় আপিসে সমস্ত দিন নিতান্ত অস্বস্তি ভোগ করিয়া বাড়ীতে ফিরিলো; অনন্তকে অপমানের প্রতিশোধ দিবার ইচ্ছা, আহুতির আত্মদানের ষোলো-আনা সম্ভাবনার উন্মাদনা এবং মৃদুলার কাছে অপরাধী হইবার আশঙ্কা ও নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্কোচ তাহাকে বিরুদ্ধ আবেগে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলো। সে বাড়ীতে পা দিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার ভৃত্য তাহাকে সংবাদ দিলো—ও-বাড়ীর মেম-সাহেব তিন বার এসে আপনার খোঁজ করে' গেছেন! আপনি এলেই তাঁকে খবর দিতে বলেছেন......

মলয়ের বুকের রক্তপ্রবাহ চনচন করিয়া উঠিলো, আহুতির এই আগ্রহ তাহার রক্তে আগুন ধরাইয়া দিলো! সে ভৃত্যকে কিছু না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলো।

মলয় সিঁড়ির উপরের ধাপে পা দিয়াই দেখিলো আহুতি বারান্দা দিয়া সেই দিকে আসিতেছে; মলয়কে দেখিয়াই সে ঈষৎ হাসিলো। অমনি মলয়ের মনে হইলো আহুতি তাহার সহিত মিলনোৎসুকা বাসকসজ্জা নায়িকা—সে অভিসারিকা! আহুতি আপনাকে কামনা-হুতাশনে আহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, মলয় এখন একবার স্বস্তি-বাচন করিয়া সঙ্কল্প করিলেই হয়! মলয়ের মুখ কামনার উত্তাপে ও লজ্জার আবেশে লোহিতাভ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলো।

আহুতি মলয়কে দেখিয়া হাসিয়া বলিলো—উঃ কতো দেরী করে' এলেন আপনি! আমি তিন তিনবার এসে খোঁজ করে' গেছি আপনার! নিন, শীগ্‌গির করে' হাত মুখ ধুয়ে আসুন, আমি চায়ের জল ষ্টোভে চড়িয়ে রেখে এসেছি...

মলয়ের মনে হইলো এমন আগ্রহভরে মৃদুলা তো তাহার জন্য কখনো অপেক্ষা করিয়া থাকে নাই! নবানুরাগের আবেগে তাহার কণ্ঠ যেনো রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলো; সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলো—আপনি চলুন, আমি এখনি আস্‌ছি...

আহুতি লীলাভঙ্গীর সহিত খসিয়া-পড়া আঁচলখানি কাঁধে তুলিয়া গ্রীবা দুলাইয়া ফিরিয়া চলিয়া গেলো, মলয় লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলো; সে যে প্রতিহিংসার জন্য আহুতিকে অপমানিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলো তাহা আর তাহার মনে ছিলো না, এক পাপের উপলক্ষ্যে প্রশ্রয় প্রাপ্ত বৃহত্তর পাপের নেশায় তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া উঠিতেছিলো।

মলয় কাপড়-ছাড়া ও হাতমুখ-ধোওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের ঘরে গিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলো। সে ভাবিতে লাগিলো—তাহার এই আচরণ কি সঙ্গত হইতেছে? পরের ঘরে আগুন লাগাইতে গিয়া তাহার নিজের ঘরে আগুন লাগিয়া যাইবে না তো? যদি মৃদুলা জানিতে পারে? তাহাকে বলিবো তাহার নামে অপবাদ রটনার প্রতিহিংসা সাধনের জন্যই আমি এরূপ করিয়াছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হোক, পাপ তো সকল অবস্থাতেই পাপ! তা আমি তো নিজে চেষ্টা করিয়া কাহাকেও পাপে প্রলুব্ধ করিতেছি না, কেহ যদি স্বেচ্ছায় উপযাচক হইয়া পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে আমি তাহাকে কেমন করিয়া নিবারণ করিবো? কিন্তু আমিই তো সেই পাপের উত্তরসাধক হইতে যাইতেছি, আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে তো উহার পাপে প্রবৃত্ত হইবার আর সম্প্রতি সম্ভাবনা থাকে না! কিন্তু উহারা যে মৃদুলাকে

অপমান করিয়াছে তাহার প্রতিবিধান হইবে কিসে? আর যাহাতেই হউক পাপানুষ্ঠানে হইবে না নিশ্চয়। মৃদুলাকে অপমান হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার অপমান করা তাহার পক্ষে তো নিতান্তই গর্হিত কর্ম্ম হইবে?......

"বেশ লোক তো আপনি! এখনো কাপড় চোপড় ছাড়েন নি! আহা কান্তা-বিরহ-বিধুর বিপ্রযুক্ত কবি!"

মলয় আহুতির কথায় চম্‌কাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলো আহুতি একটা কাঠের ট্রের উপর দুই পেয়ালা উষ্ণ ধূমায়িত চা ও দুই প্লেট সিঙাড়া-কচুরী ও মিষ্টান্ন রাখিয়া দুই হাতে ট্রের দুই প্রান্তের আংটা ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। আহুতিকে সেইরূপ ভাবে আসিতে দেখিয়া মলয় ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলো—আপনি আবার কষ্ট করে' বয়ে নিয়ে এলেন কেনো? আমিই তো যেতাম......

আহুতি টেবিলের উপর ট্রে নামাইয়া হাসিয়া মাথা দুলাইয়া বলিলো—কিন্তু কখন?...যান শীগ্‌গির কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন। ভাবুকের পাল্লায় পড়ে' আমি যে বুভুক্ষায় মারা যেতে বসেছি তার দিকে হুঁশ আছে?

মলয় ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেলো—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আস্‌ছি......

কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ও হাতমুখ ধুইতে ধুইতে মলয় ভাবিতেছিলো আহুতির এতো আগ্রহের অর্থ কি? তাহার উদ্দেশ্য তাহার কথার ফাঁক দিয়া মলয়ের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে লাগিলো—আহুতি তাহাকে বিপ্রযুক্ত কবি বলিয়াছে, কিন্তু যেখান হইতে ঐ কথাটি ধার-করা সেই মেঘদূতে আছে "বিপ্রযুক্তঃ স কামী!" সে বুভুক্ষায় মারা যাইতে বসিয়াছে! মলয় আহুতিকে অতি সহজ শিকার বলিয়া ধারণা করিয়া এক দিকে উৎফুল্লও হইলো আবার ক্ষুণ্ণও হইলো—এতো সহজে যে পরাজয় স্বীকার করিবে তাহাকে জয় করায় পৌরুষই বা কোথায় আর আনন্দই বা কোথায়!

মলয় আহুতির নিকট সত্বর দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিলো। এবং দুইজনে এক টেবিলে বসিয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলো।

আহুতি খাইতে খাইতে বলিলো—আজ আপনাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না; নতুন কি লিখেছেন আমায় সব শোনাতে হবে।

মলয় কুণ্ঠা কাটাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলো—হুকুম-বর্‌দার হাজির আছে।

আহুতি গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া আবার আহারে প্রবৃত্ত হইলো। মলয় একবার নিবারণের বাসায় যাইবে মনে করিয়াছিলো, কিন্তু সে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ভাবাবেশের ঢং করিয়া বলিলো—আজ সমস্ত দিন কেবল এই পদটাই মনের মধ্যে গুঞ্জন করে' ফির্‌ছে—

"কি জানি কি ঘুমঘোরে
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে বুঝি ওরে
ভুলিবো না আর!"

আহুতি কৌতুকভরা হাসিমুখে বলিলো—কোনো কথা বেশী পেয়ে বসা ভালো নয়! শেষে চারুবাবুর গল্পের "ভেক-বদনী ধনী" পেয়ে বসার মতন দুর্দ্দশা ঘট্‌বে!

আহুতির এই বিদ্রূপে মলয়ের মুখ অপ্রতিভ হইয়া গেলো। সে মাথা নত করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিলো।

মলয়ের মনটা বিরুদ্ধ চিন্তায় ও আবেগে এমন সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলো যে সে আর কথা বলিতে পারিতেছিলো না; আহুতিই মাঝে মাঝে এক একটা কথা বলিতে লাগিলো, কিন্তু মলয়ের বাক্যালাপে উৎসাহ না থাকাতে তাহারও আলাপ তেমন জমিতেছিলো না। অবশেষে মলয়ের আহার সমাপ্ত হইলে আহুতি বলিলো—এইবার চলুন বিছানায়......ভালো হয়ে বসে' আপনার লেখা শুন্‌তে হবে।

মলয়ের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিলো; তাহার মনে পড়িয়া গেলো অল্প দিন আগেই ঐ বিছানাতেই আহুতি তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া তাহার গল্প পড়া শুনিয়াছিলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে পড়িলো যে মৃদুলা আসিয়া তাহাদের তদবস্থ দেখিয়া ফেলিয়াছিলো। লজ্জার সঙ্কোচে ও কামনার আবেগে মলয়ের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিলো। সেদিন আহুতি যে তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলো তাহার জন্য সে মোটেই দায়ী ছিলো না, কেবল সে রূঢ় ভাবে একজন মহিলার আচরণের প্রতিবাদ না করিয়া সহ্য করিয়াছিলো; কিন্তু এই কথা সে যে তাহার স্ত্রীর নিকট উল্লেখ করে নাই, তাহাতেই ঐ

ব্যাপারটার সঙ্গে একটা গোপনতার প্রয়াস জড়াইয়া গিয়াছিলো; যেখানে গোপনতা সেখানেই রহস্য; তাই আজ তাহার মনের ভাবান্তর আশ্রয় করিয়া সেই রহস্য ঘনীভূত হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিলো।

মলয় বিছানায় গিয়া বসিবার আগেই আহুতি তাহার বিছানায় উঠিয়া দুটা বালিস উপরি উপরি রাখিয়া আধ-শোওয়া রকমে বসিয়া মলয়কে বলিলো—কোথায় আপনার খাতা-পত্তর, নিয়ে আসুন......

মলয় আবেগ-কম্পিত চরণে খাতা লইয়া আহুতি হইতে যথাসম্ভব দূরে আড়ষ্ট হইয়া বসিলো।

আহুতি একটু নড়িয়া শুইয়া হাত দিয়া বিছানার একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলো—এইখানে কাছে সরে' এসে ভালো হয়ে বসুন...আমি তো আর আপনার সেকেলে ভাদ্রবৌ না যে আমাকে ছুঁলে নাইতে হবে!

মলয়ের বুকের মধ্যে রক্ত উদ্দাম হইয়া নাচ সুরু করিলো, তাহার নিশ্বাস ঘন ঘন জোরে জোরে বহিতে লাগিলো। সে সরিয়া এক রকম আহুতির কোলের কাছে গিয়া বসিলো।

আহুতি বলিলো— নিন, এইবার আরম্ভ করুন...

মলয় পড়িতে আরম্ভ করিলো। কিন্তু পড়িতে তাহার গলা কাঁপিয়া যায়, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, কপাল কর্ণমূল উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সে কষ্ট ও চেষ্টা করিয়া অল্প একটুক্ষণ পড়িয়া আর পারিলো না, একটা খাপছাড়া জায়গায় কথার মাঝখানেই খাতা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিলো।

আহুতি তাহার ভাবাবেগ দেখিয়া বলিলো—পড়্‌তে ভালো লাগছে না, তবে থাক। আপনি একটু বেড়িয়ে আসুনগে......

এই বলিয়া আহুতি খাট হইতে মাটিতে নামিয়া পড়িলো।

আহুতি চলিয়া যায় দেখিয়া মলয় একেবারে আত্মহারা হইয়া খপ্‌ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলো ও বাষ্পভরা গাঢ় স্বরে অতি অস্ফুট ভাবে বলিলো—তুমি রাত্রে এসো, আমি দরজাটা খোলা রাখ্‌বো......

আহুতি কিছুমাত্র বিস্ময় বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ মধুর ভাবে একটু হাসিয়া লীলাভঙ্গীর সহিত ঘাড় দুলাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলো—আপনি কি ভুলে গেলেন যে মদন অনেকদিন হলো ভস্ম হয়ে অনঙ্গ হয়ে গেছে!

তাহার পর সে ধীরে ধীরে মলয়ের হাত হইতে আপনার হাত মুক্ত করিয়া লইয়া ঘর হইতে মন্থর পদে বাহির হইয়া চলিলো, যাইতে যাইতে একবার মুখ ফিরাইয়া মলয়কে দেখিলো, মলয় দেখিলো আহুতির মুখে প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্য তখনো বিরাজ করিতেছে! মলয়ের ইচ্ছা করিলো সে ছুটিয়া গিয়া আহুতিকে বাহুপাশে বন্দী করিয়া ফিরাইয়া লইয়া আসে; কিন্তু তাহার মুখের ঐ হাসি স্নিগ্ধ শান্ত হইলেও তাহার সঙ্গে একটু যেনো করুণা বিদ্রূপ নিষেধ মিশ্রিত হইয়া ছিলো, যাহার জন্য মলয়ের ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহসে কুলাইলো না। মলয়ও আহুতির পিছনে পিছনে থরথর-কম্পিত পদে ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া গিয়া দাঁড়াইলো; যখন সে দেখিলো আহুতি বাস্তবিকই চলিয়া যাইতেছে তখন সে আবার ব্যাকুল স্বরে আহুতিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়াই বলিলো—বলে' যাও তুমি রাত্রে আস্‌বে......

আহুতি নিজের বাড়ীতে যাইবার দরজার চৌকাঠ পার হইতে হইতে হাসি-মুখ ফিরাইয়া মাথা দুলাইয়া শান্ত অস্বীকার জানাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলো—স্প্রিং-দেওয়া কপাট আপনি ফিরিয়া আসিয়া বন্ধ হইয়া গেলো, মলয় আহুতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়ীতে যাইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতে গেলো, দেখিলো আহুতি দরজায় খিল দিয়া বন্ধ করিয়া গিয়াছে! মলয় সেই রুদ্ধ দ্বারের এপারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কামনার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিলো; যে পাপ-বাসনাকে সে প্রশ্রয় দিয়াছিলো পরকে শাস্তি দিবার জন্য তাহা প্রচণ্ড রূপে তাহাকেই শাস্তি দিতে লাগিলো। শত্রু নির্য্যাতন করিবার যে কুৎসিত অস্ত্র সে নির্ব্বাচন করিয়াছিলো তাহা এখন ফিরিয়া আসিয়া তাহাকেই নির্য্যাতন করিতেছে!

মলয় কোথাও বাহির হইতে পারিলো না, তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিলো আহুতি যদি ফিরিয়া আসে! তাহার কেবলই এই দুরাশা মনে উদয় হইতে লাগিলো আহুতি আসিবে—সে আসিবেই।

এই দুরাশায় মলয় সমস্ত রাত্রি এক নিমেষের জন্যও ঘুমাইতে পারিলো না, প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হইতে লাগিলো এইবার আহুতি আসিবে! সে আহুতির আগমনের প্রতীক্ষায় ভালো করিয়া শুইয়া থাকিতেও পারিতেছিলো

না, অল্পক্ষণ শুইয়া থাকার পরই তাহার মনে হইতেছিলো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা হইয়াছে, এইবার আহুতি হয়তো আসিতেছে ; অমনি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া দুই বাড়ীর মাঝের দরজা চোরের মতন সন্তর্পণে টানিয়া দেখিতেছিলো উহা আহুতি খুলিয়া দিয়াছে কি না ; যতোবারই সে দেখিলো ততোবারই দেখিলো দরজা নির্ম্মম ভাবে বন্ধ ! রাত্রি যতো গভীর হইতে লাগিলো তাহার অস্থিরতা ও অধৈর্য্য ততো বাড়িয়া চলিলো। কিন্তু বৃথাই সে ঘর ও বাহির এবং বাহির ও ঘর করিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইলো, অবরুদ্ধ-হৃদয় কপাট কিছুতেই খুলিলো না। ক্রমে কল্‌কাতার পথে জাগরণের সাড়া শোনা যাইতে লাগিলো—ধাঙড়েরা কোলাহল করিতে করিতে পথ ঝাঁট দিতেছে, ময়লা-ফেলা গাড়ী ঘটাং-ঘটাং শব্দ করিয়া আবর্জ্জনা কুড়াইয়া চলিয়াছে, রাস্তায় জল ছিটানো হইতেছে ; পাড়ারই যদু ঘোষ মাছের দালাল, রোজ হাবড়া ষ্টেসনে মাছ আনিতে ও ফিরিবার পথে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে যায়, ও পথ চলিবার সময় কৃষ্ণের শতনাম আবৃত্তি করে ; মলয় আজও তাহার কর্কশ কণ্ঠের আবৃত্তি শুনিতে পাইলো—

"কৃষ্ণ যবে জন্ম নিলা দৈবকী-উদরে।
স্বর্গ হতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥"

পাড়ার রামকৃষ্ণ-আশ্রমের সন্ন্যাসীরা একঘেয়ে সুরে গানের কেবলমাত্র একটি পদ রোজ ঘণ্টা খানেক ধরিয়া উদ্দাম ভাবে আবৃত্তি করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাবের বিপরীত বিবিধ ভাবসঞ্চার করে, আজও তাহারা তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে "দেখ্ রে আমার কেমন মা ?" ক্রমে টীকে-ওয়ালার নিদ্রালস নাকি সুর পথে বাহির হইলো—চাঁই টিঁকে-এঁ……! তাহার দোহারের মতন অপর একজন ফেরিওয়ালা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিয়া উঠিলো—চাই তিলকুটো চন্দ্রপুলি ! ইহাদের সঙ্গে কাক ও চড়াই-পাখীর কলরব, ট্রামগাড়ীর ঠংঠং, মোটরের ভেঁপু মিলিয়া একটা অশান্ত দানবীয় কাণ্ড বাধাইয়া তুলিলো।

যখন সকাল ফর্সা হইয়া গেলো তখন মলয় নিশ্চিত বুঝিতে পারিলো আহুতি কিছুতেই আসিলো না, সে যাহা বলিয়া গিয়াছিলো কার্য্যেও তাহা পালন করিলো। এই দিবালোকে তাহার নিষ্ফল প্রতীক্ষা তাহাকে অত্যন্ত লজ্জা দিলো, সে আপনার কাছেও নিতান্ত ছোটো হইয়া গেলো, সে নিজের কাছে অপরাধী হইয়া কুণ্ঠার সহিত তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া লুকাইলো।

মলয়ের প্রভাতেই স্নান করা অভ্যাস। সে সমস্ত রাত্রি জাগরণের ও পাপ-বাসনা মনের মধ্যে পোষণের গ্লানি কথঞ্চিৎ ধুইয়া ফেলিয়া আসিয়া যখন ভাবিতেছিলো এখন সে কি করিবে, তখন হঠাৎ তাহার পশ্চাতে আহুতির আহ্বান শুনিয়া সে চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইলো ; দেখিলো, কাল যেনো সে কোনো অনাচার করে নাই এমনি প্রশান্ত স্মিতমুখে আহুতি বলিতেছে—আপনার স্নান হয়ে গেছে ? আসুন তবে চা খাবেন।

আবার চা ! মলয় ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলো—আমাকে মাফ করবেন, আমাকে এখনই একবার নিবারণের বাড়ীতে যেতে হবে, তার ওখানেই চা খাবো…

এই কথা বলিতে বলিতেই মলয় আল্‌না হইতে চাদর টানিয়া কাঁধে ফেলিয়া চটি ছাড়িয়া এক জোড়া আল্‌বার্ট শ্লিপারের মধ্যে পা ভরিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে প্রস্থান করিলো, আহুতির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তাহাকে মুখ দেখাইতে তাহার যেনো মাথা কাটা যাইতেছিলো। সে যে অভব্যের মতন আহুতি তাহার ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিতেও চলিয়া আসিলো সেদিকে তাহার খেয়াল রহিলো না, আহুতি এখন তাহার কাছে ভয়ঙ্কর লজ্জা ও আত্মগ্লানির রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে।

মলয় পথে বাহির হইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অনেকখানি পথ হাঁটিবার পর অনেকখানি প্রকৃতিস্থ হইলো এবং সঙ্কল্প করিলো আজই সে রাত্রের গাড়ীতে পুরী রওনা হইয়া যাইবে এবং মৃদুলার প্রেম-দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইয়া পাপ-প্রলোভনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবে। গত দিবসের নিজের লজ্জাকর আচরণের কথা সে ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারিতেছিলো না, তাহার অন্তরগ্লানি নিরন্তর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার দিয়া ফিরিতে লাগিলো। সে বুঝিতে পারিলো পাপ-চিন্তাই কি ভয়ানক ! পাপের শাস্তি পাপ দ্বারা দিবার সঙ্কল্প করাতেই তাহার এতোদূর শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে !

মলয় চলিতে লাগিলো ; সে আহুতিকে বলিয়া আসিয়াছিলো যে সে নিবারণের বাড়ী যাইবে ; কিন্তু ঐ কথা হঠাৎ বলিয়া ফেলিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও সেখানে যাইবার

কোনো সঙ্কল্প তাহার মনের মধ্যে ছিলো না ; এবং এখন সে নিবারণের বাড়ীতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়াই সেই দিকেই অন্যমনস্কভাবে চলিয়াছিলো, নানান চিন্তায় আকুল চিত্ত গন্তব্য পথের দিকে লক্ষ্য না রাখিলেও সে নিবারণের গৃহ-দ্বারে গিয়া উপনীত হইলো।

নিবারণের গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া মলয়ের চৈতন্য হইলো যে সে নিবারণের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখনি তাহার মনে পড়িলো যে এই বাড়ীতে শ্রেয়সী আছে, যে একদিন তাহাকে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া বলিয়াছিলো—দাদা, তুমি পবিত্র নির্ম্মল শুচি ! তুমি এই নরককুণ্ডে কেনো এসেছো ! এখানে এমন একটু শুচি স্থান বা আসন নেই যেখানে বা যাতে তোমাকে বসতে দিতে পারি।" সেই পতিতা পাতকিনী এখন মুক্তিস্নান করিয়া পাতিব্রত্যের পূতজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে এখন অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া সতীদিগের সমকক্ষ ; তাহার পুণ্য গৃহস্থালির মধ্যে তাহার কলুষ-কলঙ্কিত চিত্ত ও চরিত্র লইয়া প্রবেশের অধিকার সে হারাইয়াছে, তাহাকে সাধ্বী প্রেমময়ী পত্নী মৃদুলার প্রেম-মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া পবিত্র হইতে হইবে ; যতোদিন সে তাহা হইতে না পারিতেছে ততোদিন সে পতিত অস্পৃশ্য।

মলয় তাড়াতাড়ি নিবারণের বাড়ীর সম্মুখ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলো ; একবার সে মুখ ফিরাইয়া দেখিলো কেহ তাহাকে দ্বারপ্রান্ত হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিলো কি না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়

(Foreign Exchange)

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, এফ্‌-আর-ই-এস্

যে উপায় দ্বারা আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, তাহার নাম ফরেন এক্সচেঞ্জ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য হয়, তাহার দেনা-পাওনা অনেক সময় আমদানী-রপ্তানীতে কাটাকাটি (Cancel) হইয়া যায়। আমদানী-রপ্তানীর অদল-বদল পরিষ্কার রূপে বুঝিবার জন্য একটা উদাহরণ দেখা যাউক।

ধরা যাউক, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা চলিতেছে। উভয় দেশের মুদ্রাই "টাকা" ধরিয়া লইলাম। উদাহরণটী সরল করিবার জন্য ব্যবসার কর্ম্মকর্ত্তা রূপে মোট চারিজন লোককে স্বীকার করা হইল ; ও আমদানী-রপ্তানী মূল্য সমান অর্থাৎ ১০০৲ হিসাবে ধরা হইল। ভারতবর্ষ হইতে "ক" ইংলণ্ডে "খ" এর নিকট ১০০৲ মূল্যের গম রপ্তানী করিয়াছে। ইংলণ্ড হইতে "গ" ভারতবর্ষের "ঘ" এর নিকট ১০০৲ মূল্যের বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছে। আমাদের হাটবাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই দেনা-পাওনার মীমাংসা করিতে হইলে, ইংরাজ খ ভারতবাসী ক-এর নিকট গমের মূল্য বাবদ ১০০৲ নগদ পাঠাইয়া দিবে ; ও ভারতবাসী ঘ ইংরাজ গ-এর নিকট বস্ত্রের মূল্য বাবদ ১০০৲ পাঠাইয়া দিয়া দেনা শোধ করিবে। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে, উভয় দেশেই পাওনাদার ও দেনদার উভয়ই রহিয়াছে ; এবং এই জন্যই ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে নগদ টাকার আমদানী-রপ্তানী না করিয়া হুণ্ডী দ্বারা অতি সহজে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ হইতে পারে। ধরা যাউক, ভারতবাসী ক ইংরাজ খ-কে পাওনাদার করিয়া ১০০৲ মূল্যের এক হুণ্ডী কাটিল। ভারতবাসী ঘ ইংলণ্ডের গ-এর নিকট হইতে বস্ত্র আমদানী করিয়াছে,—তাহার ১০০৲ পরিশোধ করিতে হইবে। সে ক-এর হুণ্ডী ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে তাহার পাওনাদার গ-এর নিকট পাঠাইয়া দিল। গ যথাকালে ক-এর লিখিত হুণ্ডী তাহার স্বদেশবাসী খ-এর

নিকট উপস্থিত করিয়া ১০০৲ সংগ্রহ করিল। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, দেশ হইতে দেশান্তরে কোন মুদ্রাই প্রেরিত হইল না, অথচ দেনা-পাওনা নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল। ব্যাপারটী নিম্নে অঙ্কিত টেব্‌ল্ হইতে আরও বিশদরূপে বুঝা যাইবে :—

ভারতবর্ষ		ইংলণ্ড	
ক	ঘ	খ	গ
ইংলণ্ডে গম রপ্তানী করিয়াছে	ইংলণ্ড হইতে বস্ত্র আমদানী করিয়াছে	ভারতবর্ষ হইতে গম আমদানী করিয়াছে	ভারতবর্ষে বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছে
ক খ-এর উপর হুণ্ডী কাটিল	ঘ ক-এর হুণ্ডী ক্রয় করিয়া গ-এর নিকট পাঠাইল	খ ক-এর হুণ্ডীর টাকা দিল	গ ক-এর হুণ্ডীর টাকা আদায় করিল

প্রকৃত ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমাদের মনগড়া উদাহরণটীর মত সঠিক কিছু হয় এরূপ কেহ যেন মনে না করেন। বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিভিন্ন; আমদানীকারক ও রপ্তানীকারকগণের মধ্যে আমাদের উদাহরণটীর মত পরস্পর চেনা-শোনা অসম্ভব; আর ব্যবসা হয় শতশত সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে ও দশ বিশটা দেশ লইয়া। ইহা ব্যতীত বাণিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাব আমাদের উদাহরণের মত সহজ, সরল ও সমান কথনই হইতে পারে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা পাওনা হুণ্ডীর (Bills of Exchange) দ্বারাই মিটিয়া থাকে। সোণা বা রূপার আমদানি বা রপ্তানী বড় একটা হয় না। যথন এরূপ হয় তথন বুঝিতে হইবে হুণ্ডী দ্বারা দেনা-পাওনার কতকটা মিটিয়া গিয়া বাকী ধাতু মুদ্রা দ্বারা পরিশোধ হইতেছে বা ধাতুগুলি সাধারণভাবে অন্যান্য দ্রব্যের মত আমদানী বা রপ্তানী হইতেছে।

বিনিময়ের সমতা

(Par of Exchange)

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিভিন্ন প্রকারের। মুদ্রা বিভিন্ন হইলেও যথন উহা একই ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তথন উভয় দেশের মুদ্রার মধ্যে একটা বিনিময়ের সমতা সম্ভব। কিরূপে মুদ্রা নির্ম্মিত হইবে, এ বিষয়ে প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন আইন (Mint Law) আছে। প্রত্যেক দেশেই মুদ্রায় কতটা খাঁটী ধাতু (সোণা বা রূপা) থাকিবে এবং কতটা খাদ (সাধারণতঃ তামা) মিশান হইবে, আইন তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যথন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুদ্রা একই ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হয়, তথন উক্ত দেশসমূহের টাঁকশাল সংক্রান্ত আইন ধরিয়া বিনিময়ের সমতা বাহির করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে এই টাঁকশাল আইনের পরিবর্ত্তন না হয়, ততদিন উক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিনিময়ের সমতারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না—একই থাকে।

ইংলণ্ডের আইন মতে সভ্‌রেণের সোণার ১১/১২ ভাগ খাঁটী ও ১/১২ ভাগ খাদ। একটা সভ্‌রেণ বা গিনিতে ৭·৯৮৮ গ্রাম্ সোণা আছে। এই সোনার ১১ অংশ খাঁটী সোণা এবং ১ অংশ তামা।

ফরাসী আইন অনুযায়ী এক কিলোগ্র্যাম (১০০০ গ্র্যাম) সোনা হইতে ৩১০০ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। এই এক কিলোগ্র্যাম সোণার ৯ ভাগ খাঁটী সোণা ও ১ ভাগ খাদ বা তামা। প্রকৃত প্রস্তাবে ফরাসীদেশে কোন সোণার ফ্র্যাঙ্ক নাই। রৌপ্য মুদ্রাই সেখানে চলিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশের মুদ্রার বিনিময়ের সমতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, উভয় দেশের আইন অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার যে সমতা, তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে।

বিলাতী সভ্‌রেণের সহিত ফরাসী ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ের সমতা এইরূপে "শৃঙ্খল নিয়ম" দ্বারা বাহির করিতে হইবে।

কত ফ্র্যাঙ্কে ? = ১ সভ্‌রেণ

১ সভ্‌রেণ = ৭·৯৮৮ গ্র্যাম স্বর্ণ (খাদ সহিত)

১২ গ্র্যাম স্বর্ণ (খাদ সহিত) = ১১ গ্র্যাম স্বর্ণ (খাঁটী)

৯০০ গ্র্যাম খাঁটী স্বর্ণ = ৩১০০ ফ্র্যাঙ্ক

(৭·৯৮৮ × ১১ × ৩১০০) / (১২ × ৯০০) = ২৫·২২১৫

অর্থাৎ ১ সভ্‌রেণ = ২৫·২২১৫ ফ্র্যাঙ্ক।

ঠিক এইভাবেই আমেরিকার ডলারের সহিত ইংলণ্ডের সভ্‌রেণের বিনিময়ের সমতা বাহির করিতে হয় ; যথা :—

কত ডলার ? = ১ সভ্‌রেণ

১ সভ্‌রেণ = ১২৩·২৭৪ গ্রেণ স্বর্ণ (খাদ সহিত)

১২ গ্রেণ স্বর্ণ (খাদ সহিত) = ১১ গ্রেণ স্বর্ণ (খাঁটী)

২৩২·২ গ্রেণ স্বর্ণ (খাঁটী) = ১০ ডলার

(১২৩২৭৪ × ১১ × ১০) / (১২ × ২৩২·২) = ৪·৮৬৬৫ ডলার

অর্থাৎ ১ সভ্‌রেণ = ৪·৮৬৬৫ ডলার

এইরূপে বিনিময়ের সমতা বাহির করিলে নিম্নলিখিত দেশগুলির সহিত সভ্‌রেণ মুদ্রার সম্বন্ধ দাঁড়ায়—

১ সভ্‌রেণ = ২০·৪২৯ মার্ক (জার্ম্মাণি, যুদ্ধের পূর্ব্বে)

" = ১২·১০৭ ফ্লারিণ (নেদারল্যাণ্ডস্)

" = ২৪·০২ ক্রোণ (অষ্ট্রিয়া, যুদ্ধের পূর্ব্বে)

" = ১৮·১৫৯৮২ ক্রোনার (ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে)

বিগত মহাযুদ্ধে অনেক দেশের নিয়ম কানুন ও অবস্থার এত উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে যে, জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত এখন আর Mint Par বা বিনিময়ের সমতা বলিয়া কিছু নাই বলিলেই চলে ; সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই বিনিময়ের সমতা জানিয়া লাভ কি ? আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে এই আইনগত বিনিময়ের সমতার হারে কিছু দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ হয় না। তাহা না হইলেও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ে ইহার আবশ্যকতা কিছু কম নহে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে হুণ্ডীর ক্রয়-বিক্রয় একটা বড় কথা। যিনি মাল রপ্তানী করিতেছেন, তিনি হুণ্ডীর বিক্রেতা—অর্থাৎ তিনি তাঁহার বিদেশী পাওনাদারের উপর হুণ্ডী কাটিয়া, তাহার বিক্রয় দ্বারা নিজের দ্রব্যের মূল্য সংগ্রহ করিবেন। এই হুণ্ডী যদি বিদেশের মুদ্রায় কাটা হইয়া থাকে (drawn in foreign currency), আর বিক্রয় করিতে গিয়া যদি তিনি দেখিতে পান যে, বিনিময়ে তিনি স্বদেশীয় মুদ্রা (local currency) সংখ্যায় কম পাইতেছেন (অবশ্য বিনিময়ের সমতার হিসাবে), তথনই প্রশ্ন উঠিবে—হুণ্ডী বিক্রয় অপেক্ষা উহা বিদেশে পাঠাইয়া পাওনাদারের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রা আমদানী করা লাভজনক কি না ? অবশ্য ইহাতে কতকটা ঝঞ্চাট্ ও অতিরিক্ত খরচ আছে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উহা হুণ্ডী বিক্রয় অপেক্ষা লাভজনক হইলে তাহাই করিতে হয়। যথন উভয় দেশের মধ্যে একটা বিনিময়ের সমতা থাকে, তথন ঐ দেশগুলির মধ্যে প্রকৃত মুদ্রা বিনিময়ের হার (actual rate of exchange) সাধারণতঃ একটা গণ্ডীর উপরে বা নীচে উঠিতে বা নামিতে পারে না। মুদ্রা বিনিময়ের হারের সহিত বিনিময়ের সমতার হারের বেশী তফাৎ হইলে, অবস্থানুযায়ী কথন স্বর্ণ রপ্তানী বা আমদানী হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে যথন কয়েকটী দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী বা রপ্তানীর প্রয়োজন সূচক অবস্থা উপস্থিত হয়, তথন ঐ সকল দেশের বাণিজ্য-ধারা ক্রমে ক্রমে একটী নূতন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; এবং নূতন গতি হইতেই আবার স্বর্ণের আমদানী বা রপ্তানী থামিয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ

শ্রীস্হজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম-আর-এ-এস এবং লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত).

মুসলমান আমলের বঙ্গের চতুর্থ রাজধানী মুর্শিদাবাদের নাম. বাল্যকাল হইতে ইতিহাসে পাঠ করিয়া আসিতেছি। মুর্শিদাবাদ সহরের ও উহার উপকণ্ঠের দর্শনযোগ্য প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দেখিবার বাসনা বহুকাল হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মুর্শিদাবাদে যাইয়া এক দিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ সহরের ও

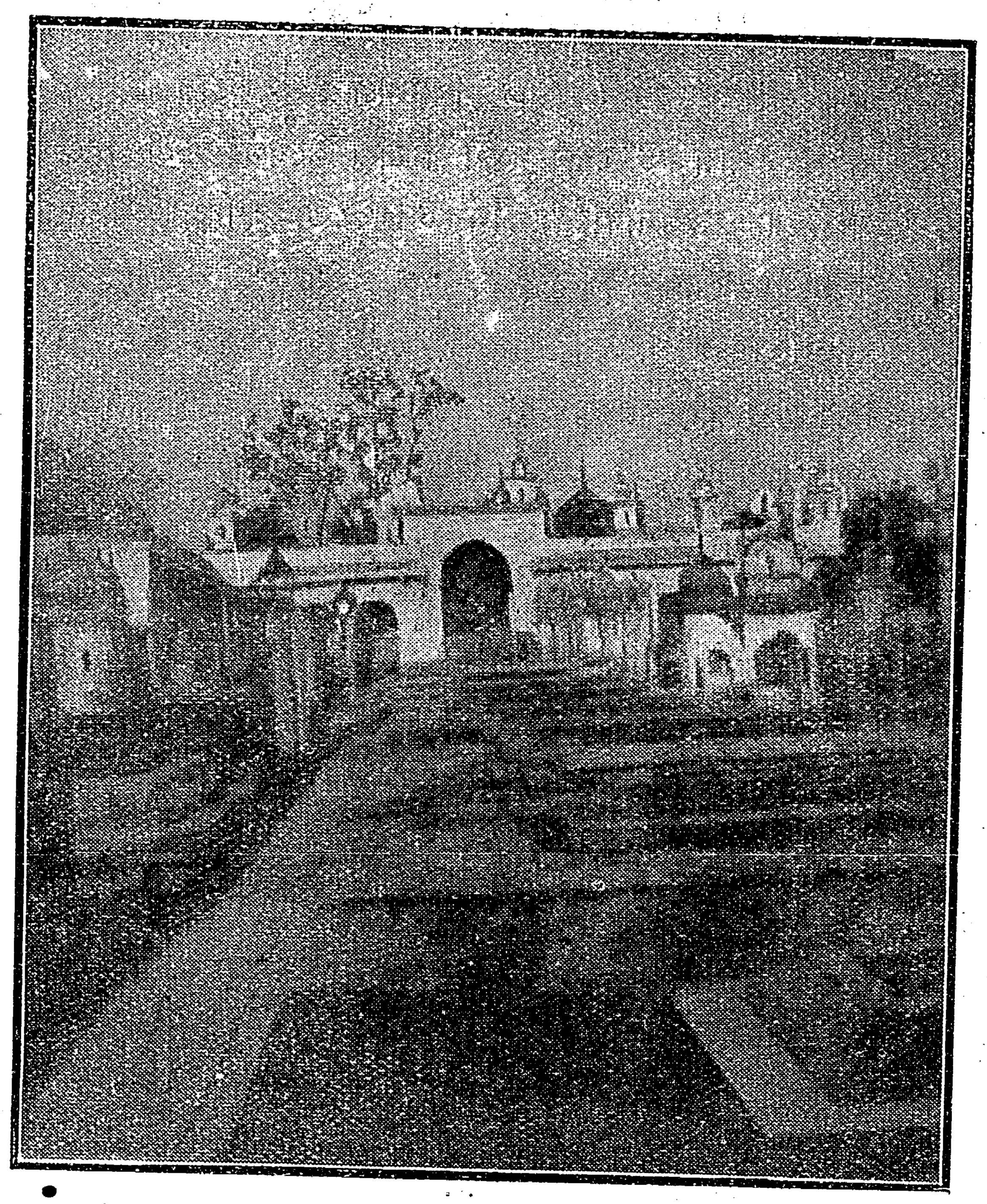

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। মকবরা—মির্জাফরের কবরশোভিত সমাধি

উহার উপকণ্ঠের কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু সেবার তাড়াতাড়িতে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই বলিয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল, এবং তজ্জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। এবার ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে ইষ্টারের বন্ধে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেবের সেক্রেটারী প্রমথবাবু আমার পরিচিত। তাঁহার সহিত ক্রমাগত কয়েক দিবস দেখা করিয়া অবশেষে ইহা স্থির করা গেল যে, আমরা তাঁহার মুর্শিদাবাদের খালি বাসা-বাটীতে থাকিব এবং নিজ ব্যয়ে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া লইব,—তাঁহার ভৃত্য আমাদিগকে প্রয়োজন-মত সাহায্য করিবে। থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া, যাওয়ার আয়োজনে নিযুক্ত হইলাম। এবার ললিতা দাদাই একমাত্র সঙ্গী হইলেন।

২রা এপ্রেল হইতে ইষ্টারের বন্ধ আরম্ভ। আমরা তৎপূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১লা এপ্রেল বৃহস্পতিবার রাত্রে লালগোলাঘাটগামী ট্রেণে শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিলাম। ট্রেণে অত্যন্ত ভীড় হইয়াছিল, চারি দিনের ছুটী পাইয়া বহু প্রবাসী বাটী যাইতেছিলেন। ২।১ জন সহযাত্রীর চেষ্টায় সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কামরায় বেশী ভীড় হইতে পারে নাই। যথাসময়ে শিয়ালদহ হইতে ট্রেণ ছাড়িল। দমদমা, বারাকপুর, কাঁচড়াপাড়া, রাণাঘাট, বীরনগর (উলা), কৃষ্ণনগর, পলাশী, ও বহরমপুর প্রভৃতি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া পরদিন প্রত্যূষে মুর্শিদাবাদ ষ্টেসনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম। তখনও প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল।

রমজানের "রোজার জন্য প্রত্যূষে আহার সমাপন করিতে হয় বলিয়া এ দেশের মুসলমান মুটে ও গাড়োয়ান কোচোয়ান কেহই ষ্টেসনে উপস্থিত ছিল না। এ কারণ যাত্রীদিগকে জিনিসপত্র লইয়া ষ্টেসনে বসিয়া থাকিতে হইল। আমরা উভয়ে ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে একখানি মাত্র ব্রুহাম গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে উহা নবাব সাহেবের গাড়ী এবং উহা নবাব সাহেবের একাউণ্ট্যাণ্ট বাবু আমাদিগের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা তখন গাড়ীতে দ্রব্যাদি উঠাইয়া লইয়া যাত্রা করিলাম। জেলখানার নিকট দিয়া অগ্রসর হইয়া প্রথমে নবাব সাহেবের অতি বিস্তৃত আস্তাবলের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া সামান্য দূর যাইয়া উক্ত আস্তাবলের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি দ্বিতল বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহাই

সেক্রেটারীমহাশয়ের খালি বাসা-বাড়ী। বাটীর রক্ষক দ্বার খুলিয়া দিয়া আমাদিগকে দ্বিতলের একটি প্রশস্ত ঘরে লইয়া গেল। তখনও প্রভাত হইতে ॥ ঘণ্টা বিলম্ব থাকায় কোচোয়ানকে বলিয়া দিলাম যে, আমরা ৬টার সময় বাহির হইব, সেই সময় যেন সে গাড়ী লইয়া আসে।

২রা এপ্রেল প্রাতে ৬॥০টার সময় গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমরা জলযোগাদি শেষ করিয়া বর্ত্তমান নবাব-বাটী বা নিজামৎ কিল্লার দক্ষিণ দিক হইতে উহার পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। যাইবার সময় নিজামৎ কিল্লার পূর্ব্বদিকে স্থিত মনি-বেগমের চৌক মসজিদ ও নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর ত্রিপোলিয়া দরওয়াজা দেখিয়া গেলাম; নিজামৎ কিল্লার বর্ণনা-স্থলে ইহাদের বিষয় বিবৃত হইবে।

নিজামৎ কিল্লা ছাড়াইয়া ক্রমে আমরা জাফরগঞ্জে প্রবেশ করিলাম। নবাব মির্জাফরের নামানুসারে এই স্থানের নাম জাফরগঞ্জ হইয়াছে। ইহা মুর্শিদাবাদ সহর ও নসীপুরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ৭।০টার সময় সদর রাস্তার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত জাফরগঞ্জ মকবরা বা নিজামৎ মকবরা নামক মুর্শিদাবাদের নবাব-বংশীয়দিগের কবরস্থানে আসিলাম। কবরস্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। পশ্চিম

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। মির্জাফরের বাটীর দরওয়াজা

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। সিরাজউদ্দৌলার হত্যার স্থান

দিকের সদর দ্বার দিয়া কবরস্থানে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রকোষ্ঠ। এই বাটীর মধ্যে সম্মুখের উঠানে উন্মুক্ত আকাশতলে সারি সারি শান-বাঁধান কবর আছে। কোন কোন কবরের উপরে চারি পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের পাড় বা ধারি বসান আছে। দক্ষিণ দিকের কবরের সারির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে ইতিহাস-বিশ্রুত কীর্ত্তিমান্ ও স্বদেশদ্রোহী নবাব মির্জাফরের কবর আছে। কবরটি শাদা-সিধা. কিন্তু ইহার উপরিভাগে চতুঃপার্শ্বে কাল পাথরের পাড় বসান আছে। নবাব মীরকাশিমের পতনের পরে

মুর্শিদাবাদ—জাফরগঞ্জ। মির্জাফরের দরবার-গৃহ

ইংরাজদিগের দ্বারা মির্জাফর দ্বিতীয়বার নবাব নিযুক্ত হইলে কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগের ক্রমাগত পাওনার তাগাদার দুর্ভাবনায় তাঁহার মৃত্যুর দিন দ্রুত ঘনাইয়া আসে; এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার কলঙ্ক-কালিমা-লিপ্ত জীবনের অবসান হয়। এই স্থানের সকল কবরে প্রস্তর-ফলকে মৃত ব্যক্তির নাম এবং জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ইংরাজী ও ফারসী ভাষায় লিখিত আছে। এই স্থানে বর্ত্তমান নবাবদিগের পূর্ব্ব পুরুষ হুমায়ুন ঝার কবর আছে। উঠানের উত্তর দিকে একটি থক ঘেরা স্থানে বেগমদিগের কবর আছে, তথায় নবাব মির্জাফরের সহধর্ম্মিণী চৌক মসজিদ নির্ম্মাতা মনিবেগমের এবং অন্যান্য নবাবদিগের বেগমগণের কবর আছে। এই কবর স্থানের পশ্চিমের সদর রাস্তার পশ্চিমে তিন-গুম্বজ-বিশিষ্ট একটি বড় মসজিদ আছে। মসজিদটি পূর্ব্বদ্বারী, উহার প্রতি যত্ন নাই বলিয়া বোধ হইল।

এই মকবরা ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর উত্তর দিকে যাইলে সদর রাস্তার

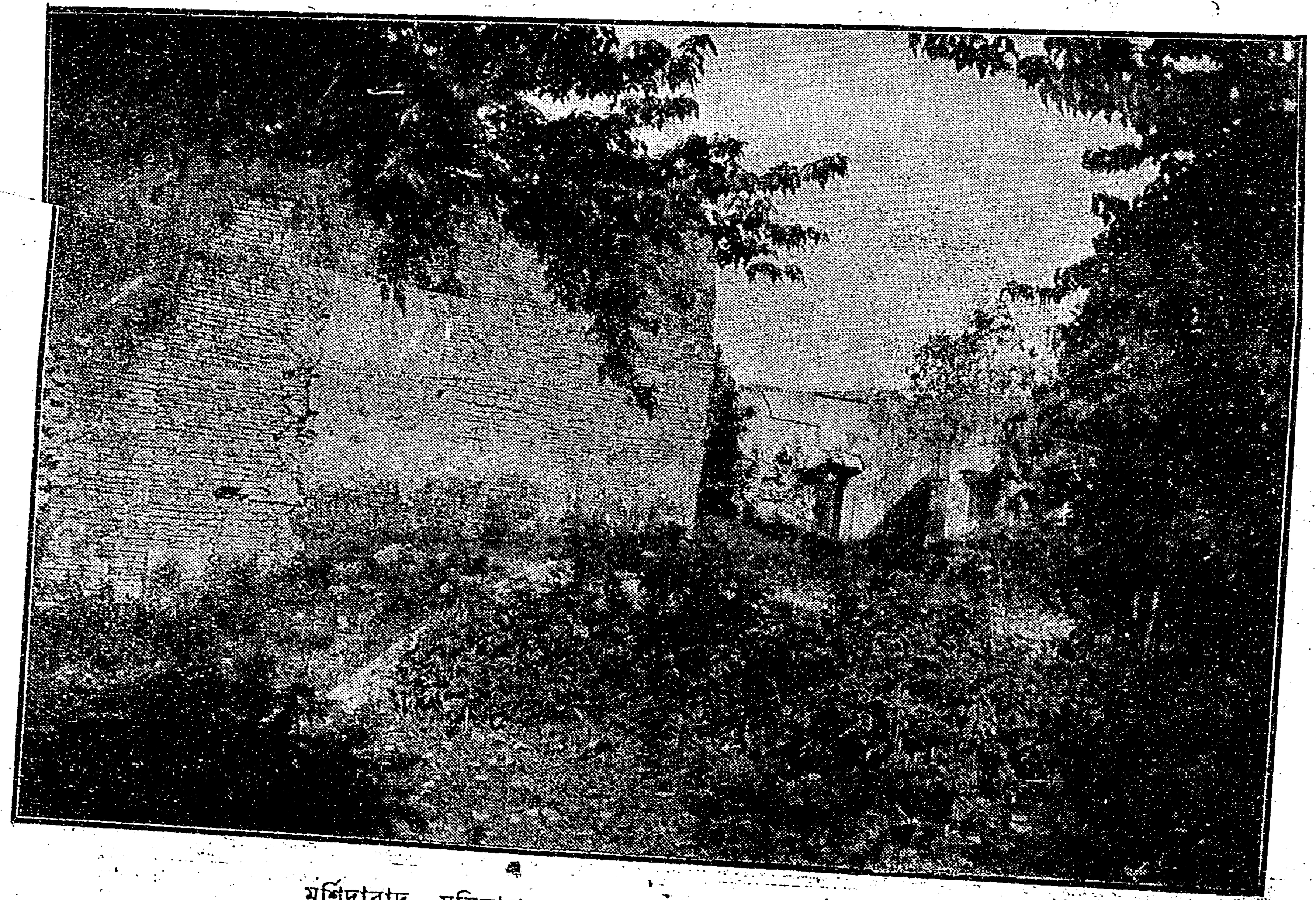

মুর্শিদাবাদ—মহিমাপুর। জগৎশেঠদিগের প্রাচীন বাটীর ভগ্নাবশেষ

পশ্চিম পার্শ্বে নবাব মির্জাফরের বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহাকে জাফরগঞ্জের নবাব-বাটী বলা হয়। এই বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে নহবৎখানা-শোভিত একটি সুউচ্চ দ্বিতল দরওয়াজার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। দরওয়াজার দুই পার্শ্বে রক্ষীদিগের থাকিবার জন্য কয়েকটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠ আছে। দরওয়াজার মধ্যস্থ খিলান এরূপ উচ্চ যে অত্যুচ্চ হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইহার মধ্য দিয়া অনায়াসে যাওয়া যায়। মির্জাফরের বাটীতে এই প্রকারের আর একটি দরওয়াজা পশ্চিম দিকে ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ গতবারে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু এবার তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। মির্জাফর নবাবী মসনদে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে জাফরগঞ্জের এই বাটীতে বাস করিতেন। বিশ্বাসঘাতকদের বাসস্থান বলিয়া ইহাকে নিমকহারামী দেউড়ী কহে।

পূর্ব্বোক্ত দরওয়াজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক ডাইন দিকের পথ ধরিয়া যাইলে সম্মুখে একটি বৃহৎ একতালা হলঘর বা চাঁদনীর ন্যায় ঘর আছে। এই ঘরের প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুইটি চাকাযুক্ত সিংহের বদনমণ্ডল-শোভিত ক্ষুদ্র কামান আছে। কামান দুইটির উপরে ঢালাই-করা ইংরাজী অক্ষরে লিখিত আছে যে, উহাদিগের জন্মস্থান বার্মিংহাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উক্ত ঘরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, অনেকগুলি ছোট ঝাড়-লণ্ঠন টাঙ্গান আছে। ঘরটি দেখিতে একটি বড় বৈঠকখানার ন্যায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এই ঘরটিকে বৈঠক-খানা রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া-ছিলাম। এবার আসিয়া ইহার সাজসজ্জা দেখিয়া বোধ হইল যে, ইহা বৈঠকখানা ও ইমামবাড়ী উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে। এই গৃহটি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত।

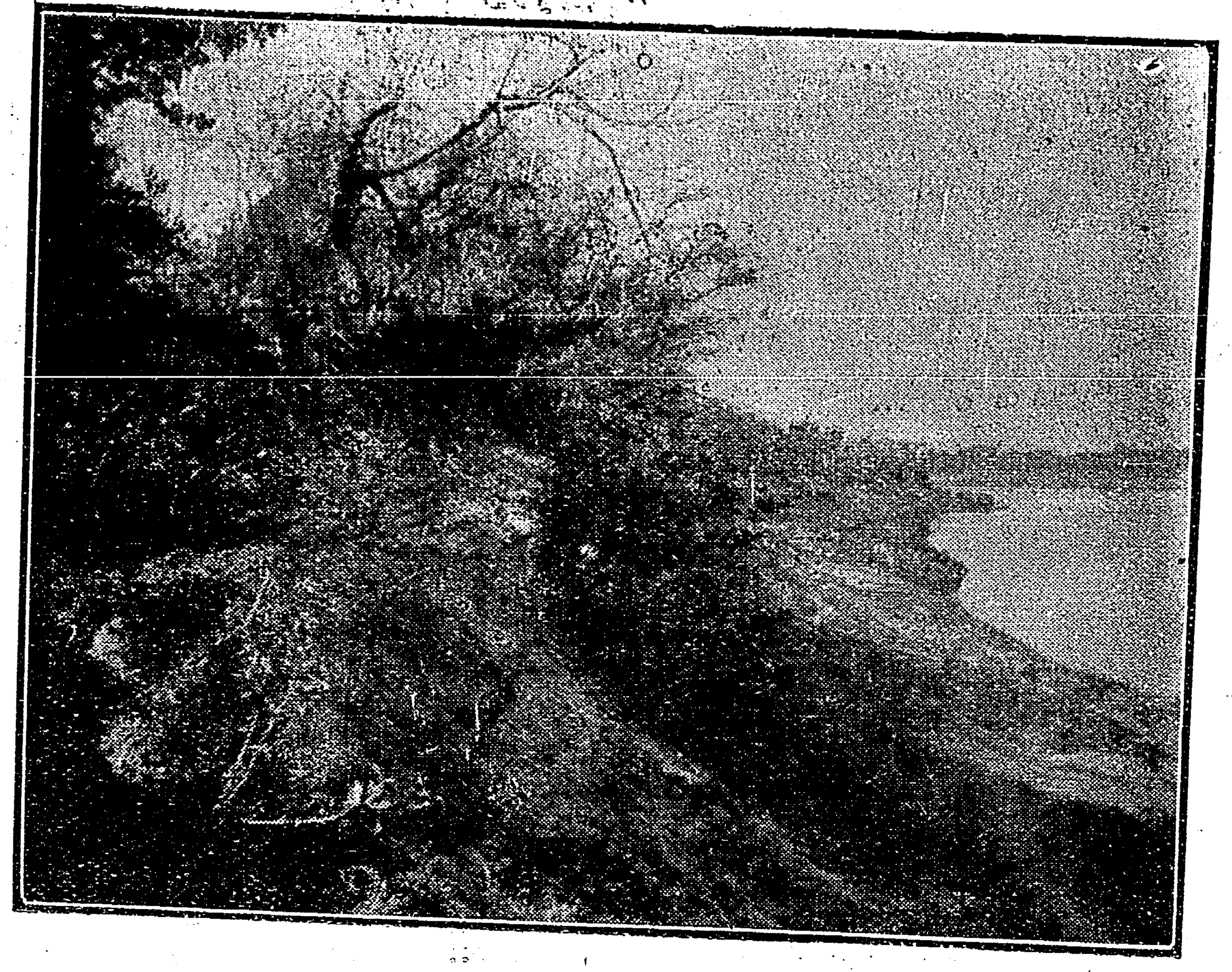

মুর্শিদাবাদ—মহিমাপুর। সতীদাহের স্থান—সতী-চৌরা

এই গৃহের পার্শ্বে একটি পুরাতন দ্বিতল বাটী আছে। উহার পূর্ব্ব পার্শ্বের একটি প্রাচীর-বেষ্টিত ছোট বাগিচার উত্তর-পূর্ব্ব কোণার দিকে একটি ক্ষুদ্র নিম গাছ আছে। এই স্থানে পূর্ব্বে একটি প্রকোষ্ঠ ছিল। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইবার

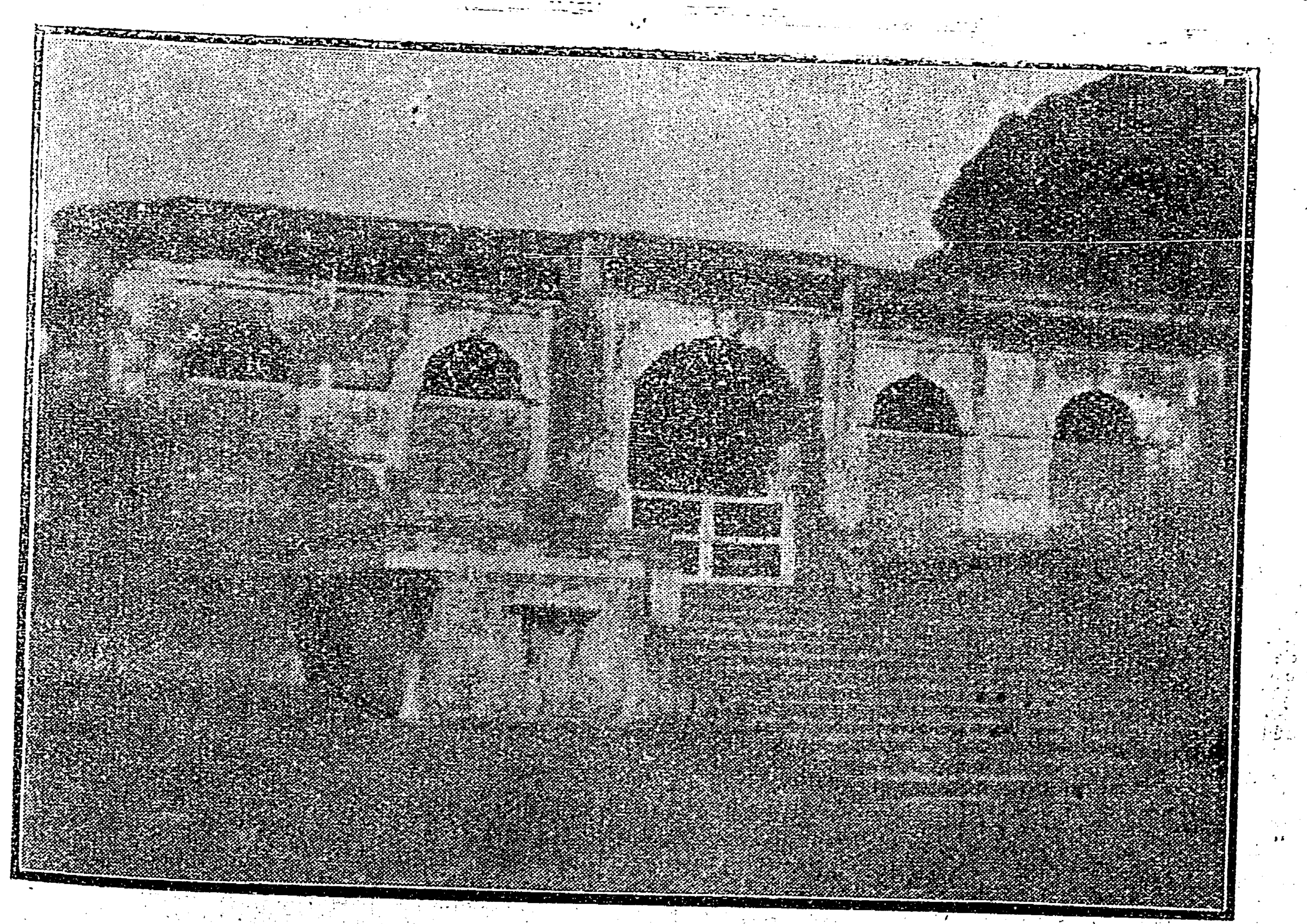

মুর্শিদাবাদ—কাটরা মসজিদের সম্মুখ। ডাইন দিকের প্রকোষ্ঠের নীচে মুর্শিদ কুলির কবর আছে।

পরে পলায়মান নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ধরিয়া আনিয়া এই প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে মির্জাফরের নিষ্ঠুর পুত্র মিরণের অনুমতিক্রমে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মহম্মদীবেগ বার বার তরবারির আঘাত দ্বারা সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিয়াছিল। মহম্মদীবেগকে তরবারি হস্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সিরাজ কহিয়াছিলেন "ইহারা কি

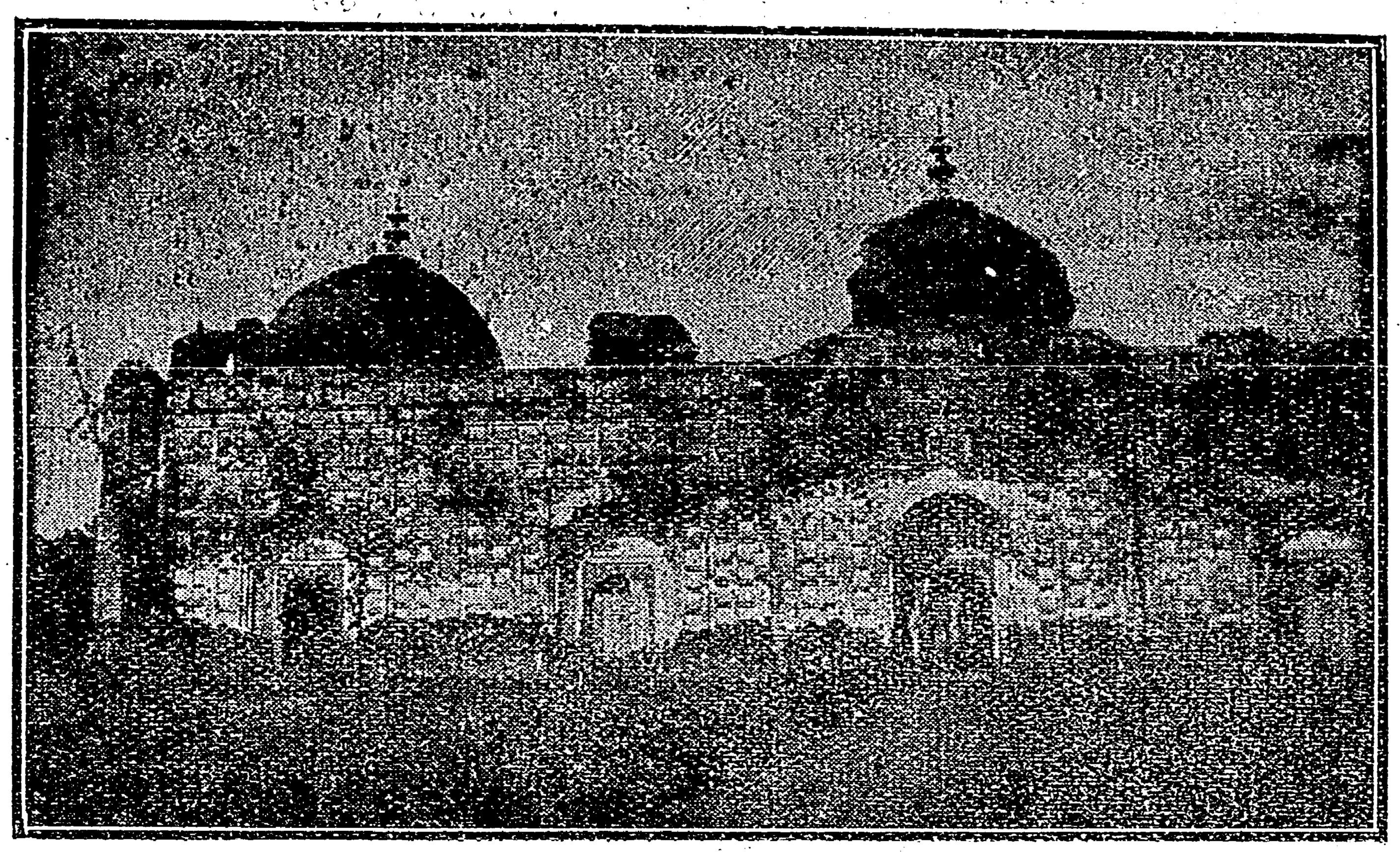

মুর্শিদাবাদ—কাটরার মসজিদের উপাসনা-গৃহ

আমাকে রাজ্যের কোন নির্জ্জন স্থানে অতি দীন অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে দিতেও অসম্মত ?"

এই স্থান হইতে ফিরিয়া পুনরায় পূর্ব্ববর্ণিত সদর দরওয়াজার নিকটে আসিলে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ আর একটি পথ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ ধরিয়া পশ্চিম দিকে যাইলে বাম দিকে মির্জাফরবংশীয়দিগের আবাসবাটী এবং ভগ্ন অট্টালিকা আছে। উক্ত পথ ধরিয়া আর কিয়ৎদূর পশ্চিম দিকে যাইলে একটি জনমানবহীন অবরুদ্ধ মহলে উপস্থিত হওয়া যায়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন ইষ্টকের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, তখন দেখিয়াছিলাম যে, এই মহলের উঠানের দক্ষিণ দিকের বাটীগুলি লোক লাগাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল। এবার দেখিলাম যে সেই বাটীগুলির ভগ্ন দেওয়ালের কতকাংশ এখনও দণ্ডায়মান আছে।

এই মহলের উঠানের উত্তর দিকে মির্জাফরের স্তম্ভ-শোভিত বৃহৎ দেওয়ানখানা বা দরবার-গৃহের ছাদবিহীন ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান আছে। এই গৃহের সম্মুখভাগ দক্ষিণ দিকে। সম্মুখে বিস্তৃত সোপান-শ্রেণী; তাহার উত্তরে খোলা রোয়াক, ও রোয়াকের মধ্যস্থলে একটি বড় চৌবাচ্চা আছে। এই রোয়াকের পশ্চাতে বা উপরে ৮টি বৃহৎ গোল থাম আছে। তন্মধ্যে ৪টি থাম দরবার-হলের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দ্বিতল প্রকোষ্ঠদ্বয়ের সম্মুখ বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বাকী ৪টি থাম মধ্যস্থলের হলঘরের বা দরদালানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মধ্যস্থলের ৪টি থামের পশ্চাতে বা উত্তরে যে দরদালান আছে, তাহার পশ্চাতে আর একটি দরদালান আছে। তাহার পশ্চাতে আর একটি দরদালান এবং তাহার পশ্চাতে একটি দালান আছে। এই গুলির উপরের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এবং ইহাদিগের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল প্রকোষ্ঠগুলি আছে। এক দিকের প্রকোষ্ঠের ছাদ আছে, অপর দিকের ছাদ নাই। গৃহের দেওয়ালের এক স্থানে দস্তার পাতের উপর লিখিত আছে যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক ইহা সংস্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। এই গৃহের সম্মুখস্থ উঠানের পশ্চিম দিকে একসারি একতলা ঘর শুধু পড়িয়া আছে।

এই বাটীতে পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বে ওয়াটস্ সাহেব পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের বেশে রুদ্ধদ্বার পাল্কীতে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়া বিশ্বাস-ঘাতক মির্জাফরের সহিত শেষ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা জাফরগঞ্জের নবাববাটী ত্যাগ করিয়া মহিমাপুরে জগৎ শেঠের বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে চলিলাম। এই নবাববাটীর কিয়ৎদূরে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে মহিমাপুর পুলিসের থানা আছে। উহা অতিক্রম করিয়া নসীপুর রাজবাটীর পশ্চিম দিকের সদর রাস্তা ধরিয়া

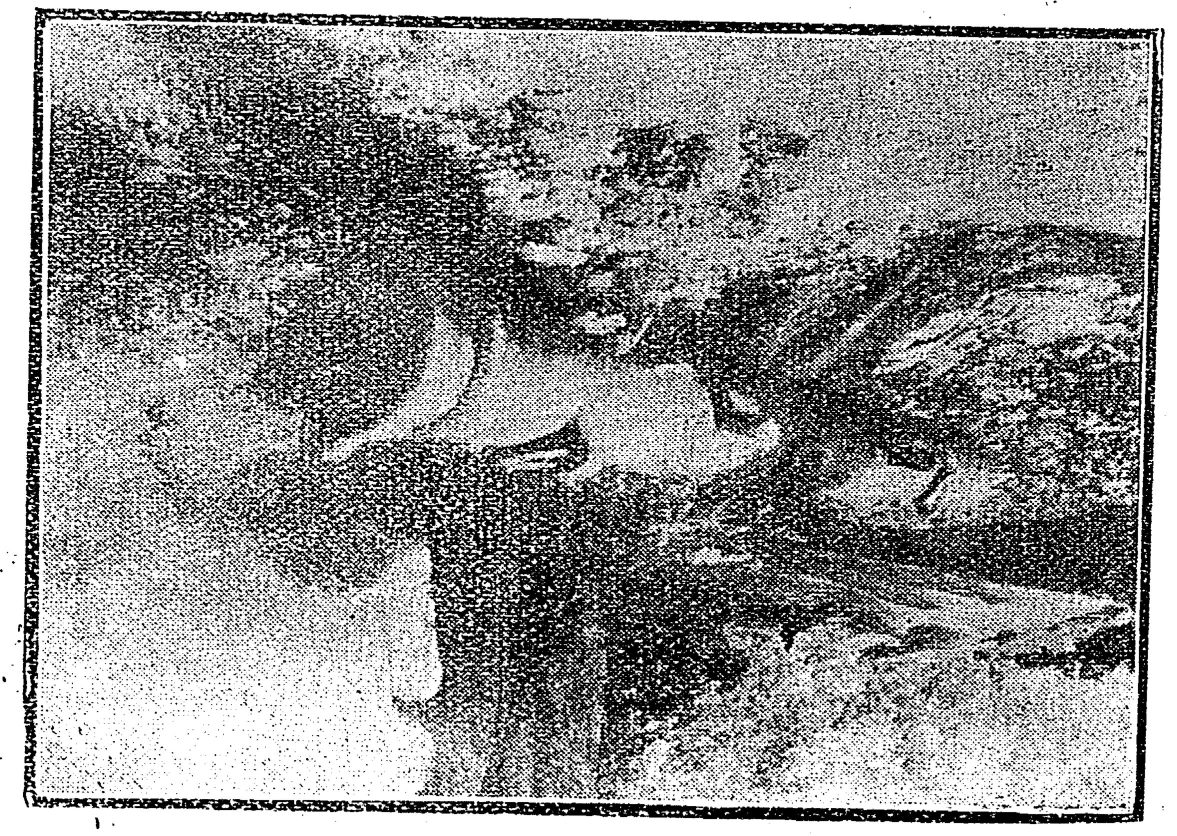

মুর্শিদাবাদ—তোপখানা। জাহানকোষা তোপ।

উত্তর দিকে চলিলাম। রাস্তার পার্শ্বেই সুবিস্তীর্ণ সোপান-শ্রেণী-শোভিত বৃহৎ রাজবাটী রহিয়াছে, উহার সম্মুখে শাস্ত্রীরা পাহারা দিতেছে। এই রাজবাটীতে এক্ষণে এডমণ্ড বার্ক-বর্ণিত অত্যাচারী দেবীসিংহের বর্ত্তমান বংশধরগণ বাস করেন। রাজবাটীটি এই বংশের কীর্ত্তিচাঁদ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন।

মহিমাপুর—জগৎ-শেঠের বাটী

এই স্থান অতিক্রম করিয়া কিয়ৎদূর উত্তর দিকে যাইলে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে জগৎ শেঠের বর্ত্তমান বংশধরদিগের সুবিস্তৃত দ্বিতল বাটী ও একটি নব-নির্ম্মিত বৃহৎ জৈন মন্দির আছে। জৈন মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি পুরাতন কষ্টিপাথর সজ্জিত আছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া দেখিয়াছিলাম যে, ঐস্থানে একটি টিনে এইরূপ লিখিত ছিল যে, এই কষ্টি পাথরগুলি বিক্রয়ের জন্য আছে। দেখিয়া বোধ হইল যে জগৎশেঠের বর্ত্তমান বংশধরদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুণ্ণ হইলেও, তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব নহেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভাগীরথী-তীরস্থ প্রাচীন সৌধ ভাঙ্গিয়া গেলে, জগৎশেঠবংশীয়গণ এই স্থানে নূতন বাটী ও দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ—কদম রসুলের অভ্যন্তরস্থ মেদিনা।

এই বাটী ছাড়াইয়া কিয়ৎদূর উত্তর দিকে যাইলে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে জগৎশেঠদিগের প্রাচীন ত্যক্ত বাটীর ভগ্নাবশেষ ও আম্রবাগিচা বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ডের উপর দণ্ডায়মান আছে। ইহা জগৎশেঠের বাটীর পূর্ব্বে কয়েক শত বিঘা ভূমি জুড়িয়া ছিল,—ইহার অনেকাংশ এক্ষণে

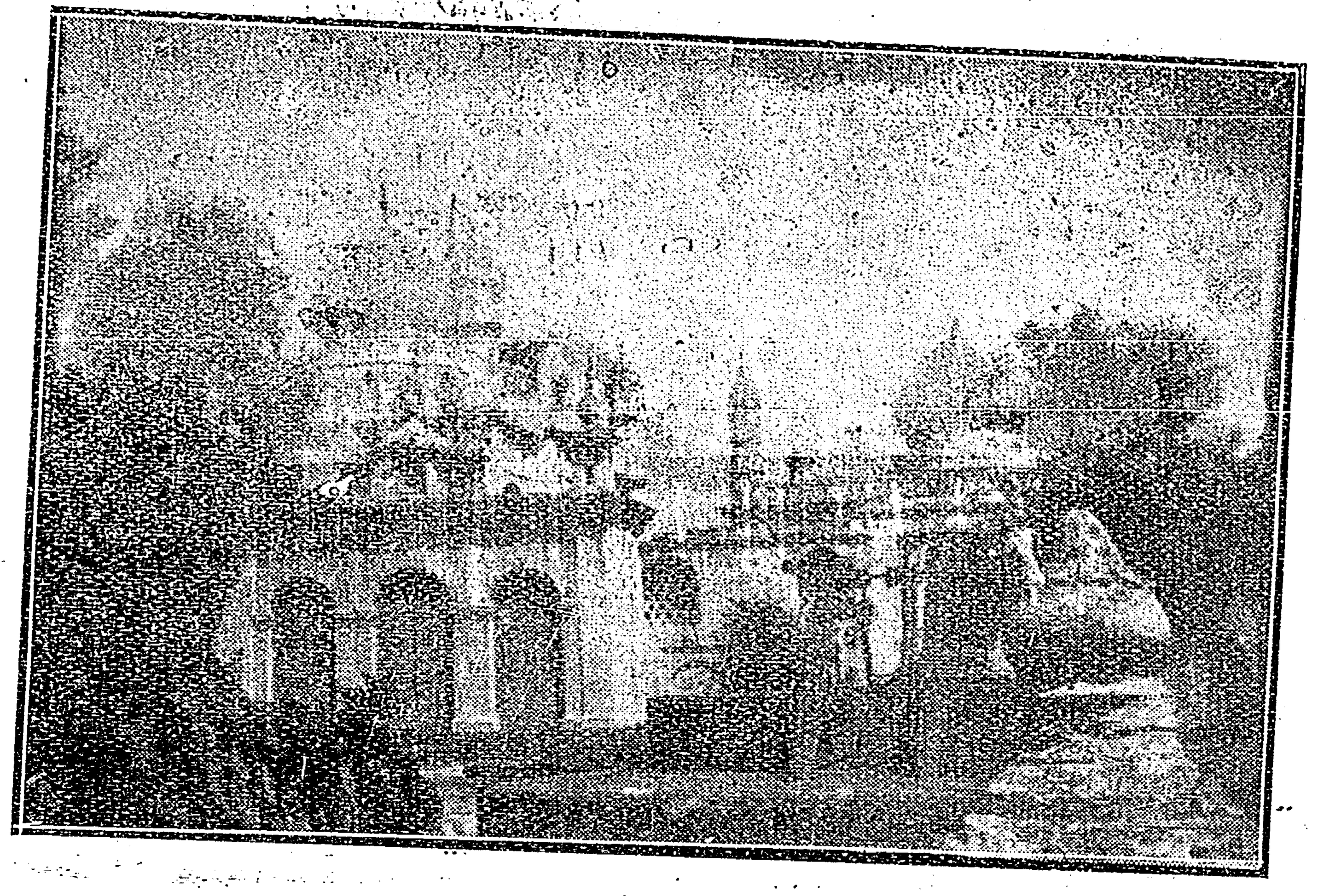

মুর্শিদাবাদ—কদম রসুল

ভাগীরথী-গর্ভে লীন হইয়াছে। এখনও সে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড জুড়িয়া অট্টালিকাদির যে ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা দেখিয়া বুঝা যায় যে, বহুদূর জুড়িয়া জগৎশেঠের প্রাসাদ, দেবালয়, বহির্ব্বাটী, গদী ও অন্দরমহল অবস্থিত ছিল। গত বারে আসিয়া দেখিয়াছিলাম যে, পুরাতন বাটীর ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ইষ্টক তুলিয়া লওয়া হইতেছে। এবার দেখিলাম যে সে সকল স্থানে গভীর খাত বিদ্যমান আছে। শেঠদিগের প্রাচীন বাটীর বাম দিকে একটি দেওয়াল দণ্ডায়মান আছে, উহাতে সিন্দূর লিপ্ত একটি বৃহৎ হনূমানের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে শেঠ হরকচাঁদ কর্ত্তৃক ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত এনামেলকরা ইষ্টক-যুক্ত ৺গোপালজীউর মন্দির ছিল। উহা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরে উহার ভগ্ন দেওয়াল, মেঝে এবং রোয়াক মাত্র অবশিষ্ট আছে। জগৎশেঠ হরকচাঁদ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জৈন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই স্থানে গোবিন্দজীউ নামক ৺ কৃষ্ণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই

হইতে এতদ্বংশীয়গণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। ইহারই উত্তর পশ্চিমে সুখমহাল ও রংমহলের দেওয়াল। একটি শ্বেতবর্ণের বৃহৎ চৌবাচ্চা, ভগ্ন গৃহের দেওয়াল ও দক্ষিণ পশ্চিমে

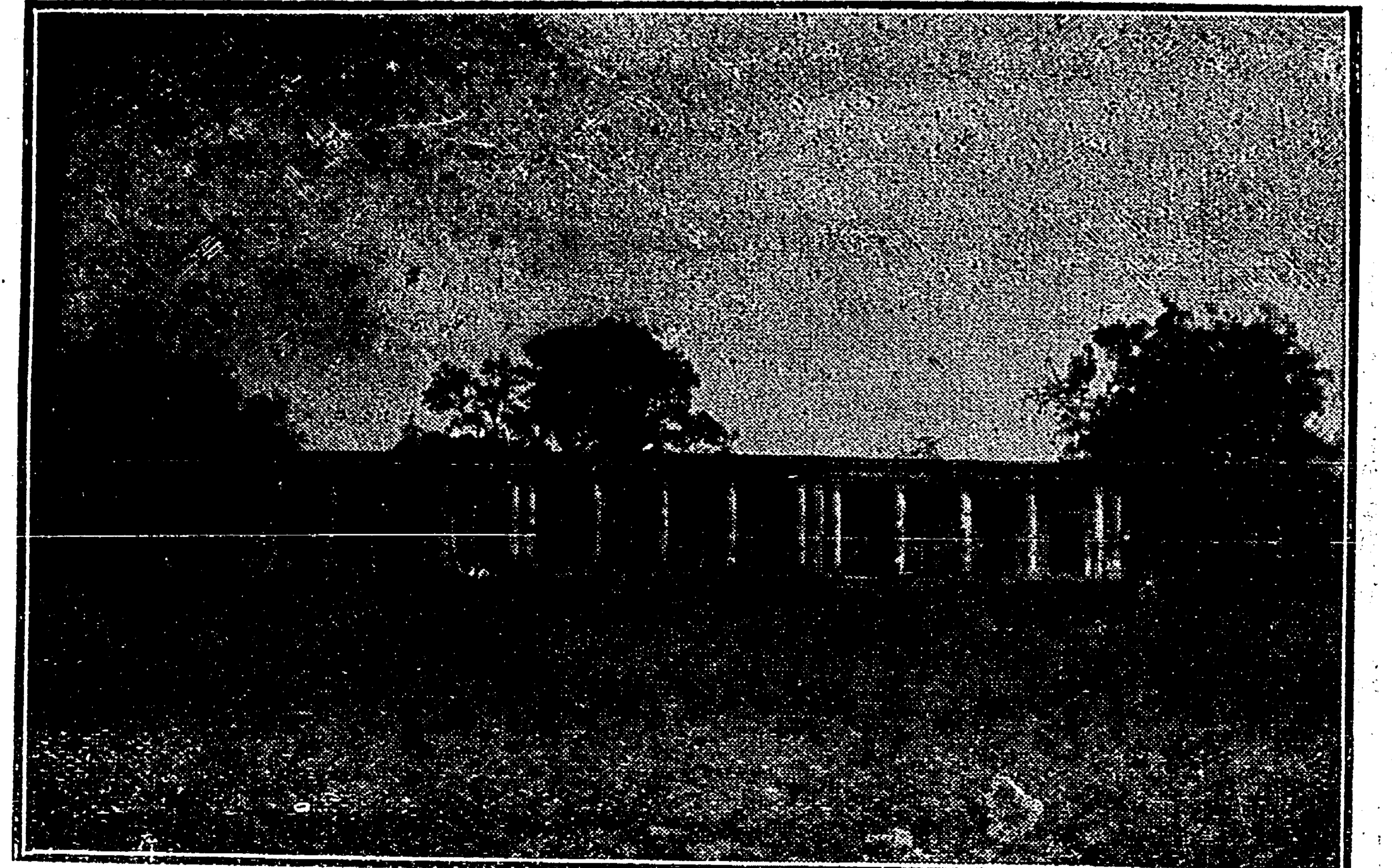

মুর্শিদাবাদ—প্রাচীন সদর দেওয়ানী আদালত—বর্ত্তমান মবারক মঞ্জিল।

জল যাইবার সুগভীর পাকা নালা প্রভৃতি এবং ঠাকুরবাটীর পশ্চিমে বৈঠকখানার ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত হনূমান-মূর্ত্তির দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মাটীর নীচে কয়েকটি খিলান-করা দ্বারবিশিষ্ট একটি গৃহ অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত ইন্দারা এখনও অভগ্ন ও মজবুত অবস্থায় আছে। এই ইন্দারার ব্যাস ১৪ ফিট; ভূমি হইতে ৩০ ফিট নীচে ইহার জল আছে। কিন্তু বহু দিন ব্যবহৃত না হওয়ায় ইহার জল অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া আছে। এই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে ভাগীরথী-তীরে যাইতে কতকগুলি প্রাচীন আম্রবৃক্ষ আছে। এই স্থানে জগৎশেঠের গদী ছিল। একটি পাকা-গাঁথনি-যুক্ত ইমারতের অতি বৃহৎ ভগ্নাবশেষ ঐরাবতের ন্যায় ভাগীরথীর জলে অর্দ্ধ-নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। গতবারে আসিয়া জগৎশেঠের বাটীর একটি ভগ্ন দেওয়ালের কার্নিসের উপরে নীলবর্ণের এনামেল-করা ইষ্টক দেখিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ ঐ ইষ্টকগুলি গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে আনীত; কারণ ঐরূপ ইষ্টক গৌড়ে দেখিয়াছি; এবং গৌড়েরই ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দ্বারা মুর্শিদাবাদ ও মালদহ প্রভৃতির অনেক বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এবার সে এনামেল-করা ইষ্টকের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিলাম না। জগৎশেঠের পুরাতন বাটীর ইষ্টকগুলি

অতি পাতলা ও ছোট। ইমারতগুলির গাঁথনি সুরকী, খোয়া ও চূণ দ্বারা করা হইয়াছে। গাঁথনি আজিও বজ্রের ন্যায় মজবুত আছে। মাটীর ভিতর হইতে অতি গভীর পাকা বনিয়াদ গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল। এক্ষণে জগৎশেঠের প্রাচীন ভিটায় জনমানব নাই, শুধু বনজঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য হনূমান বাস করিতেছে। তাহারা মানুষকে ভয় করে না। জগৎশেঠদিগের "জগদ্বিশ্রাম" নামক বাগানবাড়ী ও টাঁকশাল ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল।

জগৎশেঠদিগের মহিমাপুরের প্রাচীন বাটীতে এককালে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। আলীবর্দ্দী খাঁর নবাবীর সময় মহারাট্টা বগী মুসলমান অধিনায়ক মীর হবিব মুরশিদাবাদের উপকণ্ঠ লুণ্ঠন-কালে জগৎশেঠের এই বাটী হইতে বহু ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই স্থানে পলাশী যুদ্ধের তিন দিবস পরে ওয়াটস্ এবং ওয়াল্‌স সাহেব রাজা রায়দুর্লভের ও মির্জাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা—দক্ষিণ দরওয়াজা

উক্ত যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজদিগকে যে অর্থ দিবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল। এই স্থানেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন তারিখে ক্লাইব, ওয়াটস্, স্ক্রাফ্‌টন্, মির্জাফরের নিষ্ঠুর পুত্র মিরণ, রায়দুর্লভ এবং উমিচাঁদ যখন উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় ক্লাইব—উমিচাঁদের সহিত পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে যে কোন প্রকার সর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করেন। ইহার ফলে উমিচাঁদ ভগ্ন হৃদয়ে এই স্থান ত্যাগ করেন।

ওয়ালস্ সাহেব (History of Murshidabad District by Major J. H. Tull Walsh I. M. S. 1902) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই শেঠগণ রাজপুতবংশ-সম্ভূত। (কলিকাতার ওসওয়াল জাতীয় কোন কোন মাড়ওয়ারীর নিকট শুনিয়াছি যে জগৎশেঠগণ ওসওয়াল জাতীয় জৈন। ইহাঁদিগের মৌলিক উপাধি গেলড়া। ওসিয়া নগরের রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "ওসোয়াল" নামে বিদিত হন।) ইহাঁদিগের আদি বাসস্থান যোধপুরের নিকটস্থ নগর নামক স্থানে ছিল। অনুমান ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিরানন্দ শা পাটনায় আগমন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করেন। মাণিকচাঁদ নামক তাঁহার এক পুত্র বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করিতেন। ১৭০৩।৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে তিনি মুর্শিদাবাদে আগমন করেন; এবং নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সুনজরে পড়িয়া তৎকর্ত্তৃক অর্থ-সরবরাহকারী ও মন্ত্রণাদাতা রূপে নিযুক্ত হন। ইনিই বঙ্গের রাজস্ব সংগ্রহকারী হন এবং মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপন

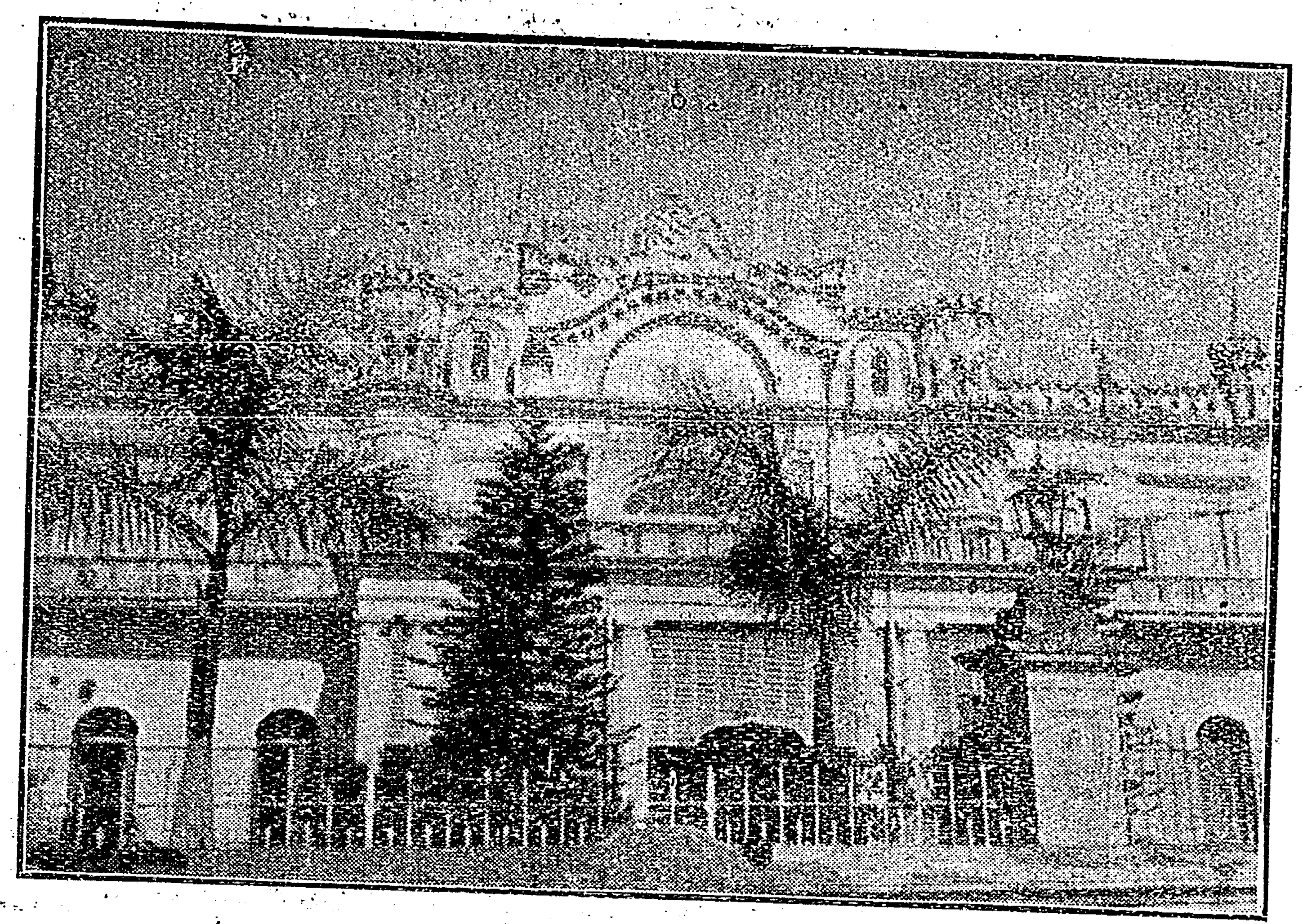

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—বর্ত্তমান নবাবের নূতন প্রাসাদের সম্মুখভাগ।

করেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফরকশিয়র তাঁহাকে "শেঠ" উপাধি প্রদান করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ফতেচাঁদ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি বলিয়া বিদিত হইলেন এবং ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট হইতে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। এইরূপ একটি জনশ্রুতি আছে যে, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ যখন মুর্শিদাবাদের নবাবী আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় তিনি ফতেচাঁদ জগৎশেঠের অনিন্দ্যসুন্দরী পুত্রবধূকে দেখিবার প্রবল বাসনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ফতেচাঁদ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সরফরাজকে সিংহাসন ও জীবন হারাইতে হইয়াছিল। জগৎশেঠদিগের এত অধিক ধন ছিল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সুতীর নিকটে ভাগীরথীর বিস্তৃত মোহানায় রৌপ্যমুদ্রা ঢালিয়া দিয়া উক্ত মোহানা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন—এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। এই সময় শেঠদিগের প্রায় ১০,০০০,০০০, টাকা

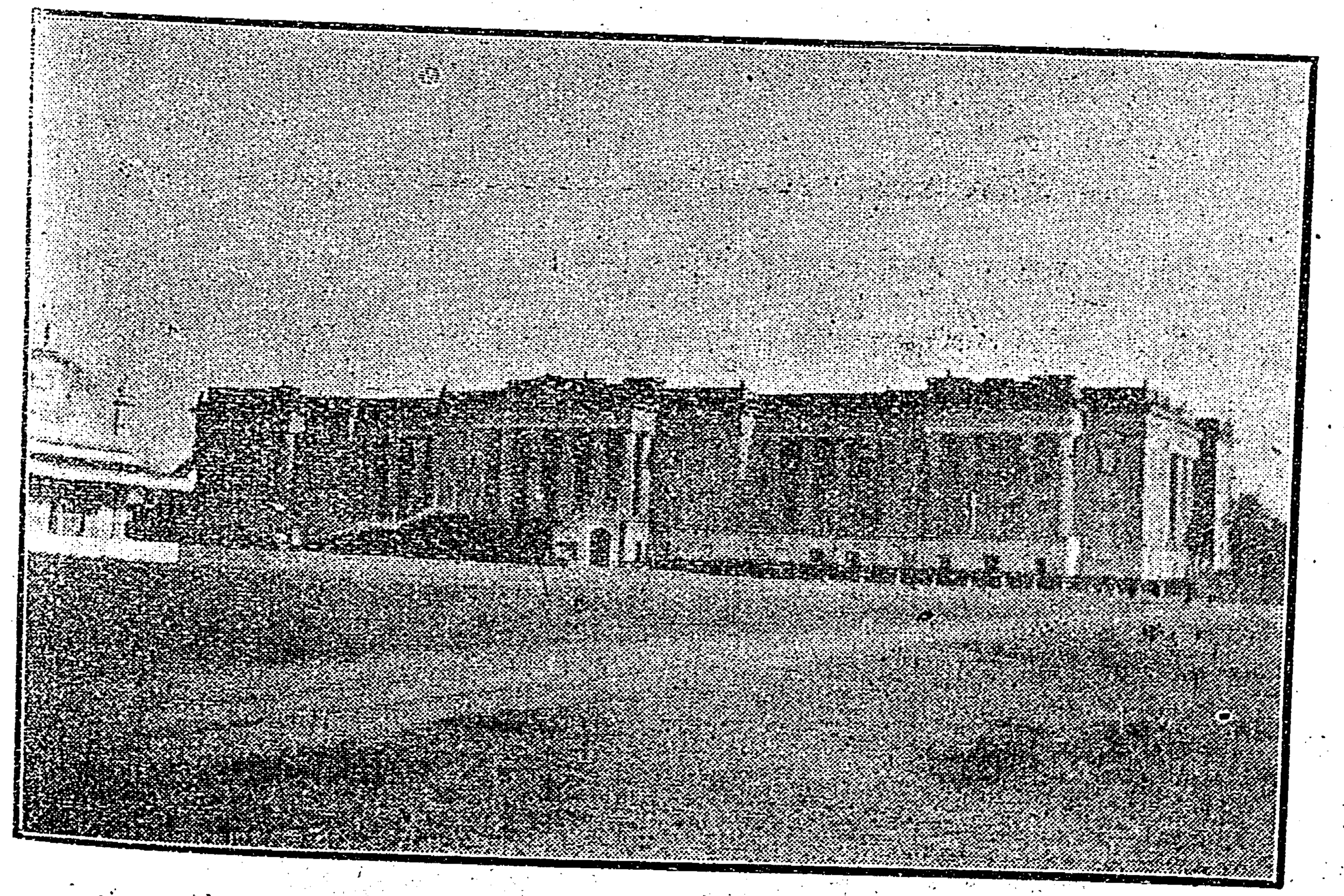

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—হাজার দুয়ারী বা প্যালেস

ছিল। ফতেচাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব রায় "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র স্বরূপচাঁদ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজদিগের সহিত নবাব মীরকাশিমের যুদ্ধারম্ভ হইলে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তদীয় সেনাপতি মহম্মদ তকী খাঁ জগৎশেঠ মাধবরায়কে এবং রাজা স্বরূপচাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে দুর্গের বুরুজ হইতে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। ইহার পর হইতে ইংরাজদিগের শাসন কালে জগৎশেঠবংশীয়দিগের প্রভাব প্রতিপত্তি কমিতে আরম্ভ হয়। নবাবী আমলে মীরকাশিমের সময় পর্য্যন্ত জগৎশেঠবংশীয়গণ রাজনৈতিক চক্রান্তসমূহে যে প্রধান নায়কের অংশ গ্রহণ করিতেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন।

নামক স্থানে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রাসাদ ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, মুর্শিদাবাদের নাম প্রথমে কুলুড়িয়া পরে মুকসুদাবাদ ও সর্ব্বশেষে মুর্শিদকুলী খাঁর নাম অনুসারে মুর্শিদাবাদ হইয়াছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৩।৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে এই স্থানে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়া তিন বৎসর পরে নিজ নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন।

বেলা ৯টার সময় আমরা ই, বি, রেল লাইন পার হইয়া নগরোপকণ্ঠের বনাকীর্ণ নির্জ্জন পথ ধরিয়া কাটরা মসজিদ দেখিতে পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। রাস্তাটি কাঁচা, অসমান এবং অপ্রশস্ত হওয়ায় অতি কষ্টে গাড়ী চলিতে লাগিল,—ভয় হইতে লাগিল বুঝি গাড়ী উল্টাইয়া যাইবে। এই নির্জ্জন পথের বাম পার্শ্বে এক স্থানে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি পুকুর আছে। উহার গভীর খাতে অতি সামান্য জল আছে।

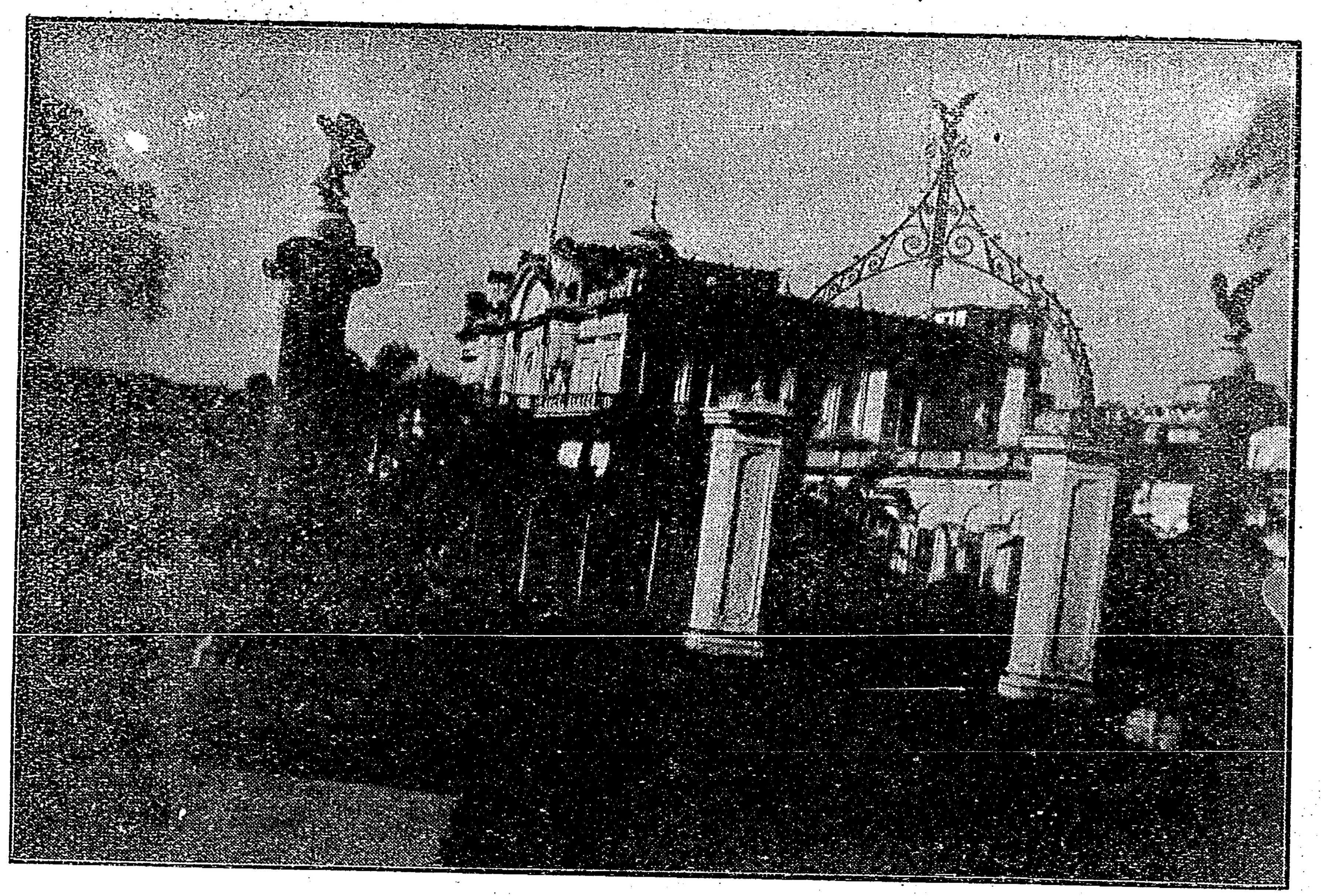

মুর্শিদাবাদ নিজামৎ কিল্লা।—নবাবের নূতন প্রাসাদের দক্ষিণ দিক।

জগৎশেঠের প্রাচীন ভিটার কিয়ৎদুর উত্তর দিকে ভাগীরথী-তীরে যেখানে এক্ষণে বহু বাবলা গাছ ও বন জঙ্গল হইয়া আছে, ঐ স্থানকে "সতী চৌরা" কহে। ঐ স্থানে সতীদাহ হইয়াছিল। এখানে পিতলের চুড়া-শোভিত একটি বৃহৎ গোলাকার মন্দির ছিল। উহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথী-গর্ভে লীন হইয়াছে।

সতীদাহের স্থান দেখিয়া আমরা ফিরিয়া চলিলাম। অতঃপর আমরা নবাব-বাটী বা নিজামৎ কিল্লার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কুলুড়িয়া নামক স্থানে পথিপার্শ্বে যাদু সাহেবের ইমামবাড়ার একতলা নগণ্য কোঠা ঘর ও অপর পার্শ্বে বনের মধ্যে অযত্নে রক্ষিত তিন-গুম্বজ-শোভিত একটি প্রাচীন বড় মসজিদ দেখিলাম। কথিত আছে যে, কুলুড়িয়া

পুকুরের উত্তর পাড়ে একটি এক-গুম্বজ-বিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদ আছে। উহার চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে, কিন্তু উপরে বড় বড় অশ্বথ ও বট গাছ হইয়াছে এবং গুম্বজটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই স্থান হইতে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া আমরা বৃহৎ কাটরা মসজিদের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইলাম। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন এই স্থানে কয়েকটি চালা ঘরে রাশিকৃত পিঁয়াজ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছিলাম,—এবার তাহা দেখিলাম না। যে ভূমিখণ্ডের উপর কাটরা মসজিদের বাটী দণ্ডায়মান আছে, উহার মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৮০।৯০ ফিট, এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৬৬ ফিট। মসজিদটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। ইহার সদর দরওয়াজা পূর্ব্ব দিকে।

প্রস্তর-মণ্ডিত ১৪টি সোপান দিয়া দরওয়াজার ঘরে উঠিতে হয়। এই ঘরের নীচে একটি প্রকোষ্ঠ আছে; তথায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বংশাবতংশ করতলব খাঁ ওরফে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কবর আছে। ইঁহারই আমলে ইঁহার কর্ম্মচারী নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ বাকী রাজস্বের জন্য জমিদারদিগের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিত, তাহার বিবরণ "রিয়াজে" ও ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ইহাঁরই আমলে জমিদারদিগকে তেকাঠায় পদদ্বয় দ্বারা ঝুলাইয়া বেত্রাঘাত, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা, শীতকালে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া হইত। বিষ্ঠা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ পূতিগন্ধময় "বৈকুণ্ঠ" বা "বেহেস্ত" নামক খাতে উহাদিগকে হাত ও পা বাঁধিয়া নিক্ষেপ করা

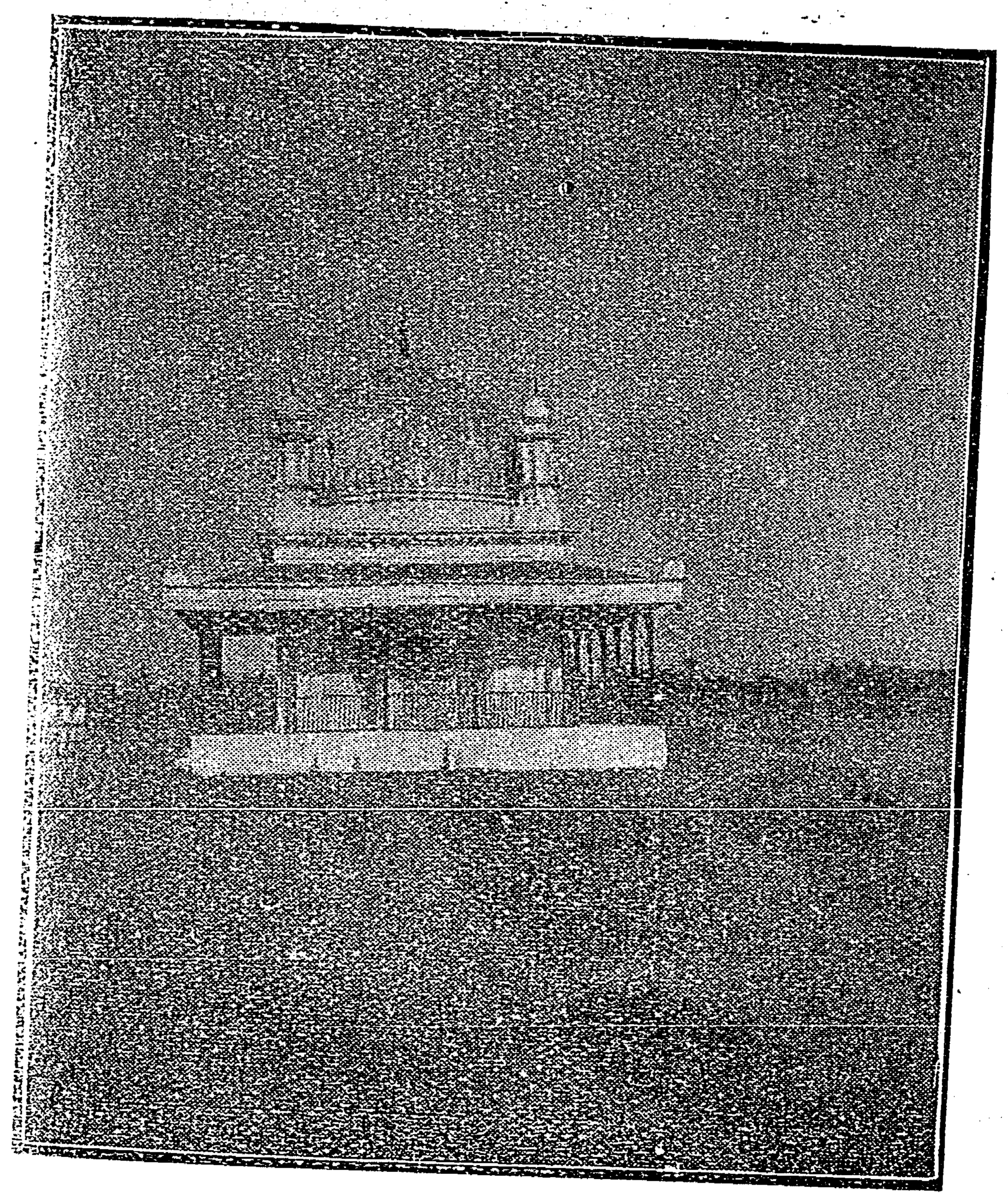

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—সিরাজ উদ্দৌলার ইমামবাড়ার মেদীনা

হইত। কখন তাহাদিগের ঢিলা পায়জামার মধ্যে বিড়াল ছাড়িয়া দেওয়া হইত; এবং কখন লবণ মিশ্রিত গো বা মেষদুগ্ধ পান করাইয়া তাহাদের উদরাময়ের সৃষ্টি করা হইত। মুর্শিদকুলী খাঁ মুসলমানদিগের নিকট পীরের ন্যায় সম্মানিত।

মুর্শিদকুলীর কবরটি অতি সাধারণ। কবরের উপর দিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসীগণ পদরজ দিয়া যাইবে বলিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই স্থান স্বীয় সমাধির জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সোপানশ্রেণী দিয়া দরওয়াজার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, দরওয়াজার ভিতর দিকে ৫টি ফোকর বা দ্বারের খিলান আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। দরওয়াজার উপরে দ্বিতলে নহবৎখানা আছে। ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে বিস্তৃত উঠান আছে। উঠানের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ১৮টি করিয়া ছোট ঘর পরস্পরের সহিত সংলগ্ন ছিল এবং প্রত্যেকের উপরে একটি করিয়া গুম্বজ ছিল। এই ঘরগুলির মধ্যে কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কতক আজিও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। উঠানের পশ্চিম দিকে ঐরূপ গুম্বজবিশিষ্ট ১৬টি ছোট ঘর আছে। উঠানের পূর্ব্ব দিকের মধ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত দরওয়াজা এবং তাহার উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে ৫টি করিয়া মোট ১০টি পূর্ব্বোক্তরূপ গুম্বজবিশিষ্ট ছোট ঘর আছে। এই ঘরগুলির প্রত্যেকের সম্মুখদেশে ৩টি করিয়া দ্বার আছে। তন্মধ্যে মধ্যের দ্বারটি পার্শ্বের দুইটি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বড়। এই ছোট ঘরগুলিতে মুসাফির ও ফকিরগণ থাকিতে পাইত। প্রকাশ আছে যে, এখানে ৭০০ কোরাণ পাঠকের স্থান হইত।

মসজিদবাটীর উঠানের মধ্যস্থলে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ৫ গুম্বজবিশিষ্ট একটি বড় মসজিদ আছে। দুইটি গুম্বজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাকী ৩টি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় আছে। মধ্যের গুম্বজটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। অর্দ্ধভগ্ন গুম্বজ তিনটির উপরিভাগে সবুজ বর্ণের এনামেল-করা চ্যাপটা ঘটীর ন্যায় মৃন্ময় চূড়া শোভা পাইতেছে। মসজিদের গুম্বজগুলি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মসজিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ৫টি বড় দ্বার আছে। তন্মধ্যে মধ্যের দ্বারটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার উপরিভাগে প্রস্তর-ফলকে ফার্শি ভাষায় লিখিত আছে যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়, এবং "আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব, যে তাঁহার দ্বারের ধূলি কণা নহে তাহার শিরে ধূলি বর্ষিত হউক।" দ্বারগুলির চৌকাঠ কাল পাথরের। সম্ভবতঃ এগুলি গৌড়ের কোন প্রাচীন কীর্ত্তি হইতে খুলিয়া আনা হইয়াছিল। মসজিদের পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের বহির্দ্দেশে কার্ণিশের নীচে একসারি লৌহ বলয় বা কড়া আছে। উহাতে প্রয়োজনানুসারে পর্দ্দা বা চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইত। মসজিদের অভ্যন্তরের মাপ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০৮ ফিট × পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ২৭' ফিট। দেওয়ালের স্থূলতা প্রায় ৬ ফিট। মসজিদাভ্যন্তরে পশ্চিম দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে যে উপাসনার প্রধান মিম্বর বা কুলুঙ্গীটি আছে, উহার উপরিভাগে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-ফলকে সম্ভবতঃ কোরাণের বয়েত লিখিত আছে। এই মসজিদবাটীর সদর দরওয়াজা হইতে মসজিদে বা উপাসনালয়ে যাইবার জন্য উঠানের মধ্য দিয়া কাল পাথরের ৩' ফিট প্রশস্ত একটি পথ আছে।

স্থানীয় লোকে কহিয়া থাকে যে, এই মসজিদবাটীর উঠানের নীচে পূর্ব্বে খিলান-করা ঘর ছিল—তাহা এক্ষণে বসিয়া গিয়াছে। উঠান বসিয়া গিয়াছে কি না বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু মসজিদবাটীর পশ্চিম দিক যে বসিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া বুঝা যায়। মসজিদবাটীর বহির্দ্দেশে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার দিকে দুইটি ৬০।৬৫ ফিট উচ্চ অষ্ট-কোণ মিনার আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম দিকেরটির অবস্থা আজিও কথঞ্চিৎ ভাল আছে। ইহার উপরে উঠিতে হইলে ৬৯টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া (নিখিল বাবুর "মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে" ৬৭ সিঁড়ি লিখিত আছে।)

উঠিতে হয়। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকের বহু দূর পর্য্যন্ত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে মক্কার কোন মসজিদের অনুকরণে কাটরার এই মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ ১১৩৯ হিজিরায়=১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপূর্ব্বে ১১৩৭ হিজিরায়—১৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা কাটরা বা গঞ্জের মধ্যস্থ মসজিদ বলিয়া ইহার নাম "কাঠরা মসজিদ" হইয়াছে। এখানে এক্ষণে প্রতি সপ্তাহে দুইবার ছোট হাট হয়।

কথিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ এই মসজিদ নির্ম্মাণের ভার মোরাদ ফরাস নামক এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করেন। মোরাদ সর্ত্ত করিয়া লইয়াছিল যে ৬ মাস কালের মধ্যে সে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে, কিন্তু তাহার কোন কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। পাষণ্ড মোরাদ জমিদারদিগের নিকট হইতে মিস্ত্রী, ছুতার, মজুর ও কারিকর প্রভৃতি বেগার ধরিয়া, হিন্দুর মন্দির ও আবাস গৃহাদি ধ্বংস করতঃ উহার মাল মসলা দ্বারা এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। হিন্দুর দেবালয়ের ইষ্টকের পরিবর্ত্তে নূতন ইষ্টক দিতে চাহিলেও তাহা গৃহীত হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে ৪।৫ দিনের পথ পর্য্যন্ত নদীতীরে কোন স্থানে মোরাদের অনুচরবর্গ হিন্দুর দেবালয় অভগ্ন রাখে নাই। "তারিখ বাঙ্গালায়" ইহার বিবরণ আছে। বর্ত্তমান কালের এদেশীয় ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ মন্দিরাদি ভাঙ্গায় কথা অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। ইহাতে অবিশ্বাসের কিছুই নাই। সম্ভবতঃ মোরাদানুচরগণ কিরীটেশ্বরীর কোন ক্ষতি করে নাই, কারণ উহা বাদশাহের ফার্ম্মাণ দ্বারা রক্ষিত ছিল। কাটরা মসজিদের সন্নিকটে কয়েক জন মুসলমানের খড়ুয়া ঘর আছে। মসজিদটি গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত।

কাটরা মসজিদের কিঞ্চিৎ দূরে পশ্চিম দিকে ফৌতি বা ফুটি মসজিদ আছে। সরফরাজখাঁ ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহা নিজামৎ কিল্লা হইতে ১/৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ৫টি গুম্বজের মধ্যে ২টি আছে।

এই স্থান হইতে আমরা তোপখানা ও গোবরা নালা অভিমুখে চলিলাম। কাটরা মসজিদের অদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এই দুইটি অবস্থিত। মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদ নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে এই স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভাগীরথীর যে শাখা প্রবাহিত ছিল, উহারই কোন স্থান গোবরানালা ও কোন স্থান ভাণ্ডারদহ বিল বলিয়া বিদিত। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা ও বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে তোপ, বন্দুক ও অস্ত্র শস্ত্র আনিয়া এই তোপখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিক দিয়াই রাজধানীর পূর্ব্ব দিকের প্রবেশ-পথ। তোপখানার পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বোক্ত গোবরা নালা বা কাঠরা ঝিল নামক সুপ্রশস্ত খাল অবস্থিত; ইহার স্থানে স্থানে গ্রীষ্মকালে সামান্য জল থাকে। এই খালের অদূরে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ আছে। উহার কাণ্ডের মধ্যে একটি অতি বৃহৎ লৌহ কামান প্রবিষ্ট থাকিয়া ভূমি হইতে ৪ ফিট-উচ্চে শূন্যে ঝুলিতেছে। এক কালে এই কামানটি লইয়া যাইবার সময় ইহার চাকা এই স্থানে কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যায়। ফলে কামানটি পরিত্যক্ত হয়। তৎপরে এই স্থানে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটি জন্মিয়া কামানটিকে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করতঃ ক্রমশঃ উহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়াছে। কামানটি ১৭॥০ ফিট দীর্ঘ। ইহার বেষ্টন তিন হস্তের অধিক, মুখের বেড় ১ হস্তের অধিক এবং রঞ্জুত ঘরের ব্যাস ১॥ ইঞ্চ। ইহার অঙ্গে কয়েকটি লৌহ-নির্ম্মিত বড় বলয় বা কড়া লাগান আছে। ইহার নাম "জাহান কোশা তোপ" অর্থাৎ ইহা জগজ্জয়ী। ইহার গাত্রে ৯টি পিতলের পাতে ফার্শি অক্ষরে কতকগুলি লিপি আছে। তন্মধ্যে ৩টি অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ডের মধ্যে

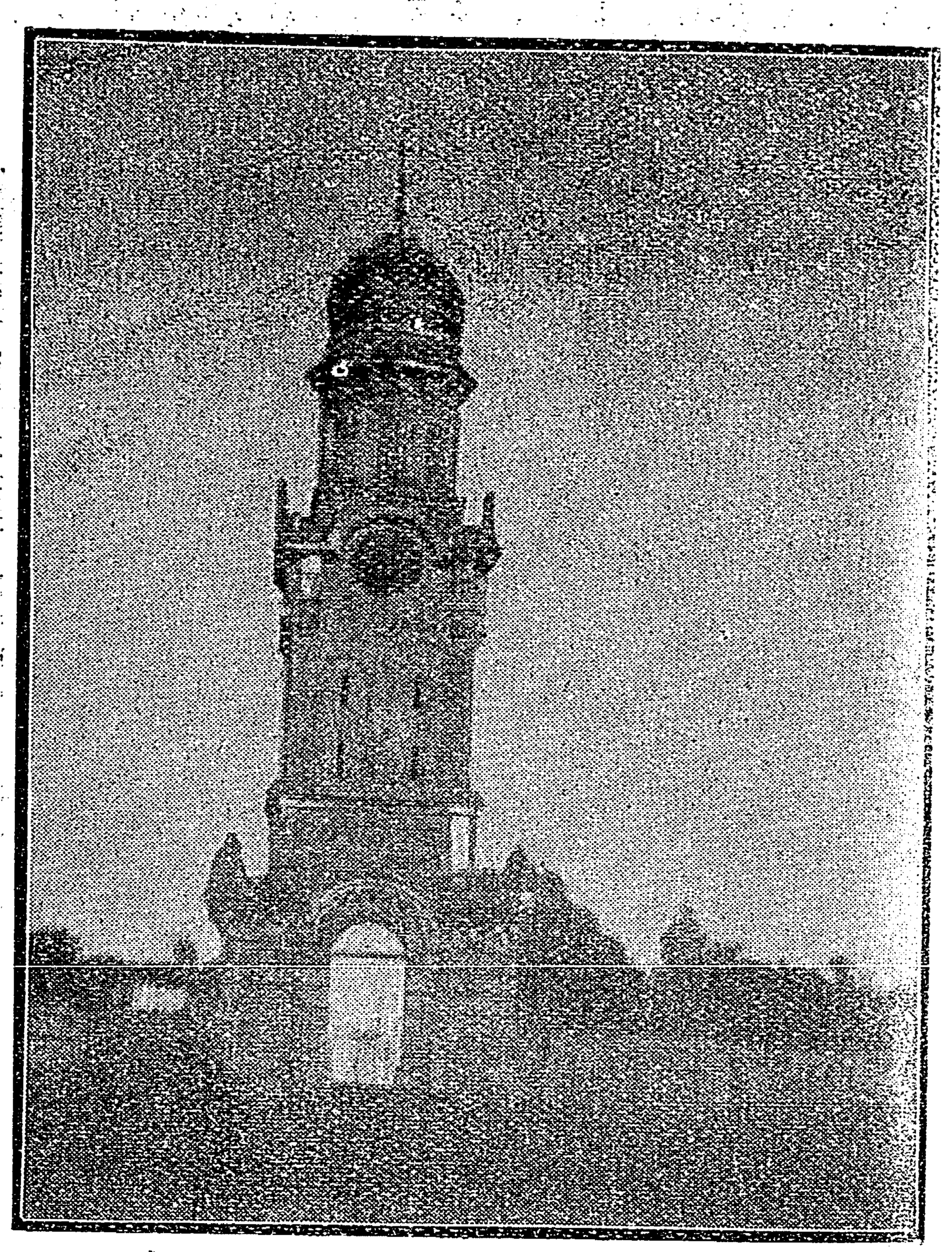

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—ঘড়ী ঘর

লুক্কায়িত হইয়াছে। এই সকল লিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা শাজাহাঁ বাদশাহের রাজত্ব কালে যৎকালে (বঙ্গবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বনাশকারী) ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার রূপে ঢাকায় থাকিতেন, তৎকালে জাহাঙ্গীর নগরের (অর্থাৎ ঢাকার) দারোগা সের মহম্মদের অধীনে হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন নামক জনৈক কর্ম্মকার দ্বারা ১০৭৪ হিজরি ১১ই জমাদিয়সসানি (১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে) তারিখে এই কামানটি নির্ম্মিত হয়। ইহার ওজন ২১২ মণ। ইহাকে প্রত্যেক বার দাগিতে ২৮ সের বারুদ লাগে। ইহার উপরে নবাব ইসলাম খাঁর ও এই কামানের প্রশংসাবলী ফার্শি অক্ষরে লিখিত আছে। যে দেশের হিন্দু বাঙ্গালী কর্ম্মকার সামান্য সূচ হইতে এরূপ তোপ তৈয়ার করিতে

পারিত, সে দেশ বিলাতি দ্রব্য আমদানীর পর হইতে প্রায় কর্ম্মকার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কামান তৈয়ার করা দূরের কথা—অনেকে কামান চক্ষে পর্য্যন্ত দেখে নাই। কামানটি এক্ষণে দেবত্ব লাভ করিয়াছে,—সিন্দূর-লিপ্ত হইয়া পূজিত হইতেছে। এই তোপের সন্নিকটে একটি মুসলমান পল্লী ও অত্যন্ত বন জঙ্গল আছে।

অতঃপর আমরা কদমরসুল বা কদমসরিফ দেখিতে চলিলাম। ইহা কাটরা মসজিদের প্রায় সিকি মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে নবাব মির্জাফরের প্রধান খোজা নবাব নাজরি ইহা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করেন। এই বাটীর সদর দ্বার পশ্চিম দিকে। বাটীর

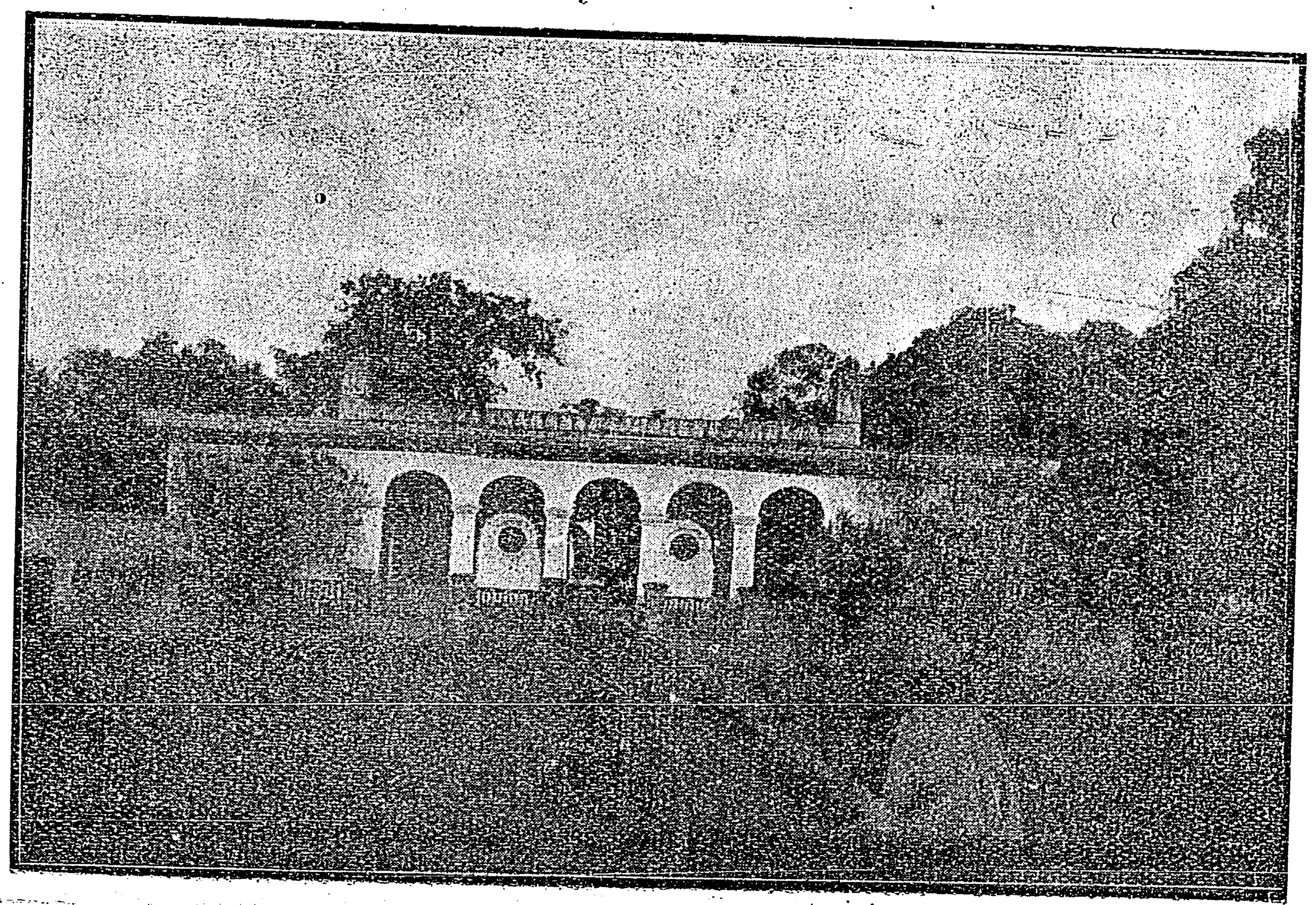

মুর্শিদাবাদ—খুসবাগ।—আলিবর্দ্দী ও সিরাজউদ্দৌলার কবর-শোভিত গৃহ। মধ্যের দরজার ভিতর দিয়া সিরাজের কবর দেখা যাইতেছে।

মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি উঠান আছে। উহার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কবর এবং মধ্যস্থলে একটি পানীয় জলের ইন্দারা আছে। উঠানের উত্তর দিকে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত উচ্চ মহল আছে। এই মহলের মধ্যস্থলে যে উঠান আছে, উহার পশ্চিম দিকে একটি মসজিদ আছে। মসজিদের চারি কোণায় চারিটি মিনার আছে। এই উঠানের পূর্ব্ব দিকে একটি একতালা ঘর আছে। উহা ইমামবাড়া বলিয়া অভিহিত হয়। উঠানের উত্তর দিকে একটি এক-গুম্বজ-বিশিষ্ট ঘর আছে। উহার চারি কোণায় চারিটি মিনার আছে। এই ঘরের মধ্যে একটি বেদীর উপরে শ্বেত প্রস্তরে খোদিত একটি পদচিহ্ন আছে। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই কদমরসুলটি বসন্ত আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি দিয়াছিল। ইহা ছাড়া এক জোড়া কটা বর্ণের বেলে পাথরের পদচিহ্নও আছে। মুসলমানগণ কহিয়া থাকে যে, তাহারা পৌত্তলিক নহে; কিন্তু এখানে ও গৌড়ে দেখিলাম যে, ইহারা পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকে। কদমরসুলের বাটীতে চূণকাম হওয়ায় উহা দেখিতে অতি সুশ্রী হইয়াছে।

গৌড়ে যাইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তথাকার কাল কষ্টিপাথরের কদমরসুল নবাব সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে নবাব মির্জাফর উহা পুনরায় গৌড়ে ফেরত পাঠাইয়া দেন। সিরাজ গৌড়ের কদমরসুল কোন্ স্থানে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারি নাই।

কদমরসুল দেখিয়া আমরা মবারক মঞ্জিল বা হুমায়ুন মঞ্জিল দেখিতে চলিলাম। নবাব মির্জাফরের অন্যতম পুত্র নবাব মবারকদ্দৌলা এবং নবাব হুমায়ুন ঝার নামানুসারে এই দুইটি নামকরণ হইয়াছে। এই মঞ্জিল বা বাগান-বাড়ী মতিঝিল হইতে অল্প দূরে উহার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। সম্মুখ দিকে বারান্দা ও স্তম্ভশোভিত একটি একতলা বড় দালান আছে। ইহারই অদূরে স্তম্ভশোভিত একটি উচ্চ বাটী আছে। উহা দেখিতে কতকটা কলিকাতার নিমতলা ষ্ট্রীটের ডাফ কলেজের (বর্ত্তমান যোড়াবাগান পুলিস কোর্টের) বাটীর ন্যায়। উহা ইংরাজের আমলে নির্ম্মিত। এককালে এই স্থানে ইংরাজ আমলের নিজামৎ আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালত অবস্থিত ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নবাব হুমায়ুন ঝা বাটীসহ এই জমি খরিদ করিয়া এখানে বাগান-বাটী নির্ম্মাণ করেন। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই স্থানে পূর্ব্বে বঙ্গের সুবেদারদিগের অভিষেকের জন্য কৃষ্ণপ্রস্তরের মসনদ ছিল। প্রস্তর-নির্ম্মিত এই মসনদ

বা বড় জলচৌকিটি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। মসনদটি সা সুজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা ক্রমে বঙ্গের চারিটি রাজধানীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে ; যথা—রাজমহল হইতে ঢাকা, ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদ ও মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা। বর্ত্তমান কালে এই স্থানটি জনশূন্য ও নির্জ্জন ; গৃহগুলি পতিত ভুমিখণ্ডের মধ্যে অযত্নে দণ্ডায়মান আছে।

অতঃপর আমরা মতিঝিল দেখিতে চলিলাম। মতিঝিলের পূর্ব্ব দিকের ছায়া-শীতল রাস্তায় আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। কোথাও জনপ্রাণী নাই। রৌদ্রাধিক্যের জন্য কোথাও পক্ষীর শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। নিজামৎ কিল্লা বা নবাব-বাটী হইতে ১॥০ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে মতিঝিল অবস্থিত। এই সরোবরের আকৃতি ঘোড়ার ক্ষুরের ন্যায়, কিন্তু আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, এই স্থান হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন ইহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা পূর্ব্বে ভাগীরথীর খাত ছিল। উক্ত পরিত্যক্ত খাত কাটাইয়া ঝিলে পরিণত করা হইয়াছিল। ইহার জলের উপরিভাগে ঘন পদ্মবনের মধ্যে জলপিপি ও পানকৌড়ি মহানন্দে জলকেলি করিয়া বেড়াইতেছে। এই স্থান হইতে ঝিলের অপর পারে অর্থাৎ পশ্চিম পারে ইংরাজ আমলের একটি একতলা কোঠা ঘর আছে। শুনিলাম যে, উহা ইংরাজদিগের একটি পুরাতন কুঠীর ঘর। ঝিলের উত্তর প্রান্তে একটি তিন-গুম্বজ-বিশিষ্ট বড় মসজিদ আছে। উহার চারি কোণায় মিনার আছে। মতিঝিলের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে নবাব আলীবর্দ্দীর জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি ইমারত, একটি মসজিদ এবং সঙ্গী-দালান নামক একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই স্থানের বৃহৎ প্রাসাদ গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে সংগৃহীত কৃষ্ণবর্ণের কষ্টিপ্রস্তরের স্তম্ভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এক্ষণে এই স্থানে সঙ্গী-দালানের ভিতমাত্র অবশিষ্ট আছে, ও নওয়াজেসের সময়ের প্রাচীন মসজিদ, নবাব মির্জ্জাফর কর্ত্তৃক ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত একটি বারদ্বারী এবং প্রাচীন নগরতোরণের ধ্বংসাবশেষ আছে। এতদ্ব্যতীত একটি দ্বারবিহীন গৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। উহা ৬৫ ফিট দীর্ঘ, ২৩´ ফিট প্রশস্ত এবং ১২´ ফিট উচ্চ। অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে, ইহার মধ্যে ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে। কিন্তু উহার সন্ধান করিতে গেলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। নওয়াজেসের মৃত্যুর পরে তদীয় রূপসী বিধবা পত্নী ঘেসেটী বেগম এই স্থানে বাস করিতেন। পরে নবাব সিরাজদ্দৌলা ঘেসেটীকে এই স্থান হইতে বিদূরিত করিয়া তাঁহার ধনদৌলত আত্মসাৎ করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে নবাব মীরকাশিমের সৈন্যগণ ইংরাজ সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই স্থানে ঘেসেটী বেগমের ত্যক্ত প্রাসাদে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের বোর্ড অব রেভেনিউ আপিস ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই স্থানে নবাব নাজিম উদ্দৌলাকে মসনদে বসাইয়া তাঁহার দক্ষিণ দিকে চতুর ক্লাইব দেওয়ানরূপে

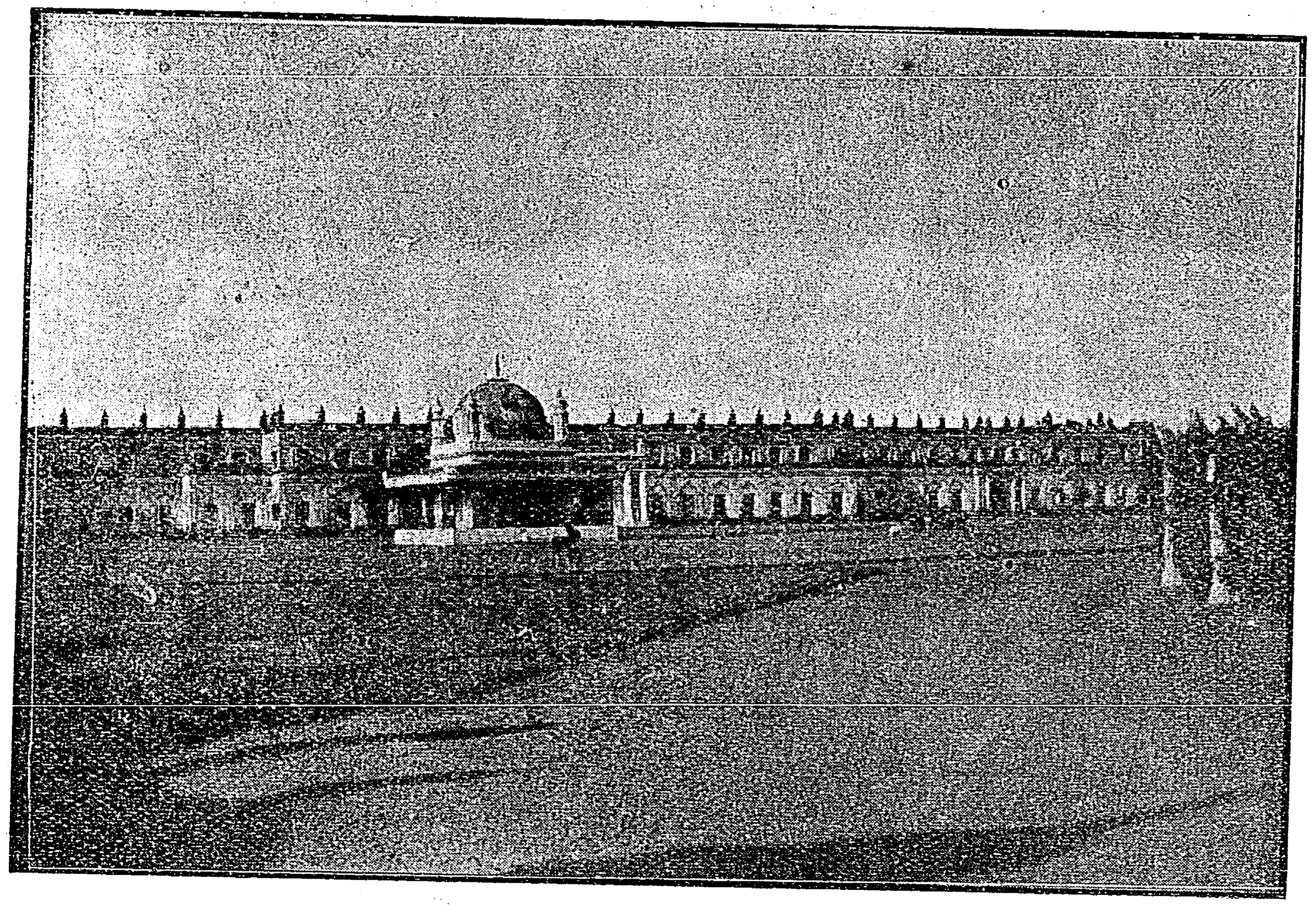

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—ইমামবাড়া

উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মতিঝিলের পূর্ব্বতীরে বৈষ্ণবদিগের তীর্থ কোঁয়ারপাড়া বা কুমারপুর অবস্থিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীব গোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া বৃন্দাবন হইতে এই স্থানে আসিয়া ৺ রাধামাধব বিগ্রহ ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে নবনির্ম্মিত মন্দিরে বিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন। এখানে স্নান-যাত্রা উপলক্ষে মেলা হয়। কথিত আছে যে নবাব আলীবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ যখন মতিঝিলের পূর্ব্ব-তীরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, সেই সময় ৺ রাধামাধবের মন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা শব্দে অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি এই স্থান হইতে বৈষ্ণব মোহান্তকে বিদূরিত কবিবার জন্য তাঁহার নিকটে মুসলমানের খানা পাঠাইয়া দেন। উক্ত খানার আবরণ খুলিয়া সকলে দেখে যে, খানার পরিবর্ত্তে তথায় যূথী ফুলের মালা রহিয়াছে। মোহন্তের তপঃ প্রভাবে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে বুঝিয়া নওয়াজেস ঝিলের চারিদিকের ঘাটে মৎস্য ও পক্ষী বধ নিষেধ করিয়া দেন। এই স্থানের বর্ত্তমান মোহান্ত ঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ।

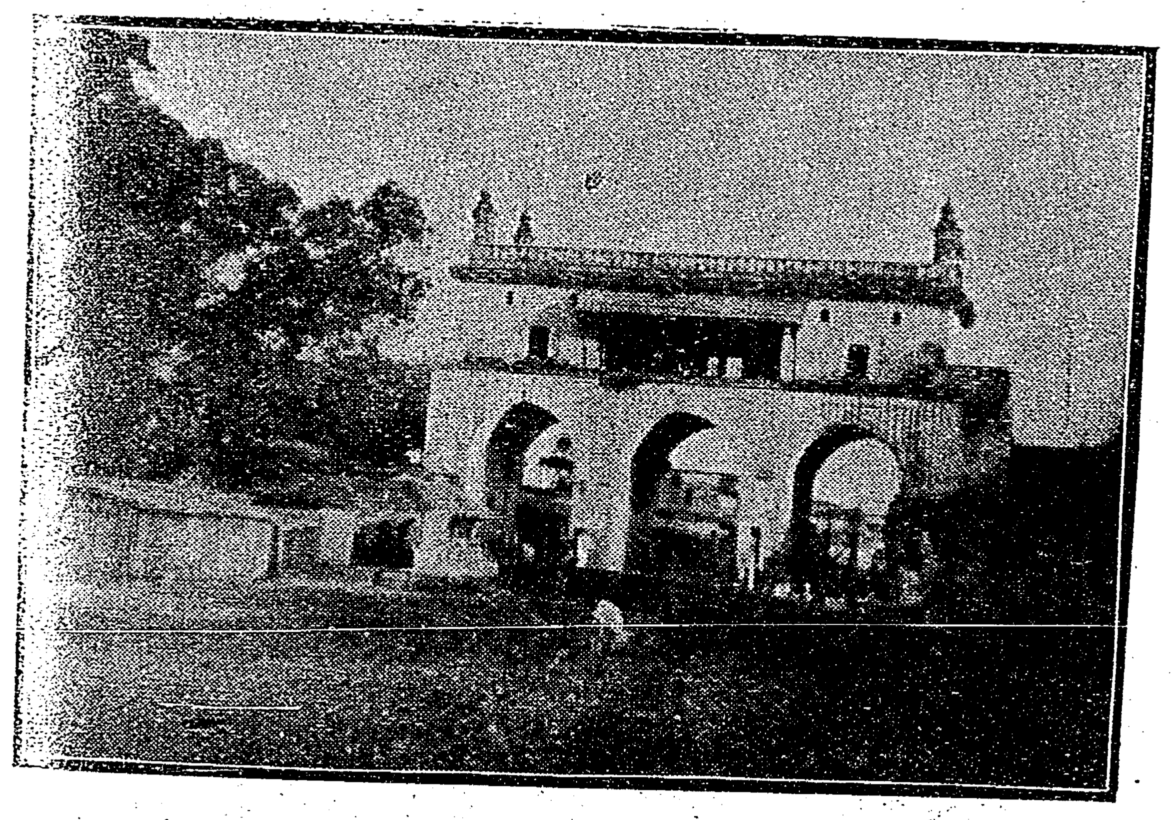

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—চকের নিকটস্থ ত্রিপলিয়া দরওয়াজা

বেলা অধিক হওয়ায় নবাব সাহেবের গাড়ীর ঘোটক এবং আমরা ক্ষুৎ পিপাসায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। নবাবের কোচোয়ান বৈকালে ২॥০ টার সময় আবার গাড়ী আনিবে বলিয়া বিদায় লইল। এক্ষণে বেলা ১১॥ টা অতীত হইয়াছে। বাসার ভৃত্যকে রন্ধনের আয়োজন করিয়া রাখিবার জন্য প্রাতঃকালেই অর্থ দিয়া রাখিয়াছিলাম। সে সকল আয়োজন সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু পরিশ্রান্ত দেহে এত বেলায় রন্ধন করে কে? এত বেলায় বাঙ্গালীর খাদ্য ভাত ভিন্ন অন্য কিছুই ভাল লাগিবে না। অবশেষে ভৃত্যের সাহায্যে ললিতাদাদা দুইটি ভাতে ভাত চড়াইয়া দিলেন। খাঁটি গব্য ঘৃত সহ মুগের ডাল ভাতে ও আলুভাতে ভাত এবং খাঁটি দুগ্ধ দ্বারা আহার সম্পন্ন করা হইবে, ইহাই সাব্যস্ত হইল। ভাত চড়াইয়া দিয়া আমরা নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে স্নান সমাপন করিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া আহার সমাপন করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

বেলা ৩টা হইল, কিন্তু নবাব সাহেবের গাড়ীর দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠিল না। তখন অগত্যা সন্নিকটস্থ ভাড়াটীয়া গাড়ীর আস্তাবলে যাইয়া এই দিন বৈকালের জন্য ও পরের দুইদিনের জন্য গাড়ীভাড়া এক সঙ্গে ফুরান করিয়াছিলাম। অতঃপর বেলা অনুমান ৩॥০ টার সময় আমরা ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ সহরের বাকী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে চলিলাম। এই সকল দ্রষ্টব্য স্থানের অবস্থান অনুসারে তাহাদিগের বর্ণনা করা যাইতেছে।

যথেষ্ট রৌদ্র আছে এবং ফটোগ্রাফ লইবার সুবিধা হইবে বলিয়া বেলা ৩॥০ টার সময় আমরা প্রথমেই বর্ত্তমান নবাব-বাটী বা নিজামৎ কিল্লা দেখিতে চলিলাম। এই স্থানে ও ইহার পূর্ব্ব দিকস্থ কুলুড়িয়া নামক স্থানে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সর্ব্ব প্রথম ইমারত ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিজামৎ কিল্লার দক্ষিণ দিকস্থ "দক্ষিণ দরওয়াজা" দিয়া আমরা নবাব-বাটীর এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই দরওয়াজাটি দ্বিতল। ইহার দুই পার্শ্বে শান্ত্রিগণের থাকিবার জন্য প্রকোষ্ঠ আছে। দরওয়াজা ছাড়াইয়া ভাগীরথীর পাড়ের উপরের রাস্তা দিয়া উত্তর দিকে যাইতে দেখা যায় যে, ডাইন দিকে নবাবের পুষ্পোদ্যান ও বাটী আছে, এবং বাম দিকে ভাগীরথীর একটি ঢালু স্নানের ঘাটের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি অতি সুশ্রী তিন-গুম্বজ-শোভিত ছোট মসজিদ আছে। এই স্থানে রাস্তার দুই পার্শ্বে দুইটি কাল পাথরের স্তম্ভ আছে। উহাদের শিখর দেশে পক্ষ বিস্তার করিয়া—যেন উড়িতে উদ্যত এইরূপ—দুইটি শ্বেত পারাবত বা পক্ষী শোভা পাইতেছে। এই স্তম্ভ দুইটি অতিক্রম করিয়া যাইতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে নবাবের নূতন প্রাসাদ (New Palace) আছে। ইহার সম্মুখভাগে বালির জমাটের উপর নানা প্রকার লতা ও পুষ্পাদি উৎকীর্ণ আছে। প্রাসাদটি শুভ্র বর্ণের। ইহার সম্মুখে ও পার্শ্বে ফুলবাগান আছে। ফুলবাগানের পশ্চিমে লালবর্ণের রাস্তা ও রাস্তার পশ্চিমে বাড়ীর খাতের মধ্যে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থানে নূতন প্রাসাদের সম্মুখে ভাগীরথীর পাড়ের ঠিক উপরে চতুর্দ্দিক খোলা একটি অতি সুশ্রী হাওয়াখানা বা বায়ু সেবনের ঘর আছে। হাওয়াখানার উত্তর দিকে ভাগীরথীর ধারে একটি অতি সুন্দর ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ঘাট আছে ; এবং ঘাটের উপরের রাস্তার দুই পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত রূপ শ্বেত পক্ষী-শোভিত দুইটি মসৃণ কাল পাথরের (marble) স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভ দুইটি ছাড়াইয়া ভাগীরথীর পাড়ের উপরের পথ ধরিয়া উত্তর দিকে যাইতে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে নকল পাহাড়

ও ঝিলাদি দ্বারা শোভিত নবাবের বিস্তৃত প্রমোদ-উদ্যান আছে। ইহারই সন্নিকটে ভাগীরথী-তীরে যাইবার জন্য রাস্তার নীচে দিয়া একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ আছে। ইহা ছাড়াইয়া উত্তর দিকে যাইতে রাস্তার বাম বা পশ্চিম পার্শ্বে ভাগীরথীর পাড়ের উপরে একটি সুশ্রী তিন গুম্বজ-যুক্ত হরিদ্রাবর্ণের ছোট মসজিদ আছে; এবং রাস্তার ডাইন বা পূর্ব্ব পার্শ্বে বিখ্যাত "হাজার দুয়ারী" বা "আয়না মহল" বা "প্রাসাদ" (Palace) বা "বড়কোঠী" অবস্থিত আছে।

হাজার দুয়ারী অর্থাৎ প্যালেসটি ইটালীয় ধরণে নিম্মিত একটি বৃহৎ ত্রিতল বাটী। ইহা নবাব হুমায়ুন ঝার সময় নির্ম্মিত হয়। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার কোরের জেনেরেল ডানকান ম্যাকলিয়ড ইহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ইহা নির্ম্মিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে (ওয়ালস সাহেবের মতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) ইহার বনিয়াদের পত্তন করা হয় এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহার সম্মুখভাগ উত্তর দিকে এবং এই দিকে দ্বিতলে উঠিবার জন্য ভূমি হইতে অতি প্রশস্ত ও একতলা সমান উচ্চ সোপানশ্রেণী (Grand Staircase) আছে। প্রাসাদের উপরে একটি গুম্বজ আছে। উহা এরূপ বৃহৎ বাটীর পক্ষে অতি ক্ষুদ্র ও বেমানান হইয়াছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে গুম্বজ আছে বলিয়াই বোধ হয় না। এই বাটী নির্ম্মাণ করিতে ১৭ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

হাজার দুয়ারীর নীচের তলায় তোষাখানা, শেলেখানা (অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার ঘর) ও দপ্তরখানা (record room) আছে। শেলেখানাটি এই প্রাসাদের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এখানে নানা প্রকার প্রাচীন ও অদ্ভুত অস্ত্র, যথা—তরবারি, বল্লম, ছোরা, কামান ও বন্দুক প্রভৃতি আছে। ওয়ালস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এখানে কারুকার্য্য-বিমণ্ডিত পিত্তল-নির্ম্মিত চাকাওয়ালা একটি কামান ছিল, উহা ৩´ ফিট দীর্ঘ। ইহা দুই সের ওজনের গোলা নিক্ষেপ করিতে সমর্থ। কামানটির মুখ মনুষ্যের বদনমণ্ডলের ন্যায়, কিন্তু চোয়াল দুইটি কুম্ভীরের চোয়ালের ন্যায় এবং কর্ণ দুইটি খাড়া হইয়া থাকিত। ইহার গাত্রে নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত ছিল। ইহার উপরিভাগের মধ্যস্থলে যে লিপি ছিল, উহাতে "জয়কালী" শব্দ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম লিখিত ছিল। ইহার উপরের খোদাই কার্য্য রূপরাম চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিশোরদাস কর্ম্মকার এই কামান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কামানটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর ইহা নিজামত শেলেখানায় স্থান প্রাপ্ত হয়। এই মূল্যবান কামানটি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদিগের হয় নাই। নীচের তলায়, উপরের তলায় উঠিবার সিঁড়ির নিকটে কুম্ভীর ও অন্যান্য কয়েকটি মৃত জন্তু (Stuffed) সজ্জিত আছে। এইখানে সিঁড়ির সন্নিকটে একটি বেঞ্চির উপরে একখণ্ড অতি স্থূল বংশ-দণ্ড রক্ষিত আছে, ইহার বেড় প্রায় ২ ফিট ১ ইঞ্চ। এরূপ মোটা বংশ-দণ্ড পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। হাজার-দুয়ারীর দ্বিতলে বৃহৎ দরবার-কক্ষ, ভোজন-কক্ষ, বিলিয়ার্ড-কক্ষ ও বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদিগের জন্য শয়ন-কক্ষ প্রভৃতি আছে। দ্বিতলের বিভিন্ন কক্ষে বহু প্রাচীন ও মূল্যবান চিত্র, হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত পালঙ্ক ও পুত্তলিকাদি এবং বিলাসের সাজ-সজ্জা আছে। কক্ষগুলির তলদেশ মূল্যবান প্রস্তরমণ্ডিত। প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন প্রকারের মূল্যবান আসবাব-পত্র দ্বারা সুসজ্জিত। দ্বিতলের দরবার-ঘরের উপরেই এই প্রাসাদের

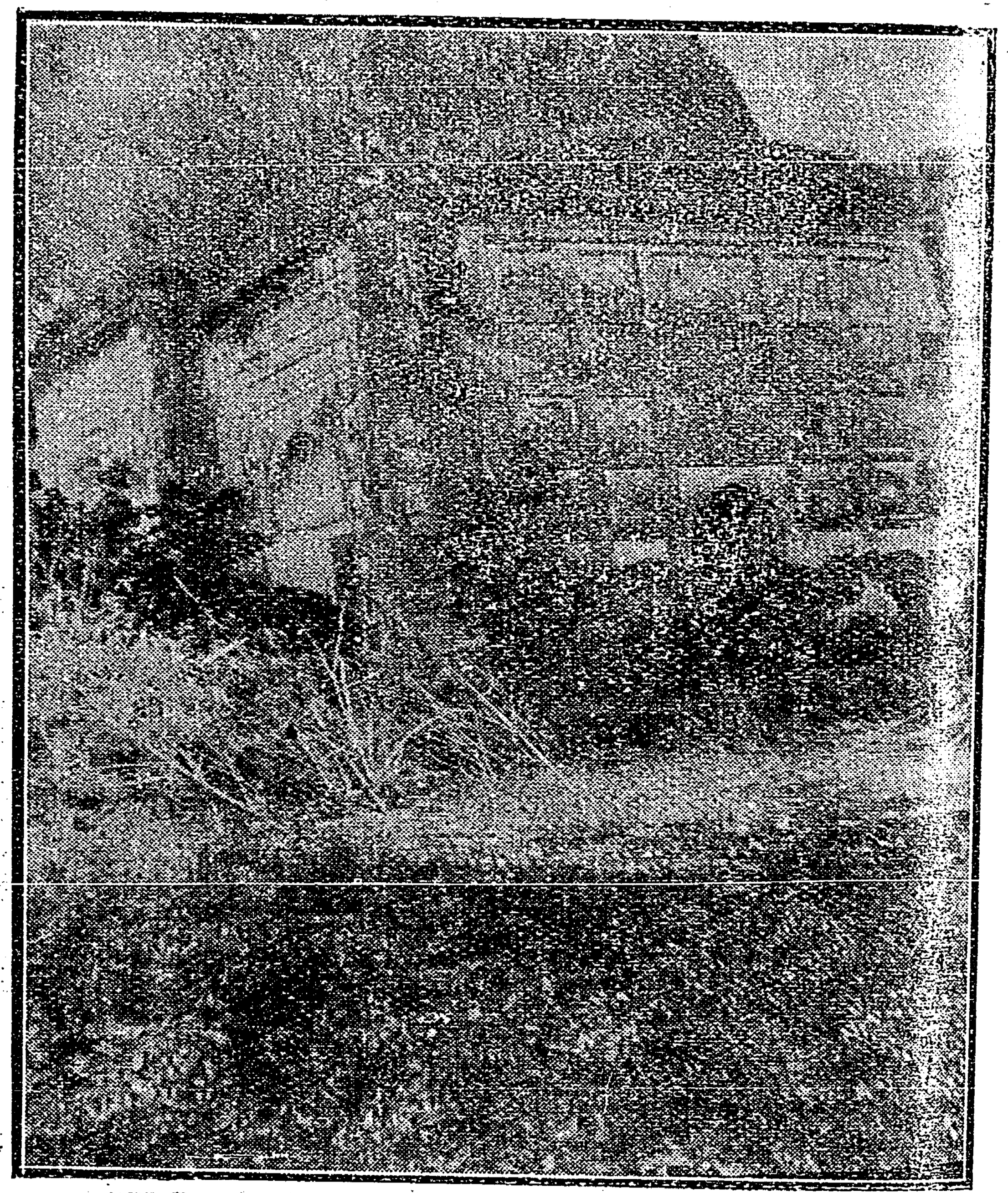

মুর্শিদাবাদ—ষ্টেসনের নিকটস্থ বেগম মসজিদ

গুম্বজটি অবস্থিত। উক্ত গুম্বজ ৬৩ ফিট উচ্চ ও উহার পার্শ্বে আলোক প্রবেশের জন্য কাচ আচ্ছাদিত পথ (sky light) আছে। গুম্বজের নিম্নে ৪টি লোহার শিকল হইতে একটি মোটা লোহার শিকল নামিয়া আসিয়াছে। উহাতে একটি শ্বেতবর্ণের বেলোয়ারি কাচের বৃহৎ ঝাড় ঝুলিতেছে। উহার ১০১টি ডাল আছে। এই বৃহৎ দরবার-গৃহের চারি কোণায় চারিটি খিলান-করা প্রকোষ্ঠের ন্যায় স্থান আছে। ঐগুলির মধ্যে এক একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। এই ঘরে মখ্‌মল-মণ্ডিত একটি বৃহৎ সিংহাসন আছে। দ্বিতলের বৃহৎ ভোজন-কক্ষটির মাপ ১৮৯ ফিট × ২৭ ফিট। এই প্রাসাদের ত্রিতলে নাচঘর (ball room), পাঠাগার, চিনামাটীর আসবাব-পত্র ও দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর এবং

শয়নাগারসমূহ আছে। নাচঘরটি পূর্ব্বোক্ত ভোজন কক্ষের ন্যায় বৃহৎ। উহার মাপ ১৮৯ ফিট × ২৭ ফিট।

এই প্রাসাদের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য ও প্রাচীন অস্ত্র, দলিল-পত্র, কোরাণাদি পুস্তক, মূল্যবান আসবাব-পত্র ও চিত্রাদি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রাখা হইয়াছে। ঐগুলি আর কখন এখানে ফিরিয়া আসিবে কি না কে জানে। এখানে মুর্শিদাবাদের নবাবদের নানাপ্রকার চিত্র (water-colour and oil-painting) আছে। একটি চিত্রে দেখিলাম যে, একজন নবাব (বোধ হয় হুমায়ুন ঝা) ও তাঁহার একজন পেট-মোটা বয়স্য ইংরাজী ভাঁড়ের পোষাকে সজ্জিত

মুর্শিদাবাদ—নিজামৎ কিল্লা।—হাজার-দুয়ারী বা প্যালেসের উত্তর পশ্চিমের মসজিদ

হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। শুনিলাম যে, এই ঔদরিক বয়স্যটি প্রতিবারে ২৬ সের আহার্য্য উদরস্থ করিতে পারিতেন। এই সময়েই বোধ হয় নবাবগণ "নবাবের আলসে" পুষিতেন। এই হাজার-দুয়ারি প্রাসাদটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে নবাব সাহেবকে অনেকগুলি লোক নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে। ইহার "হাজার দুয়ারী" নাম অসার্থক নহে। কারণ, ইহার দরওয়াজা ও জানালাগুলি গণনা করিলে, উহাদিগের মোট সংখ্যা হাজার বা হাজারের কাছাকাছি হইবে। প্রাসাদটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ও হরিদ্রাভ। শুনিলাম যে, এই প্রাসাদটি এক্ষণে ইংরাজ সরকারের সম্পত্তি,—নবাব সাহেব ব্যবহার করিতে পান মাত্র।

হাজার-দুয়ারীর সম্মুখে অর্থাৎ উত্তর দিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে বারান্দা-বেষ্টিত একটি সুশ্রী একতালা চতুষ্কোণ গৃহ আছে। ইহার নাম মেদীনা। এই স্থানে নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে বৃহৎ ইমামবাড়া ছিল, এই মেদীনাটি উহারই অন্তর্গত ছিল। অধুনা-লুপ্ত উক্ত ইমামবাড়া নির্ম্মাণ কালে কেবলমাত্র মুসলমান কারিকর নিযুক্ত করা হইয়াছিল—ইহা স্বজাতি-প্রীতির একটি নিদর্শন। নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভের প্রথম দিন সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং ইষ্টক ও চূণ সুরকী বহন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে ইহার বনিয়াদ পত্তন করিয়াছিলেন। উক্ত ইমামবাড়ার মধ্যস্থলে এই মেদীনাটি ছিল। যে ভূমিখণ্ডের উপরে ইহা অবস্থিত, উহার মাটী ৬ ফিট গভীর করিয়া খুঁড়িয়া ফেলিয়া সেই খাত মক্কা হইতে আনীত মাটীর দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল। উক্ত ইমামবাড়ার পূর্ব্ব দিকের পশ্চিম-দ্বারী ঘরে মজলিস হইত এবং পশ্চিম দিকের পূর্ব্ব-দ্বারী প্রকোষ্ঠগুলিতে ইমামদিগের কবরের স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁচ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত জবাব বা নকল ছিল। এই অংশে মহরমের সময় অহোরাত্র কোরাণ পাঠ হইত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে উক্ত ইমামবাড়ায় অগ্নি লাগিয়া উহার কতকাংশ পুড়িয়া যায়। পুনরায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর তারিখে রাত্রি দুই প্রহরের সময় নবাবের প্রাসাদে সাহেবদিগের ভোজ উপলক্ষে যখন বাজী পোড়ান হইতেছিল, সেই সময় উক্ত ইমামবাড়ায় অগ্নি লাগিয়া এই মেদীনাটি ব্যতীত উহার সকল অংশ পুড়িয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেই মেদীনাটি আজিও সুসংস্কৃত অবস্থায় আছে।

মেদীনার কিয়ৎদূর পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ তোপ আছে। উহার নাম "বাচ্চাওয়ালী তোপ"; অর্থাৎ ইহার শব্দ এরূপ ভীষণ যে, সেই শব্দে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইয়া থাকে। ইহা ১৫ ফিট দীর্ঘ। সহরের উপকণ্ঠ হইতে ইহাকে এই স্থানে আনিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

এই তোপের পূর্ব্ব দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত উচ্চ চিমনির ন্যায় দেখিতে একটি ঘড়ী-ঘর (clock-tower) আছে। উহাতে একটি ঘড়ী শোভা পাইতেছে। মেদীনা, বাচ্চাওয়ালী তোপ ও ঘড়ী-ঘর একই সারিতে অবস্থিত।

ইহাদিগের উত্তর দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ নূতন ইমামবাড়ার বৃহৎ বাটী বর্ত্তমান আছে। সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ইমামবাড়া পুড়িয়া যাইবার পরে এই নূতন ইমামবাড়াটী ১৭৪৭।৪৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান সৈয়দ সাদিক আলি খাঁর তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে স্থানে সিরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ইমামবাড়া ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে বর্ত্তমান

ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। নির্ম্মাণ শেষ হইলে রাজমিস্ত্রী ও মজুরদিগকে ছোট বড় নির্ব্বিশেষে শাল পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইমামবাড়া। ইহা চতুষ্কোণ। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৮০ ফিট। ইহা তিনটি মহলে বিভক্ত। মধ্যের মহলে ইহার মেদীনা অবস্থিত। এই বৃহৎ ইমামবাড়ায় অনেকগুলি বেলোয়ারি কাঁচের ঝাড় আছে। বাটীটি দ্বিতল, কিন্তু দ্বিতলে উঠিয়া দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্থানে আসিলে মুসলমানদিগের নানাবিধ বাধা-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। হিন্দুর অনেক জিনিস যেমন তথাকথিত হীন জাতির সংস্পর্শে কলুষিত হয়, সেইরূপ জাতিভেদহীন মুসলমানদিগেরও কোন কোন জিনিসে হিন্দুর সংস্পর্শ নিষিদ্ধ। অতএব সংস্পর্শ দোষটি শুধু হিন্দুর মধ্যেই আবদ্ধ নাই। ইমামবাড়ার উত্তর দিকে নহবৎ-শোভিত প্রধান প্রবেশ-দ্বার আছে। ইমামবাড়াটি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলির সময় নির্ম্মিত। ইনি নবাব হুমায়ুন ঝার পুত্র। ইমামবাড়ার পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর পাড়ের উপরে একটী হিন্দু মন্দির ছিল। ওয়ালস্ সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, উহার স্থানে একটী দ্বিতল মসজিদ নির্ম্মিত হয়; এবং উক্ত মন্দিরের পরিবর্ত্তে ইছাগঞ্জে আর একটী হিন্দু মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। ইমামবাড়ার পশ্চিম দিকে নিজামৎ কিল্লার একটী দ্বার আছে। তথায় দ্বারের পার্শ্বে প্রহরীদিগের থাকিবার ঘর আছে।

হাজার-দুয়ারীর পূর্ব্ব দিকে নিজামৎ কিল্লার আর একটী দ্বিতল নহবৎ-শোভিত দরওয়াজা আছে। উহার নাম চৌক দরওয়াজা বা ত্রিপলিয়া নহবৎখানা। ইহাই নিজামৎ কিল্লার পূর্ব্ব দিকের প্রবেশ-দ্বার। ইহা নবাব সরফরাজ খাঁর পিতা নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক ১৭২৫ হইতে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত। এই দরওয়াজাটি চকে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে চৌক দরওয়াজা কহে। এরূপ বৃহৎ দরওয়াজা বঙ্গদেশে অতি বিরল।

এই দরওয়াজার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটী সুশ্রী মসজিদ আছে। উহার নাম চৌক মসজিদ। চকের বাজারের মধ্যে অবস্থিত থাকায় ইহার উক্ত রূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহা হাজার-দুয়ারীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। যেস্থানে এই মসজিদ আছে, ঐ স্থানে পূর্ব্বে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর চেহেল সেতুন বা চল্লিশটি স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ বা বারদুয়ারী বা দরবার-গৃহ ছিল। নবাব মির্জাফরের সহধর্ম্মিণী মণিবেগম ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্ম্মাণ করেন। সদর রাস্তার পশ্চিম দিকে মসজিদটি অবস্থিত। ইহার দ্বিতল দরওয়াজার দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচ্চ মিনার আছে। দরওয়াজার আলিসার উপরে এক সারি পিতলের চূড়া সূর্য্য-কিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পূর্ব্ব দিকের দরওয়াজার মধ্যস্থ সিঁড়ি দিয়া মসজিদ-বাটীর পাথর-বাঁধান উচ্চ উঠানে উঠিতে হয়। সম্মুখে উঠানের মধ্যে একটী পাথর দ্বারা বাঁধান চৌবাচ্চা আছে। উঠানটি পাথর দিয়া মোড়া। উঠানের পশ্চিম দিকে সপ্ত-গুম্বজ-শোভিত মসজিদ আছে। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি উচ্চ মিনার আছে। মিনার দুইটির ও মসজিদের গুম্বজগুলির উপরে চাকচিক্যময় পিতলের চূড়া শোভা পাইতেছে। মধ্যস্থলের গুম্বজটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহার দুই পার্শ্বের গুম্বজগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত উঠানের দুই পার্শ্বে দুইটি একতলা ঘর আছে। উহাদের প্রত্যেকের সম্মুখ ভাগে তিনটি করিয়া ফোকর বা দ্বারের

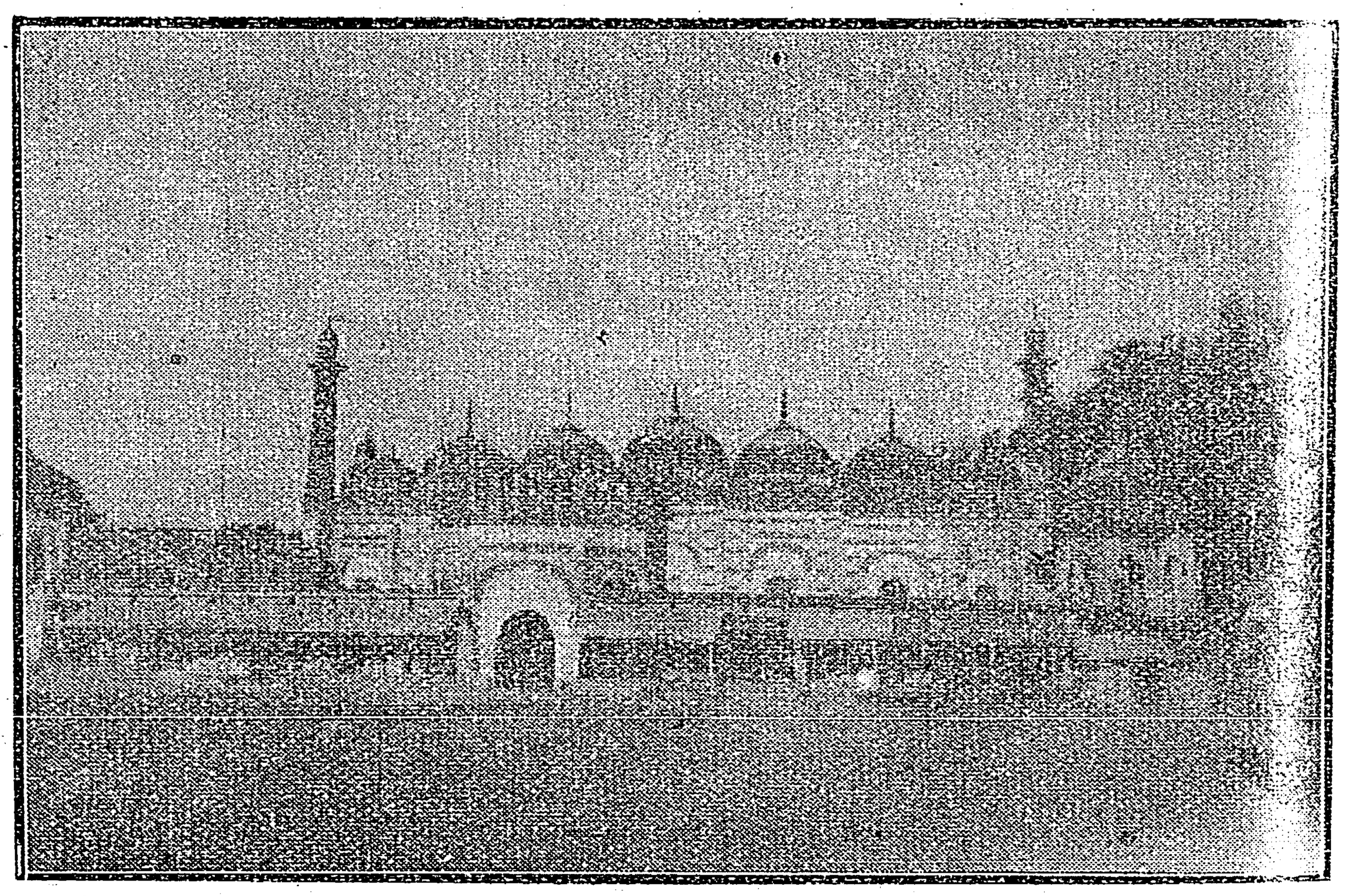

মুর্শিদাবাদ—চৌক মসজিদ

খিলান আছে। মসজিদটি নিত্য ব্যবহৃত হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এই গুলিই নিজামৎ কিল্লার প্রধান দর্শন-যোগ্য সামগ্রী। নবাব মির্জাফর শেষকালে মনসুরগঞ্জ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া এই নিজামৎ কিল্লাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নিজামৎ কিল্লার বহির্দ্দেশে, বর্ত্তমান ইমামবাড়ার উত্তর দিকে চূড়াবিহীন একটি মাত্র গুম্বজ-শোভিত মাদ্রাসার দ্বিতল অট্টালিকা আছে। এতদ্ব্যতীত উত্তর দিকে আরও কতকগুলি দ্বিতল অট্টালিকা ও মসজিদাদি আছে।

মুর্শিদাবাদ রেল ষ্টেসনের কর্ম্মচারীদিগের আবাস বাটীর (Railway Quarters) সন্নিকটে উত্তর দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত চূণকাম-করা একটি ছাদবিহীন ছোট কবর আছে। ইহা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র বিলাসী নবাব সরফরাজ খাঁর কবর। কবরের প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে—"Nawab Sarfaraz Khan Bahadur, grandson

of Nawab Moorshid Coli Khan. Died in 1740 A. D." এই কবরটি পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের একমাত্র সরফরাজ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। হাজি আহম্মদ, রায় রাইয়াঁ আলমচাঁদ প্রভৃতি সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিলে, সরফরাজ রণক্ষেত্রে অগ্রসর হন। কথিত আছে যে, ইতিপূর্ব্বে সরফরাজ জগৎশেঠের সুন্দরী পুত্রবধূর রূপের কথা শুনিয়া তাহাকে অন্ততঃ একবার দেখিবার জন্য জিদ ধরিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি এই ঘৃণিত প্রস্তাব জগৎশেঠের সম্মুখে উপস্থিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি জগৎশেঠের পুত্রবধূকে স্বীয় প্রাসাদে আনাইয়া তাহার রূপ-সুধা পান করিয়া তাহাকে স্পর্শ না করিয়াই ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। ইহার ফলে উক্ত পুত্রবধূ পরিত্যক্ত হ এবং জগৎশেঠ সরফরাজের পরম শত্রু হন।

যাহা হউক গিরিয়ার রণক্ষেত্রে রাত্রিকালে অতর্কিত অবস্থায়

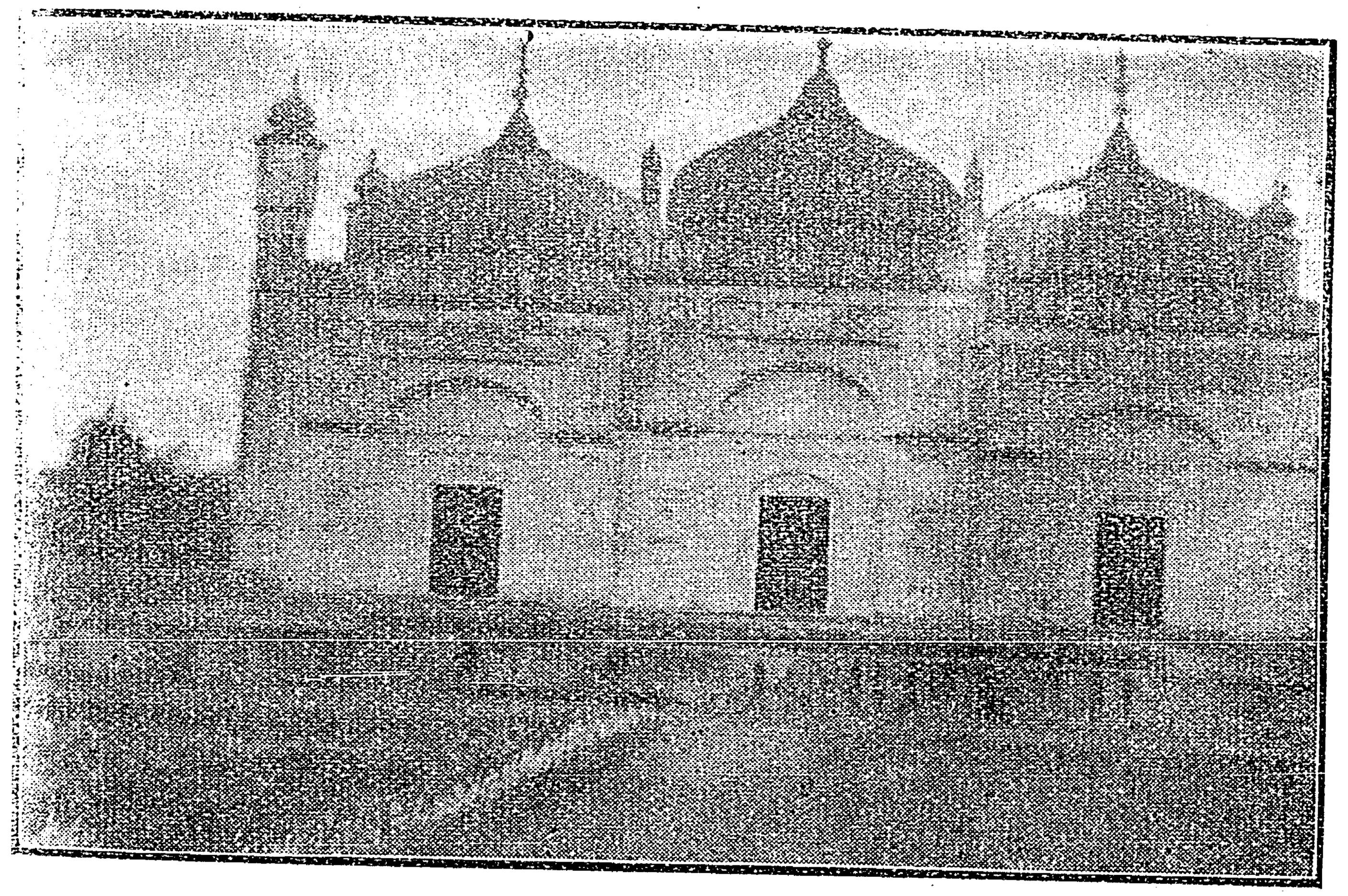

মুর্শিদাবাদ—খুসবাগ।—আলিবর্দ্দী ও সিরাজের গোরস্থানের মসজিদ। সম্মুখ ভাগ

আক্রান্ত হইয়াও সরফরাজ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার বিশ্বাসী পার্শ্বচর বিজয় সিংহ তাঁহার জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে, বিজয় সিংহের নবম বর্ষ বয়স্ক পুত্র জালিম সিংহ পিতৃদেহ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। জালিমকে যখন আলীবর্দ্দীর সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় আলীবর্দ্দী তথায় উপস্থিত হইয়া বীর বালকের প্রাণ রক্ষা করেন। দেশের অতীব দুর্ভাগ্য বলিয়া জালিমের ন্যায় বীর বালক এ যুগে হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল হইয়া আসিয়াছে। গ্রামে গ্রামে ব্যায়াম চর্চ্চার আখড়ার পরিবর্ত্তে এক্ষণে সখের থিয়েটারের দল বসিয়া গিয়াছে।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল! যাহা বলিতে ছিলাম—সরফরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলে তাঁহার বিশ্বাসী মাহুত সকলের অলক্ষ্যে তাঁহার মৃতদেহ হস্তী-পৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া গভীর রাত্রে মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রাত্রেই গোপনে সরফরাজের শব এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।

সরফরাজের নগণ্য কবরের কিয়ৎদূর উত্তর দিকে রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে আমবাগানের মধ্যে একটি অযত্নে রক্ষিত প্রাচীন মসজিদ আছে। উহা উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। মসজিদের উপরে ৩টি গুম্বজ আছে। গুম্বজগুলির উপরিভাগে সবুজবর্ণের এনামেল করা মৃন্ময় চ্যাপ্টা কলসের ন্যায় চূড়া আছে। এই এনামেল-করা চূড়াগুলি কাটরা মসজিদের চূড়ার ন্যায়। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করিয়া দ্বার আছে এবং ইহার সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে প্রস্তরের চৌকাঠ আঁটা তিনটি বৃহৎ দ্বার আছে। প্রস্তরের চৌকাঠ কয়টি গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে সংগৃহীত বলিয়া মনে হয়। এই দ্বার কয়টির বহির্ভাগে উপরে খিলান-করা গোল আচ্ছাদনের ন্যায় আছে। মসজিদের অভ্যন্তরে পশ্চিমের দেওয়ালের মধ্যে তিনটি মিম্বর বা কুলুঙ্গী আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। মসজিদের ভিতরের মাপ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫৭´ ফিট এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৬´ ফিট। ইহার দেওয়াল প্রায় ৩৬০ ফিট স্থূল। মসজিদের পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের বহির্ভাগে তিনটি কাল পাথরের স্মৃতি-ফলক আছে। মসজিদটির নাম বেগম মসজিদ। কেহ বলেন যে ইহা নবাব সরফরাজ খাঁর মাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। অপর কাহারও মতে ইহা তাঁহার বেগম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। যে স্থানে সরফরাজের কবর এবং এই মসজিদটি আছে, উহা একটি আমবাগান। এই স্থানকে নাখতা খালি বা ল্যাংটা খালি বা নাগিনীবাগ কহে। এই স্থানে সরফরাজের যে প্রাসাদ ছিল, তাহার কোন চিহ্ন নাই।

রেল ষ্টেসন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে, ও নিজামৎ কিল্লার কিয়ৎদূর উত্তর দিকে প্রাচীর ও রেলিং দ্বারা ঘেরা একটি অতি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে নবাব সাহেবের সুবৃহৎ আস্তাবল আছে। এই ভূমিখণ্ডে কয়েকটি বড় বাড়ী আছে। এই স্থানে হস্তী, উষ্ট্র, ঘোটক ও গাড়ী থাকে। এরূপ বৃহৎ আস্তাবল পূর্ব্বে অন্য কুত্রাপি দেখি নাই। নবাবী কাণ্ডই আলাহিদা রকমের।

এই আস্তাবলের পশ্চিম দিকের সদর রাস্তা দিয়া সহরের লালবাগ নামক অঞ্চল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। আমরা ভাগীরথীর পরপারে অবস্থিত খুসবাগে নবাব আলীবর্দ্দী ও সিরাজদ্দৌলার কবর দেখিতে যাইতেছি। পথে ভাগীরথার পূর্ব্ব পাড়ে অশ্বত্থ-ছায়া-শীতল একটি

খেয়াঘাট আছে। উহার সন্নিকটে একটি মিষ্টান্নের দোকান আছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মধ্যাহ্ন কালে আমরা এই খেয়াঘাটে পার হইয়া নদী-সৈকতের শ্মশান দিয়া পদব্রজে খুসবাগে গিয়াছিলাম। এবার তাহা না করিয়া আমরা গাড়ী করিয়া খুসবাগের সম্মুখস্থ পারঘাটায় যাইতেছি। ক্রমে ভাগীরথী-তীরের পথ ছাড়িয়া একটী পল্লীর ভিতর দিয়া চলিলাম। পল্লী অতিক্রম করিয়া পুনরায় ভাগীরথী-তীরের নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম যে, পথের পশ্চিম পার্শ্বে ভাগীরথী তীরে একটী বড় মসজিদ আছে। মসজিদটি তিন-গুম্বজ-বিশিষ্ট, ও উহার পূর্ব্বদিকে তিনটি দ্বার আছে।

এই মসজিদ ছাড়াইয়া আমরা যে স্থান দিয়া চলিলাম, উহা নির্জ্জন, জনমানবহীন। এইখানে ভাগীরথীর একটী পারঘাটা আছে। উহার নাম আমানিগঞ্জের ঘাট। লোকে গ্রীষ্মকালে এই ঘাটে যান বাহনাদি সহ হাঁটিয়া ভাগীরথী পার হইয়া থাকে। এই ঘাটে জলের গভীরতা ৩ ফিটের অধিক নহে। এই ঘাট হইতে সামান্য দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এক-গুম্বজ-বিশিষ্ট বৃহৎ কারবালা রহিয়াছে।

আমানিগঞ্জের ঘাটে জুতা খুলিয়া পদব্রজে ভাগীরথী পার হইয়া পরপারে খুসবাগের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়ের উপরে একটি অতি বৃহৎ ও প্রাচীন শিমুল গাছ আছে। উহার গাত্রের কাঁটাগুলি উঠিয়া গিয়া মসৃণ হইয়া গিয়াছে। উহার এই অবস্থা হওয়ায় সহসা দেখিলে উহা শিমুল গাছ কি না সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বৃক্ষটি অতি স্থূল,—শাখা-প্রশাখা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া যুগ যুগান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহা এক্ষণে কয়েকটি অতি বৃদ্ধ শকুনীর আশ্রয় স্থল হইয়াছে। উহাদিগের বিষ্ঠায় নীচের আগাছাগুলির পাতা শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। শকুনী কয়টি অনিমেষ নয়নে বহুদূরে শূন্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছে। শিমুল গাছের পাদদেশ দিয়া একটী কাঁচা রাস্তা পশ্চিম দিকে খুসবাগের মকবরা বা কবর-স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই কবর-স্থানের পাদদেশ ধৌত করিয়া, ইহার পূর্ব্ব দিক দিয়া এক কালে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। উহার ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মকবরার সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এবার তাহার চিহ্ন দেখিলাম না। পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া এই মকবরায় প্রবেশ করিতে হয়। স্থানটি প্রাচীর-বেষ্টিত। দরওয়াজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, দরওয়াজার দুই পার্শ্বে প্রকোষ্ঠের ন্যায় আছে এবং পশ্চিম দিকে বিস্তৃত উঠান আছে। এই উঠানের উত্তর দিকে ১৭টি কবর আছে। উঠানের মধ্যস্থলে একটী উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান আছে। উহার মধ্যে তিনটি কবর আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব দিকের দ্বারের নিকটের কবরটি নবাব আলীবর্দ্দীর মাতার। তাঁহার সমাধির জন্যই নবাব আলীবর্দ্দী এই খুসবাগ বা খোসবাগ প্রস্তুত করেন। প্রথমোক্ত উঠানের পশ্চিম দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত আর একটী ভূমিখণ্ড আছে। পূর্ব্ব দিকের দ্বার দিয়া বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে উঠানের মধ্যস্থলে একটি একতলা কোঠা ঘর আছে। উহার প্রত্যেক দিকের মাপ প্রায় ২২ হাত। এই কোঠার চতুর্দ্দিকে ছাদযুক্ত বারান্দা আছে, এই কোঠার গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর, তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে নবাব সিরাজদ্দৌলার, তৎপূর্ব্ব পার্শ্বে তস্য ভ্রাতা মির্জামেহেদীর, সিরাজের পদতলে তাঁহার বেগম লুৎফুন্নিসার ও আলীবর্দ্দীর দক্ষিণে তাঁহার মহিষীর ও আর ২।৩টি কবর আছে। সিরাজকে হত্যা করার পরে তাঁহার মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে উঠাইয়া মুর্শিদাবাদের পথে পথে লইয়া বেড়ান হইয়াছিল এবং জনসাধারণকে ও সিরাজের শোকাভিভূত মাতা আমিনা বেগমকে দেখান হইয়াছিল। অসূর্য্যম্পশ্যা আমিনা পাগলিনীর ন্যায় রাজপথে বাহির হইয়া প্রাণাধিক পুত্রের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বিলাপ করিয়া সকলকে অশ্রুসিক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে উক্ত মৃতদেহ এই স্থানে আনিয়া সমাহিত করা হয়। সিরাজের বেগম লুৎফুন্নিসা—যিনি তাঁহার সহিত রাজমহলে পলাইয়াছিলেন—তাঁহারই উপর এই সমাধি স্থানের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। ফরেষ্টার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে মোল্লা নিযুক্ত হইয়াছিল এবং সিরাজের বেগম মধ্যে মধ্যে এই স্থানে আসিয়া শোকপ্রকাশ করিয়া যাইতেন। আলীবর্দ্দীর কবরের উপরিভাগে কাল পাথরের পাড় দেওয়া আছে। সিরাজ ও তাঁহার বেগমের কবর অতি সাধারণ এবং সিমেণ্ট দ্বারা মাজা; কিন্তু কোন স্মৃতিফলক নাই। এই গৃহের পশ্চিম দিকের উঠানের পশ্চিমে একটি সুশ্রী তিন-গুম্বজ-শোভিত মসজিদ আছে। মসজিদের পূর্ব্ব দিকের খোলা রোয়াকে একটি চৌবাচ্চা আছে। খুসবাগের এই মকবরাটি এক্ষণে পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত। মকবরাটি অতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে চাষীদিগের পল্লী আছে। উহারা ভাগীরথী-তীরে প্রচুর পটল ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করিয়া থাকে। পল্লী বধূগণ এই মকবরার পার্শ্বস্থ পথ দিয়া ভাগীরথী হইতে জল আনিতে যায়।

খুসবাগের মকবরা দেখিয়া যখন আমরা ফিরিতেছি, তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, ৬৷৷০ বাজিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। নির্জ্জন গোর স্থানের বৃক্ষগুলি হইতে সহসা পেচকের কর্কশ গুরুগম্ভীর নিনাদ চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আতঙ্কের সঞ্চার করিল, যেন উচ্চকণ্ঠে সতর্ক করিয়া কহিল "পথিক! চলিয়া যাও। নিশীথিনী আগতপ্রায়,—এ প্রেতের লীলাভূমিতে তোমাদিগের থাকিবার অধিকার নাই।" পেচকের ধ্বনি থামিতে না থামিতে শৃগালের করুণ ক্রন্দন চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া উঠিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা দ্রুত এই স্থান ত্যাগ করতঃ ভাগীরথী পার হইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইয়া গেল। সে রাত্রে কিঞ্চিৎ দুগ্ধসহ জলযোগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন অর্থাৎ ৩রা এপ্রেল প্রাতে ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত বড়নগর দেখিয়া নৌকা যোগে মুর্শিদাবাদে ফিরিবার সময় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে মনহরগঞ্জ, হিরাঝিল এবং ফার্‌রাবাগ দেখিয়া সন্ধ্যাকালে আবাসে ফিরিয়াছিলাম। ইহার পরের দিন ৪ঠা এপ্রেল প্রাতে ৺কিরীটেশ্বরী দেখিয়া ফিরিবার সময় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ডাহাপাড়া ও নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদখাঁর সমাধি স্থান দেখিয়াছিলাম। কিন্তু পাঠকদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য বারান্তরে অগ্রে মুর্শিদাবাদ সহরের অতি নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বর্ণনা শেষ করিয়া পরে বড়নগর ও কিরীটেশ্বরীর বর্ণনা করিব।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

"নারায়ণঃ! ও কলি, একটু তামাক দে ত মা"—বলিয়া শ্রান্ত-কলেবর মাধব চক্রবর্ত্তী দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন, এবং সঙ্গের ছোট-বড় সাদা-তালি-দেওয়া ছাতাটা দেওয়ালের গায়ে রাখিয়া কোমরে জড়ান একখানা আধময়লা গরদের চাদর খুলিতে খুলিতে একটু চাপা স্বরে বলিলেন, "যাক্, এখন নারায়ণের ইচ্ছেয় কাজটা শুভং শুভং মিটে যায় ত বাঁচি!"

নিকটেই দিগম্বরী ঠাকুরাণী বসিয়া পূজা করিতেছিলেন, কথা কয়টা তাঁহার কাণে গেল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া করযোড়ে ঠাকুরকে নমস্কার করিবার সময় একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িলেন। প্রণামান্তে দাদার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে তুমি তাদের সঙ্গে একেবারে পাকাপাকি করে এলে দাদা?"

মাধব চক্রবর্ত্তী কোঁচার কাপড় দিয়া মুখ মুছিয়া কহিলেন, "হাঁঃ—আবার দেরী করে? কি জানি—কোন্ ব্যাটা কখন ভাংচি দিক, আর এমন সম্বন্ধটা হাতছাড়া হয়ে যাক্! একেবারে ১৫ই দিন ঠিক করে এলুম।"

দিগম্বরী কোন কথা কহিলেন না। মাধব মুখ ফিরাইয়া কল্যাণীর উদ্দেশে একটু চেঁচাইয়া কহিলেন, "কই মা, একটু তামাক দিলি না?"

কল্যাণী বাম হাতে একটী থেলো হুঁকার মাথায় একটি কলিকা চড়াইয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফুঁ দিতেছিল। মামার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটে আসিয়া কহিল, "এই নাও, এখনও ভাল ধরেনি', টীকেগুলো ভিজে গেছে।"

মাধব কল্যাণীর হাত হইতে হুঁকা লইয়া একনিশ্বাসে ক্রমাগত ১৫।২০টা টানের পর ধূম বাহির করিল। কল্যাণী সেখানে আর অপেক্ষা না করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল,—কিন্তু নিজেকে অধিক দূরে সরাইয়া লইতে পারিল না। একটা আশঙ্কা, উদ্বেগ, দুঃখ, ব্যগ্রতা, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যেমন বেষ্টন করিয়া তাহার আপনার জনকে চারিপার্শ্বে ধরিয়া রাখে, এই বিবাহের প্রসঙ্গও কল্যাণীর পায়ে তেমনই বেড়ী পরাইল। সে ঘরের ভিতর যাইয়া কপাটের আড়ালে হাত রাখিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাধব কিছুক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তামাকু টানিয়া দেহটাকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইল। তার পর হুঁকো-কল্কে সরাইয়া রাখিবার অবকাশে একবার ভগ্নীর দিকে চাহিয়া দেখিল, দিগম্বরী হাঁটুদ্বয়ের উপর চিবুক রাখিয়া নতমুখে বসিয়া আছেন ও তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে! মাধব একটু করুণ অথচ উচ্চকণ্ঠে কহিল, "কেন ভাব্‌ছিস্ দিগে! ২৫ বিঘের উপর ভদ্রাসন, চক-মেলান বাড়ী, পুকুর, বাগান, অতিথিশালা, দরওয়ান, পাইক, লোক-লস্করই বা কত! আর কি অমায়িক ব্যবহার তা' আর একমুখে বলে উঠ্‌তে পারি না। জমীদার লোক, কত পয়সা—কিন্তু একটু গুমোর নেই,—একেবারে মাটীর মানুষ। বিয়ে ত এখনও হয় নি; কিন্তু এরি মধ্যে বাবাজী আমায় যে খাতির-যত্ন আর কিবা আপ্যায়িতটা করলেন, তা আর কি বল্‌ব! বল্লেন, 'কুলীনের মান কুলীন যদি না রাখে, তবে আর রাখবে কে?'—মাধব কোমরের কাপড়টা ঢিলা করিয়া দিতেই, মেঝের উপর কতকগুলা টাকা পড়িয়া গেল।

কল্যাণীর অধরে একটা ঘৃণার হাসি ফুটিয়া উঠিয়া, নির্ব্বাপিত-প্রায় দীপের শেষ ঔজ্জ্বল্যটুকুর মতই আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল!

দিগম্বরী ঠাকুরাণী পূজাকরা ফুলগুলি ধীরে ধীরে তুলিয়া পুষ্পপাত্রের উপর রাখিয়া কহিলেন, "সবই ত ভাল দাদা, কিন্তু বয়েসটা"—

মাধব চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "আরে কুলীনের আবার বয়েস ? ৮০ নয়, ৯০ নয়—মাত্তর ৫০ ! এমনই বা কি বেশী বাপু ? তখন যে গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে মালা বদল করে কুলীনের মেয়ের জাত রক্ষা হত—তা জানিস্ না !"

দিগম্বরী ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন, "সেটা কি খুব ভাল কাজ করত দাদা ? মেয়েটার সারা জীবন"—

মাধব বাধা দিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "দেখ্ দিগে, এত কষ্ট করে একটা ভাল সম্বন্ধ ঠিক করেছি। এটা যদি ভেঙ্গে দিস্, তা হলে তোর মেয়ের বিয়ের কথাতে আমি আর নেই—তা কিন্তু আমি বলে রাখছি"—

"এ যে দাদা তোমার অন্যায়"—

বাধা দিয়া মাধব দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই আমার অন্যায়। তোদের জন্যে প্রাণপাত করাটাই আমার অন্যায় !—বেশ, তোর মেয়ের বিয়ের কথাতে আমি আর যদি থাকি তবে আমি যাদব চকোত্তীর ছেলেই না—এই যা বল্লাম !" মাধব কাপড়ের খুঁট আঁটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এই যে খুড়ো, সকালেই ফিরেছ দেখ্‌ছি। এত চেঁচামেচি কিসের" বলিয়া ধীরু উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই দেখ্ না ধীরু, কত কষ্ট করে শিরোমণির হাতে পায়ে ধরে—বুঝলি কি না ধীরু বাবা,—সেই সম্বন্ধটা পাকা করলাম, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেল, এখন বোন আমার গায়ের মাস টেনে ছিঁড়ছেন !—কালের ধর্ম্ম আর যাবে কোথায় রে !"

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি আর বলেছি দাদা, যে, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করছ ? পেটের মেয়ে, দশটা-পাঁচটা নয়—একটা মেয়ে ! তাই বলছিলাম, পাত্রের বয়েসটা"—

মুখ বিকৃত করিয়া মাধব কহিল, "পাত্রের বয়েসটা, পাত্রের বয়সটা, একশ'বার ঐ কথা ধরে বসেছে। ব্যাটা-ছেলের আবার বয়েস কিরে ?—তাতে আবার কুলীন ! তোর মেয়ের বাবার ভাগ্যি যে জগদীশ-মুখুজ্যে জমীদারের হাতে পড়্‌ছে—এই জানিস !" রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মাধব চক্রবর্ত্তী বহির্বাটীতে চলিয়া গেল।

দিগম্বরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। কল্যাণী এতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথাই শুনিতেছিল। ধীরু আসিতেই, সে বারান্দায় আসিয়া কোষাকুষি টাট্ প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম গুছাইবার অবকাশে নিম্নস্বরে বলিল, "চুপ কর মা !"

ধীরু আসিয়া দাওয়ার উপর বসিল। সকলেই নীরব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল, "তাহলে ওখানে কলির বিয়ে দিচ্ছ না পিসিমা ?"

কল্যাণী পূজার সাজ লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দিগম্বরী হতাশভাবে বলিলেন, "আর না দিয়েই বা কি করি বাবা ? যখন একটা কাণাকড়িও আমার সম্বল নেই, ভায়ের গলগ্রহ হয়ে আজীবন পড়ে আছি, তখন আর এত বাছ্‌তে গেলে চল্‌বে কেন ? মেয়ের বরাতে যা আছে তাই হ'বে—কি করব ?"

কথাগুলি ধীরুর প্রাণে বাজিল। কি জানি কেন—একটা দুঃখের বেদনা তাহার অন্তরকে পীড়ন করিল। কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া ধীরু কহিল, "পিসি, নিশ্চয় এ ভবিতব্য। আর আগে থেকে এমন খারাপটাই বা ভেবে নিচ্ছ কেন ?" সহসা আঘাতপ্রাপ্ত একটা বিড়াল কাতর সুরে "মিউ মিউ" শব্দে ঘর হইতে বাহিরে লাফাইয়া পড়িতেই, ধীরুর দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। ধীরু দেখিল, চৌকাঠের পাশে কপাটের এক পাল্লার আড়ালে হেলান দিয়া কল্যাণী বসিয়া আছে,—আর একটা রুদ্ধ অভিমান এবং প্রচ্ছন্ন বেদনা-মাখান অপলক দৃষ্টি স্থিরভাবে তাহার মুখের উপর ন্যস্ত ! ধীরু চোখ ফিরাইয়া লইল।

দিগম্বরী কহিলেন, "এই মাসের ১৫ই দিন ঠিক হয়েছে। তাহলে এই কটা দিন ধীরু একটু কষ্ট করে খেটে খুটে সব জোগাড় করে ফেল বাবা !—দাদা একলা মানুষ—"

"কিন্তু আমি যে গাঁয়ে থাক্‌ছি না পিসি।"

দিগম্বরী বিস্মিত দৃষ্টিতে ধীরুর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"সে কি রে ? কোথায় যাবি ?"

ধীরু উদাস কণ্ঠে কহিল, "যেখানে অদৃষ্ট আমায় টেনে নিয়ে যায়।"

"ক্ষ্যাপা ছেলে ! আজ বাদে কাল কলির বিয়ে, তুই থাক্‌বি নে—কি করে কি হবে রে ?"

ধীরু গম্ভীর ভাবে কহিল, "তাই ভাব্‌ছি !"

দিগম্বরী হাসিয়া কহিলেন, "তোর যত বাজে ভাবনা ! ওসব খেয়াল ছাড়।"

ধীরু দিগম্বরীর দিকে চাহিয়া দৃঢ়ভাবে কহিল, "না পিসি, সত্যি ! মেজদা আজ বলেছে—ও-বাড়ীতে আমার আর জায়গা হবে না।"

কল্যাণী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিল।

দিগম্বরী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "জায়গা হবে না কেন ?"

"বাড়ী তাঁর—আবার কেন কি ?—তাঁর বাড়ীতে তিনি থাকতে দেবেন না !"

দিগম্বরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাড়ী তাঁর একারই বা হ'ল কি করে, তা' ত জানি না !—আর তাই বলে কি মার পেটের ভাই হয়ে ভাইকে পথে বসাবে ! তা এখন কি কর্‌বি মনে করেছিস্ ?"

ধীরু হাসির ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, "যা হয় একটা কিছু করে নেওয়া যাবে। ও তুমি কিছু ভেব না পিসি ! আমার ভাবনা আমি নিজেই কোন দিন ভাবিনি'—আর ভেবে কি মানুষ কিছু করতে পারে ?"

কল্যাণী রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কিছু না—তার চেয়ে না ভেবে পরম নিশ্চিন্ত মনে লোকের অবজ্ঞা কুড়িয়ে ঘূরে ঘূরে বেড়ান ঢের ভাল।"

ধীরু কোন জবাব দিল না। কল্যাণীর কথাগুলোর মধ্যে শ্লেষ থাকিলেও, যে প্রচ্ছন্ন ব্যথাটা তার সঙ্গে জড়িত ছিল সেইটেই ধীরুকে বেশী আঘাত করিল। দিগম্বরী দুঃখের সহিত কহিলেন, "সত্যি ধীরু, তুই যদি বাবা এমন না হয়ে একটু মনোযোগ করতিস তা'হলে আজ ভাবনা কি ছিল ? কলিকে কি তাহলে এমন ক'রে"—কল্যাণীর মুখ চোখ দিয়া আগুন ছুটিল,—সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ছুটিয়া যাইতেই, চৌকাঠে আঘাত লাগিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল। দিগম্বরী কল্যাণীর পানে চাহিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

ধীরুকে কে যেন সপাং করিয়া চাবুক মারিল ! বিশ্বের সমস্ত বেদনা, পীড়ন একসঙ্গে দল বাঁধিয়া আসিয়া তাহাকে এমন ভীষণ ভাবে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, যাহার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজেকে এমন অসহায়, বিপন্ন আর কখনো সে অনুভব করে নাই। ধীরু তাহার সমস্ত শক্তি কণ্ঠে পুঞ্জীভূত করিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, "বাজে কথা ছাড়, এখন আমায় চারটি ভাত দিতে পারবে ?– বাড়ীতে খাব না, সেই জন্যেই তোমাদের বাড়ীতে এলাম !"

"বেশ করেছিস—এ কি তোর পরের বাড়ী ? ও কলি, কলি"—

কল্যাণী ঘর হইতে উত্তর দিল, "কেন ?"

দিগম্বরী কহিলেন—"ধীরু এখানে খাবে। একটু তেল আর গামছাখানা এনে দে মা, নেয়ে আসুক।"

ধীরু কহিল, "না, আমি আর নাইব না, আজ সকাল বেলাতেই গঙ্গাস্নান করেছি।"

কল্যাণী বাহিরে আসিয়া মুখে চোখে একটু প্রফুল্লতা আনিয়া হাসিয়া কহিল, "সে কি ! আজ যে হঠাৎ বড় গঙ্গা নেয়ে পুণ্যি করে ফেল্লে ? ও বালাই ত তোমার ছিল না—চিরকাল ত ঘোষেদের পচা পুকুরই তোলপাড় করেছ !"

ধীরু হাসিয়া কহিল, "তা সত্যি। তবে কাল রাতে ডোমপাড়ার মতি কাওরা কলেরা হয়ে মারা যায় ! তোদের এখান থেকে ফেরবার সময় হরিবাগ্দির সঙ্গে দেখা। বল্‌ল—লোক জুটছে না। তাকে দাহ করতে গিয়েছিলাম।"

দিগম্বরী গালে হাত দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "সে কি রে ! একে কলেরা হয়ে মরেছে, তাতে আবার কাওরার মড়া ! তুই তা'কে অম্লান বদনে পুড়িয়ে এলি ? এমনি গোঁয়ারতুমি করেই কোন্ দিন প্রাণটা হারাবি !"

ধীরু ম্লান হাস্যে কহিল, "আমার প্রাণের কোন দাম নেই পিসি ! কাজেই সেটা গেলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই !"

কল্যাণী সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরে গেল।

মাধব চক্রবর্ত্তী পুনরায় আসিয়া কহিলেন, "তাহলে দিগে, আমি কাল ধীরুকে নিয়ে কল্‌কেতা যাই,—বিয়ের জিনিস-পত্তরগুলো সব কিনে আনি ?"

দিগম্বরী কহিলেন, "হ্যাঁ দাদা, আর দিন কই ? মাঝে ত মোটে ৫টা দিন আছে।"

মাধব দাওয়ার উপরে উঠিয়া কহিলেন, "বেশ কথা ! তা' হলে একটা ফর্দ্দ করে ফেলা যাক—"বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা মেটে দোয়াত ও শরের কলম আনিয়া ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

কল্যাণী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঠাঁই করিয়া ভাত বাড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "ভাত দিয়েছি।"

ধীরু ধীরে ধীরে গিয়া আসনে বসিল, এবং আহারের পূর্ব্বেই ঢক্‌ঢক্ করিয়া গেলাসের সবটুকু জল একেবারে নিঃশেষে খাইয়া ফেলিল। কল্যাণী বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া

কহিল, "একি, ভাত খাবার আগেই এক গ্লাস জল খেয়ে নিলে যে!"

ধীরু কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "যে তেষ্টাটাই পেয়েছিল!" ধীরু আহারে প্রবৃত্ত হইল।

কল্যাণী কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল, এবং একখানা ছোট পাখা আনিয়া ধীরুর সম্মুখে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

ধীরু লজ্জাবিজড়িত ব্যস্ততা সহকারে কহিল, "থাক্, থাক, আর পাখার দরকার নেই,—গরম ভাত খাওয়া আমার অভ্যাস আছে।"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল, "তা থাক, কিন্তু মাছি খাওয়া ত অভ্যাস নেই,—দেখছ না চারিদিকে কত মাছি ভন্ ভন্ করছে"—

ধীরুকে খাওয়ান আজ যেন কল্যাণীর কাছে একটা নূতন কিছু বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সে কত দিন তাহাদের বাড়ীতে স্বেচ্ছায় অনাহূত অবস্থায় খাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এতখানি যত্ন করিবার প্রয়াস সে কোন দিনও করে নাই। আর আজ……তার সুপ্ত বাসনা কোন্ এক অজানা ব্যর্থতার কঠিন স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে।

কল্যাণী কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "সত্যিই কি গাঁ ছেড়ে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ—যেতেই হচ্ছে!"……থালার ভাতগুলো নাড়াচাড়া করিতে করিতে ধীরু পুনরায় কহিল, "আজই যেতাম, কিন্তু বিয়েতে না থাকলে আবার"—

ধীরুর কথা শেষ করিতে না দিয়াই কল্যাণী কহিল, "ফিরবে কবে?"

অন্যমনস্ক ভাবে ধীরু কহিল, "জানি না।"

"তার মানে?"

ধীরু গম্ভীরভাবে কহিল, "বোধ হয় আর ফিরব না।" গলার ভাত বুকে বাধিয়া যাইতে সে তাড়াতাড়ি মুখ তুলিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমায় আর এক গ্লাস জল দাও ত!"

জলের পাত্র নিকটেই ছিল। কল্যাণী জল গড়াইতে গড়াইতে নতমুখে কহিল, "তা'হলে আমাদের মায়াও কাটালে?"

ধীরু জল খাইয়া গেলাসটা রাখিয়া দিল। গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াই উপস্থিত যেন তাহার সবচেয়ে বড় কাজ! একটা ত্যাগের শান্তি সহস্র দুঃখের ভিতর দিয়া তাহাকে সুখের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। সে আজ দৃঢ়, অবিচলিত। ধীরু আর খাইতে পারিল না, শুধু থালার ভাতগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কল্যাণী ধীরুর এতখানি উদাস ভাব জীবনে এই প্রথম লক্ষ্য করিল। কি যেন কিসের একটা তীব্র আঘাত তাহার ক্ষুদ্র অন্তরখানি বেদনায় ভরাইয়া দিল। সহস্র আবেগ-উৎকণ্ঠা একসঙ্গে আসিয়া তাহার বুক জুড়িয়া বসিল। সে কাঁদন-ভরা সুরে কহিল, "এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হলে ধীরুদা।"

ধীরু বিস্মিত হইয়া কল্যাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষু দুটী অশ্রুসজল। ধীরুকে শত বৃশ্চিক যেন একসঙ্গে দংশন করিল,—সে আসন ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িল।

উঠানের ওপার হইতে দিগম্বরী তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, "ও কি রে, উঠে পড়লি যে। বোস, বোস্, হরি গয়লার নতুন গাই বিইয়েছে,—তাই আজ একটু দুধ রয়ে গেছে,—পাটালী দিয়ে খা। যা' কলি, এনে দে।"

ধীরু কহিল, "ভয়ানক পেট ভরে গেছে পিসি!—আর জায়গা নেই"—বলিয়া পুকুর ঘাটে হাত মুখ ধুইতে গেল। কল্যাণী কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি এঁটো থালা, বাটী, গেলাস লইয়া ধীরুর পশ্চাতে চলিল। ধীরু একবার পশ্চাতে চাহিয়া ঘাটে না গিয়া একটু দূরে আ-ঘাটায় নামিয়া মুখ ধুইতে লাগিল।

কল্যাণী ঘাটে আসিয়া, জলে থালাখানা ডুবাইয়া, ব্যথিত দৃষ্টিতে ধীরুর দিকে চাহিয়া কহিল, "ঘাটে হাত-মুখ না ধুয়ে, কাঁটা ভেঙ্গে ওখানে যাবার মানে?"

"অত কৈফিয়ত আমি দিতে পারি না" বলিয়া ধীরু নতবদনে চলিয়া গেল।

মানুষের মন এমনি করিয়াই মানুষকে দেখিতে পায়। ধীরেন তাহাদের কে? কেনই বা তাহার বিচ্ছেদজনিত দুঃখের চিন্তা তাহাকে এমন করিয়া পীড়ন করিতেছে? কেনই বা তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এতখানি আগ্রহ, এসকল মানসিক প্রশ্নের জবাব কল্যাণী মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল একটা অব্যক্ত বেদনার কঠিন চাপ তাহার বুকে বসিয়া

রাজত্ব করিতে লাগিল! শাসনের তীক্ষ্ণ খোঁচায় সে তাহার কোমল প্রাণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিল। তপ্ত অশ্রু কিন্তু বাধা মানিল না,—দুই গণ্ড বাহিয়া পুকুরের শীতল জলে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িতে লাগিল—হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া এই নীরব ক্রন্দনের ভিতরেই কল্যাণী তাহার হাতের কাজ শেষ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে ফিরিল।

৪

সকালে দিগম্বরী ঠাকুরাণী কল্যাণীকে বলিলেন, "আজ একাদশী। আমি গঙ্গা নেয়ে শ্যামের মন্দিরে যাচ্ছি কলি, তুই ততক্ষণ চার্‌টে চালে-ডালে মিশিয়ে তোর মতন খিচুড়ী করে খা—দাদা যদি ওবেলা আসে"—

কল্যাণী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "ভাঁড়ারে চাল বাড়ন্ত।"

কল্যাণীর মাতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "তবে ধীরেনদের বাড়ী থেকে বরং দুটো চাল ধার করে আনিস্"—

কল্যাণী বিরক্ত ভাবে বলিল, "আমি পারব না মা। না খেয়ে থাকৃব সেও ভাল, তবু ওদের বাড়ীতে আমি চাল চাইতে যেতে পারব না।"

"আচ্ছা, আমিই না হয় যাব'খন। তুই বাসন ক'খানা চট করে মেজে নিয়ে আয়।" দিগম্বরী ঠাকুরাণী তাঁহার জপের মালা-ছড়া হাতে করিয়া চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী তখন রকের উপর বসিয়া ছিল। বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়া খানিকটা রৌদ্র আসিয়া তাহার চারিদিকে পড়িয়াছে। তেঁতুলগাছের অন্তরাল হইতে একটী পাখী ডাকিয়া উঠিল, "চোখ গেল।" কল্যাণী বাঁশ-ঝাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, রৌপ্যোজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ গাছের উঁচু মাথা ছাপাইয়া এখানে সেখানে এক এক টুকরা প্রভাতের বৃন্তচ্যুত শেফালির মত মাটির বুকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কল্যাণী একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জীবনের পাতাগুলির উপর চোখ বুলাইয়া চলিল। ছেলেবেলা থেকে মামা মাধব চক্রবর্ত্তীকে আশ্রয় করিয়া মাতা-পুত্রীতে আজ ষোড়শবর্ষ এইখানে পড়িয়া আছে। পিতাকে সে কখনও দেখে নাই,—কেবল মার মুখে শুনিয়াছিল, তিনি না কি মহাকুলীন ও পণ্ডিত ছিলেন; এবং তাঁহার মৃত্যুতে ৮।১০টি নারী এক দিনে এক সঙ্গে হাতের নোয়া খুলিয়া, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া, কৌলিন্যের জয়ঢাক ভাল করিয়া বাজাইয়াছিল। তাহার মাতাও না কি ইহাদের মধ্যে একজন। কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তরভোগী মামা মাধব চক্রবর্ত্তী দু'চার ঘর যজমানের অনুগ্রহে যাহা কিছু সামান্য উপায় করিতেন, মোটা ভাত মোটা কাপড় তাহাতেই চলিয়া যাইত। মাধব অপুত্রক ও বিপত্নীক ছিল। কাজেই তাহার সমস্ত স্নেহটা ভাগ্নী কল্যাণীর উপরেই স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। কল্যাণীর বিবাহের কথা উঠিতেই মাধব চক্রবর্ত্তী ভগ্নীকে জোর গলায় আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "এই গাঁয়েই পাত্র আমার ঠিক করা আছে। তোকে কিছু ভাবতে হবে না বোন।" কল্যাণীর অধরে একটা মৃদু হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিত। কত দিন সে আনমনে কল্পনার পটে বাসনার তুলি দিয়া আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন্ ছবি আঁকিতে বসিত। কেমন করিয়া সে তাহার গৃহস্থালী পাতিবে—নিজের সমস্ত সত্তাটি ওই আপন-ভোলা লোকটির সঙ্গে মিশাইয়া তাহার ভালমন্দ, শুভাশুভের সকল বোঝাই নিজের মাথায় তুলিয়া লইবে—ওই উদার, স্নেহশীল, সরল হৃদয়ের সমস্ত ম্লানিমা, সমস্ত গ্লানি সে তাহার ভালবাসা দিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিবে!

আজ কল্যাণীর অন্তরটা হাহাকারে ভরিয়া উঠিল। যে সোণার স্বপনে মগ্ন হইয়া সে এত দিন প্রতীক্ষা করিতেছিল, বাস্তবের কঠিন আঘাতে আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। ভবিষ্যতের এক সন্ধ্যালোকের মাঝে নিজেকে লাল চেলী পরাইয়া একজন ৫০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের পাশে দাঁড় করাইতেই তাহার চারিধারের আলোক-রেখার উপর কে যেন একরাশ গাঢ় অন্ধকার ছড়াইয়া দিল। ওই স্থবির, কম্পমান বৃদ্ধের লালসার আগুনে তাহাকে আহুতি দিতে হইবে! দেহের অপমানে হৃদয় যখন ক্ষোভে, অভিমানে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ওই লোকটা তখন তাহার কোনই খবর রাখিবে না,—পরম নিশ্চিন্ত মনে দিনের পর দিন তাহার দেহের উপর লালসার কালো ছাপ লেপিয়া দিয়া যাইবে। সে একটা কথাও বলিতে পারিবে না, বাধা দিতে পারিবে না! একটা অনুষ্ঠান ও গোটাকতক সংস্কৃত কথার জোরে ওই লোকটা তাহার সর্ব্বস্ব দখল করিয়া আজীবন বসিয়া থাকিবে! অথচ এই আত্মবিক্রয় সে নিজে হইতে করিতেছে না, এবং তাহার মত লওয়ার কেহ কোন প্রয়োজন বোধ করে না।—কিন্তু এই মরণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহাকে সারা জীবন জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে! কল্যাণীর চোখ দু'টা জ্বালা করিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

একটী মেয়ে এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কল্যাণীর পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল, "কি সই, বরের ভাবনায় এতই তন্ময় যে, রান্নাঘরে ঢুকে কুকুরে হাঁড়ি খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না।"

কল্যাণী শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "দেখছ না, ঘুম হচ্ছে না!—তার পর কবে এলি স্বর্ণ ?"

স্বর্ণ কহিল, "এই ত কাল।"

কল্যাণী একটু হাসিয়া বলিল, "বর যে বড় ছেড়ে দিলে ?"

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল, "পুরানো হলে কি আর ভাল লাগে ?"

কল্যাণী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "কি জানি ভাই, ওসব বুঝি না।"

"আহা দুঃখ কেন—হলেই জানবে" বলিয়া স্বর্ণ কল্যাণীর গাল টিপিয়া দিল।

"নে সর্—কত কাজ বাকী আছে দেখেছিস্।"

স্বর্ণ কহিল, "সত্যি, এত বেলা হ'ল, এখনও কাজপাট সারা হয় নি ? রান্না চড়াস্ নি ?"

"মার আজ একাদশী। তিনি শ্যামের মন্দিরে গেছেন। মামাও বাড়ী নেই। কাজেই আমার একার জন্যে আর রাঁধতে যাই কেন ? যা হয় ব্যবস্থা হবে'খন।"

স্বর্ণ কল্যাণীর গলা জড়াইয়া বলিল, "তা ব্যবস্থাটা আমাদের বাড়ী করেই আমায় কৃতার্থ কর না কেন ?"

"না ভাই, আমার শরীরটাও ভাল নেই—যা হয় শুক্‌ন শাকনা খেলেই চল্‌বে।"

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল—"শরীর ত বেশই আছে দেখছি,—মনটাই কিছু গোলমাল বাধিয়েছে। ওসব শুন্‌ছি না, তোমাকে যেতেই হবে। বল ত মাসীমাকেও বলে যাচ্ছি।"

"না—না, তার দরকার নেই"—এমন সময়ে দিগম্বরী ঠাকুরাণী বাড়ী ঢুকিতে ঢুকিতে কহিলেন, "হ্যাঁ কলি, এত বেলা অবধি সব পড়ে আছে—কিছুই করিস্ নি!"

কল্যাণী হাসিয়া কহিল, "স্বর্ণের সঙ্গে গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেল মা!"

স্বর্ণ কল্যাণীর দিকে একবার চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "সত্যি মাসীমা, ওর দোষ নেই,—আমিই ওকে আটকে রেখে কাজ করতে দিইনি। ও এবেলা আমাদের বাড়ীতেই খাবে।"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল, "আজ থাক না ভাই, আর এক দিন না হয় খেলেই হবে।"

স্বর্ণ একটু অভিমান-ভরা গলায় কহিল, "শোন মাসীমা, কলি বলছে খাবে না—তা হলে আমি"—বলিয়া স্বর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী হাসিয়া কহিলেন, "দেখতে শুনতে কলি এখন একটু বড়সড় হয়েছে কি না, তাই আর কোথাও যেতে চায় না। তা তোরা ত আমার পর ন'স—ও যাবে'খন।" দিগম্বরী ঠাকুরাণী ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

স্বর্ণ কল্যাণীর গলা ধরিয়া কহিল, "কেমন—এখন ত হ'ল ?" ইতিমধ্যে দিগম্বরী ঠাকুরাণী একবাটী মুড়ি ও কয়েকটা নারিকেল নাড়ু আনিয়া কহিলেন, "নে সোণা, এই জলপান দুটো খা। এত দিন বাদে বিয়ের পর এলি—খালি মুখে যাবি ? তা শ্বশুরবাড়ী থেকে কখন এলি ?"

"কাল সন্ধ্যা বেলা" এই কথা বলিয়া স্বর্ণ দিগম্বরী ঠাকুরাণীর পায়ের ধূলা লইল।

"থাক্, থাক্—জন্ম এয়োস্ত্রী হও মা" বলিয়া দিগম্বরী স্বর্ণর চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন, "জামাই ভাল আছে ত ?" স্বর্ণ ঘাড় হেলাইয়া মুখ নত করিল।

"কলির বিয়ের ঠিক হয়ে গেল মাসী ?"

"হ্যাঁ বাছা।"

"ধীরুদার সঙ্গে ত।"

দিগম্বরী বাধা দিয়া কহিলেন—"ওখানে আর হল না, মা।"

"কেন ?"

"ওরা মা বড়লোক,—তেমন গা করছে না। শাশুড়ী নেই, জায়ের সংসার। তার পর ভেবে দেখলুম, ওদের মেজবউ তেমন মানুষ ভাল নয়,—কাজেই আর এগুলুম না।"

কল্যাণী উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘর হইতে বাসনের গোছা লইয়া উঠানে নামিতেই, স্বর্ণ তাহার পশ্চাতে আসিল। ঘাটের চাতালে বাসনগুলো রাখিয়া কল্যাণী বলিল, "তুই ওই কাঠের গুঁড়ির উপর বোস্—আমি বাসন ক'খানা মেজে নি।"

স্বর্ণ কহিল, "আয় না, দুজনায় হাতাহাতি করে মেজে নি। তা'হলে শীগগির হবে।"

"না—তুই তোর গল্প বল্, আমি শুনতে শুনতে মেজে নি।"

স্বর্ণ কি বলিয়া তাহার স্বামীর কথা পাড়িবে; কোন্ দিনের কোন্ ঘটনা, কখনকার কি কথা আরম্ভ করিয়া সে তার গল্পের সূচনা করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। শ্বশুরবাড়ী, স্বামীব ঘর, আনন্দের সংসার—কত আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা সেখানকার প্রত্যেক বস্তুটী! রাশি রাশি কথা এলোমেলো ভাবে তাহার মনের মধ্যে পাক খাইয়া গেল! সেই মেটে-পাঁচিল-ঘেরা ঝকঝকে বাড়ী, ধবধবে উঠানের পাশে সারি সারি খড়ের টুপী-পরা গোল ধানের গোলা, পার্শ্বে তুলসীমঞ্চ, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ, ফুলবাগান...... ইত্যাদি তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। একটা অতিবড় সুখের চিন্তা তাহাকে মূক, অন্ধ এবং বধির করিয়া কত দূরে ভাসাইয়া লইয়া চলিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; শুধু একটা উদাস পলকহীন চাহনি বাহ্যজগতে পড়িয়া রহিল মাত্র।

স্বর্ণের এই ভাব-তন্ময় উদাস দৃষ্টি, পুলক-সঞ্চারিত মৃদু হাসির ক্ষীণ-রেখা চোখ-মুখে ফুটিতে দেখিয়া কল্যাণী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, যে কথা শুনিবার জন্য সে আজ এত ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, প্রাণের সমস্ত বাসনাকে একসঙ্গে বাঁধিয়া শ্রবণের দুয়ারে জড় করিয়া রাখিয়াছে, সে প্রসঙ্গ তাহার কাছে কত মধুর, কত লোভনীয়,—বিবাহিতা স্বর্ণ হয় ত তাহা বুঝিতে পারে নাই, বা বুঝিবার ইচ্ছাও তাহার নাই। তাই সে আপনার সুখ-চিন্তায় আপনিই ডুবিয়া রহিয়াছে।...... হায় স্ত্রীলোকের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এতখানি পরিবর্ত্তন আসিতে পারে, এ কথা কল্যাণী কল্পনাও করিতে পারিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাতের আধমাজা বাসনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষুণ্ণস্বরে স্বর্ণকে কহিল, "তা ভাই, তুই কেন মিছিমিছি রোদে বসে কষ্ট পাস্, তুই বাড়ী যা।"

স্বর্ণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, না—রাগ করিসনি ভাই, সত্যিই আমি সেই কথাই ভাবছিলাম।" তার পর সে বাসরঘর, ফুলশয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বাপের বাড়ী আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বরের কথা একে একে কহিতে লাগিল। স্বামীর আদর-যত্ন, ভালবাসার কত কথা, দিনের বেলায় ছুতানাতায় পান চূণ জল লওয়ার অজুহাতে যখন-তখন অন্দরে আসা-যাওয়া, কখনো বা ভুলক্রমে নববধূর ঘরে প্রবেশ ও তাড়াতাড়ি চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ ও হাসিয়া প্রস্থান, দূর হইতে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাতাইয়া তোলা এবং ঘন ঘন এ-কোণ সে-কোণে সচকিত দৃষ্টিপাত, মাথা-মুণ্ডহীন সমস্ত-রাত্রিব্যাপী গল্পগুজব, প্রাতে অনিচ্ছায় শয্যা-ত্যাগ...ইত্যাদি কত কথাই কহিতে লাগিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী স্বর্ণর স্বামীর কথা শুনিতে লাগিল—যেন তাহার মধ্যে কত মধু, কত মাদকতা। তার পর শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পাঁচজনের কথা উঠিল। কে কি দিয়া মুখ দেখিল, এই তারের বালা দুগাছা কে দিয়াছে, গলার হাঁরছড়া ক'ভরির ইত্যাদি একের পর এক করিয়া ঘাড় হেলাইয়া, মুখ দোলাইয়া, চোখভঙ্গী করিয়া স্বর্ণ সমস্তই কল্যাণীকে কহিতে লাগিল। নিশ্চল প্রস্তর-প্রতিমার মত কল্যাণী স্বর্ণর প্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া সে সকল কথা শুধু কাণ দিয়া শুনিল না—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল।

সূর্য্য তখন ঠিক মাথার উপরে। কল্যাণীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে; বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তার মত চূর্ণ-অলক বাহিয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। পুকুর-পাড়ের ছায়ায় ঢাকা বাঁশঝাড়ের ভিতর হইতে একটা পাখী আপনার খেয়ালে থাকিয়া থাকিয়া হাঁক দিতেছিল—"বউ কথা কও, বউ কথা কও! বউ কথা কও!" হাসি, লজ্জা এবং আনন্দের ভিতর দিয়া গল্প বলা শেষ হইতেই স্বর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আঁচলখানি কোমরে জড়াইয়া কহিল "তিন ঘণ্টা ধরে ত ভাই গল্প করা গেল, বাসন কিন্তু একখানাও এ পর্য্যন্ত মাজা হল না।"

কল্যাণী একটু লজ্জিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, সত্যই গোছাভরা বাসন যেমনকার তেমনি পড়িয়াই আছে, একখানাও মাজা হয় নাই।

"দে দুখানা আমার কাছে, হাতাহাতি মেজে ফেলি, বেলা হয়ে গেছে" বলিয়া স্বর্ণ কল্যাণীর নিকটে আসিতেই, কল্যাণী ঘাড় নীচু করিয়া মাথা বাঁকাইয়া কহিল, "না, না—তোকে মাজতে হবে না, ভারী ত কখানা বাসন, এই দ্যাখ্ আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেজে ফেল্লুম বলে"—

স্বর্ণ একটু ক্ষুণ্ণভাবে কহিল, "যা খুসি কর্, শীগ্‌গির নে।"—

কল্যাণী অতি ক্ষিপ্র হস্তে তাহার কাজ সারিয়া লইল; এবং কাপড় কাচিয়া বাসনের গোছা তাহার অর্দ্ধোত্থিত বাম হাতের উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিল—"বাস্, এই ত হয়ে গেল, চল এখন।"

উভয়ে চলিল। স্বর্ণ হাসিয়া কহিল, "আর তোকে পরের মুখে ঝাল খেতে হবে না কলি—তোরও ত ফুল ফুটে উঠেছে। বরের কথা বলবি ত?"

কল্যাণী অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল "বলব।" কিন্তু ভাবিয়া পাইল না—কি তাহাকে বলিতে হইবে। একজন ৫০ বৎসরের পলিত-কেশ, গলিত-বিবেক, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের সহিত তাহার প্রেমালাপ-কাহিনী! যে ব্যক্তি বয়স হিসাবে তাহার প্রায় চতুর্গুণ বড়, যৌবনকে যে প্রায় তিন যুগের পথে ফেলিয়া আসিয়াছে, বার্দ্ধক্য যাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার প্রেম, ভালবাসা, মিলন! কল্যাণীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল! লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে, রাগে তাহার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া আগুন ছুটিল! যে সুখের কল্পনাকে সে এত দিন কত ভাবে চিত্রিত করিয়া সারা অন্তর ভরাইয়া রাখিয়াছিল, যাহার গঠন-কার্য্য শৈশব হইতেই মনের কোন্ গোপন কোণে আরম্ভ করিয়া আজ তাহাকে পূর্ণতা দিতে চলিয়াছে, তাহা কি এই! এই অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া তাহার নারী-জীবনের সার্থকতার পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবেই! ইহার সঙ্গেই তাহার ইহকালের সুখদুঃখ, আর বুঝি পরকালের সম্বন্ধও জড়িত থাকিব! এই আড়ম্বর যে কতবড় মিথ্যা এবং ইহারই অন্তরালে একজনের যে কতখানি দুঃখের বোঝা সঞ্চিত আছে, তাহা ত কেহই বুঝিবে না! সত্যের মুখোস পরিয়া এই মিথ্যাটাই জয়ী হইয়া আমরণকাল তাহার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে থাকিবে, সে একটা কথাও বলিতে পারিবে না,—ইহাই তাহার সুখের বিবাহিত জীবন!

কল্যাণীর দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। সে তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করিয়া আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতেই, তাহার হাতের বাসনগুলি মাটীতে পড়িয়া গেল। ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে চমকিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া স্বর্ণ দেখিল, কল্যাণীর হাতের বাসন মাটিতে পড়িয়া গড়াইয়া যাইতেছে। সে ব্যস্তভাবে কহিল, "কি লো কলি, পড়ে গেলি নাকি?"

"না আমার লাগেনি, হঠাৎ হাত পিছলে বাসনগুলো পড়ে গেল।"

স্বর্ণ হাসিয়া কহিল, "এই দ্যাখ্ কলি, তুই আমায় তখন বলছিলি বড়,—এখন দেখলি ত?—স্বোয়ামীর কথা ভাবতে গেলে মেয়েমানুষকে একেবারে কাণা, কালা, বোবা, পঙ্গু হয়েই ভাবতে হয়—নইলে তার সবটুকু ভাবা যায় না।"

কল্যাণী সে কথার আর কোন জবাব দিল না। বাসনগুলা গুছাইয়া পুনরায় তুলিয়া কহিল, "স্বর্ণ, তুই ভাই আর দেরী করিস্ না, বাড়ী যা—অনেক বেলা হয়ে গেল—"

স্বর্ণ গম্ভীরভাবে বাধা দিয়া কহিল, "তুই তা হ'লে যাবি না বল্?"

"না গেলে ত তখুনি বল্‌তুম,—তোকে এতক্ষণ আটকে রাখব কেন?"

"তবে?"

"একটু দেরী হবে ভাই!"

স্বর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আরও দেরী! কেন?"

"ভিজে কাপড়খানা ত ছাড়তে হবে! আর মা পূজোয় বসেছেন—উঠ্‌লেই আমি যাচ্ছি,—তুই এগো!"

"আসিস্, নইলে কিন্তু এই—'ঘাড় বাঁকাইয়া একটা কীল দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্ণ চলিয়া গেল।

কল্যাণী গৃহে প্রবেশ করিল। (ক্রমশঃ)

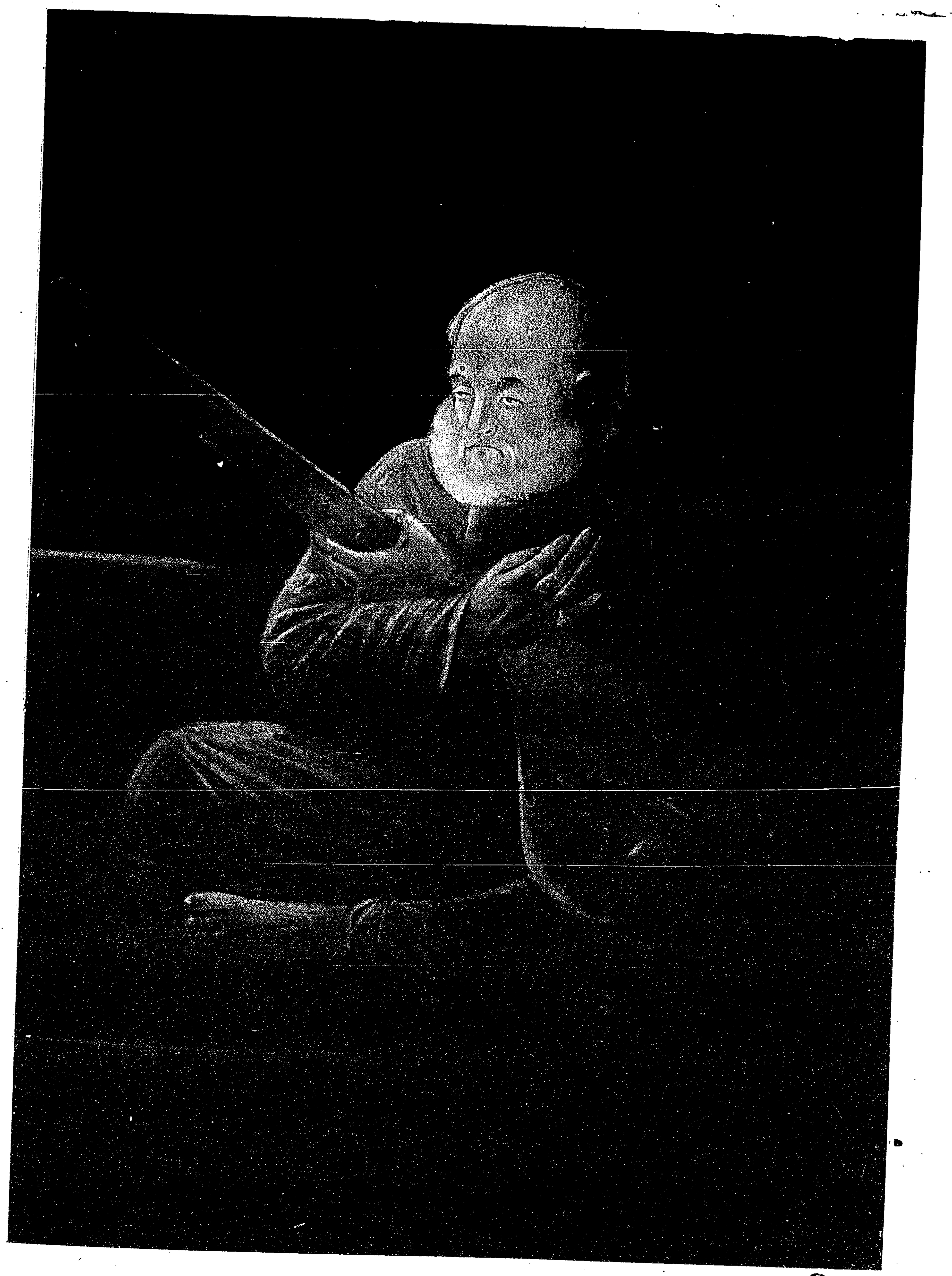

ওস্তাদজির সর্ব্বস্ব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

চরকা প্রচলনে নারীজাতির কর্ত্তব্য

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চরকার মত একটা জিনিস যে কেন দেশের সাধারণ লোক ধরিতে চাহিতেছেন না—এ একটা মস্ত রহস্যের মত। যে দেশের লোকের গড়-পড়তায় দৈনিক আয় কয়েক পয়সা মাত্র, সে দেশ হইতে বৎসরে বহু কোটি টাকা বিদেশী বস্ত্রের বিনিময়ে সমুদ্রপারে চলিয়া যাওয়া দেশের পক্ষে কত প্রাণ-ঘাতক তাহা কি ভাবিবার কথা নহে? সকল বিদেশী পণ্যের হিসাব খতাইলে ঐ অঙ্কটা যে কোথায় উঠে তাহা ভাবিতে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। এ সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুবার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই সব বড় বড় কথা আমরা ঠিক্ ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কি না সন্দেহ। কারণ, তাহা হইলে এত দিন চরকা আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া দেশকে শ্রীমন্ত করিয়া তুলিত। তবে এটা ত আমরা প্রতি দিনকার জীবনযাত্রায় বুঝিতেছি যে, অর্থানটনে পরিবারস্থ ছেলে মেয়েদের রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিতেছি না, নিতান্ত মুমূর্ষু না হইলে ডাক্তার কবিরাজের দ্বারস্থ হই না। অর্থের অনটনে সুচিকিৎসা বা পথ্যের অভাবে আত্মীয় পরিজন চক্ষের সম্মুখে ইহলীলার শেষ করিতেছে, সময় সময় পেট ভরিয়া অন্নও জুটিতেছে না। এ সকল যাচাই করার জন্য পাণ্ডিত্যের কষ্টিপাথরের আবশ্যক হয় না, বড় বড় গ্রন্থ অধ্যয়নের আবশ্যকতা নাই। এসব ব্যাপার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অহরহঃ চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এত সুস্পষ্ট যখন দেশের দারিদ্র্য তখন চরকা ধারণের যৌক্তিকতার জন্য অর্থ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইতে হইবে কেন? ক্ষেতের ধান, বাগানের তরী তরকারীতে কোনও মতে জীবন-ধারণ চলিতেছে। পেটের ভাতেও টান পড়িত না—যদি না বিদেশী কাপড় প্রভৃতির জন্য আমাদের গোলার ধান মহাজনের গোলায় বিকাইয়া দিতে হইত। এই ভীষণ অন্নসমস্যার সমাধান কোথায়—সে বিষয়েও আচার্য্য দেব যে ঐকান্তিক আলোচনা করিয়াছেন সেজন্য তিনি প্রণম্য। দেশের নূতন ধনাগমের পন্থা উদ্ভাবন কিম্বা দেশ হইতে ধনের বহির্গমনের পন্থারোধ—এই দুই-টাতেই দেশে ধনের আধিক্য ঘটে। দেশে ধনবৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায়—চরকা। ইহাতে বিদেশী বস্ত্রের বিনিময়ে দেশের ধন বহির্গমনের পন্থা-রোধ করিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিলাতি কাপড় বর্জ্জনের চেষ্টা চলিয়াছিল; সে চেষ্টা অনেকাংশে সফলও হইয়াছে। দেশে অনেকগুলি দেশীয় কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত কাপড়ের কল বসিয়াছিল। তাহার অনেকগুলি আজিও বেশ চলিতেছে। দেশে ধনা-ধিক্যও ঘটিয়াছে। তবে সে ধন মাত্র কতকগুলি ধনীর ধনভাণ্ডারে স্তূপীকৃত, পুঞ্জীভূত হইতেছে। বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হইবার মুখে ছিটে-ফোঁটা মাত্র আমাদের ভাগ্যে জুটিতেছে। মন্দের ভাল এই যে টাকাটা সাগর পারে

যাইতেছে না। সাধারণ লোক ইহাতে ধনের সন্ধান পান নাই। বরং অনেক সময় বিলাতি কাপড়ের তুলনায় যখন মিলের বা দেশী কাপড়ের দর অধিক ছিল, তখন দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত দেশবাসী দেশী শিল্পের রক্ষাকল্পে—অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্যে দেশী কাপড় কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছেন। অবশ্য মালিক ধনীদের সদ্বুদ্ধি থাকিলে তাঁহাদের সঞ্চিত ধন অনেক সময় সার্ব্বজনীন মঙ্গলকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া জন সাধারণ উপকৃত হয়। আমাদের দেশে তেমন যে আদৌও হয় নাই তাহা বলি না, কিন্তু যেরূপভাবে এবং যত বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা হয় নাই। কতকগুলি কাপড়ের কল দেশে স্থাপিত হইয়া—দু'চার জন মোটা মাহিয়ানার চাকুরিয়াকে বাদ দিলে—সামান্য কতকগুলি শ্রমিক এবং কেরাণীদের কোনও মতে দিন গুজরাণ হইতেছে ছাড়া সাধারণ লোকে আর্থিক কোনও উপকার পায় নাই। চরকায় এই দিক দিয়া একটা মস্ত বড় সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। নিজের কাপড় নিজে বুনিয়া পরিব—যেমন নিজের ক্ষেতে ধান, বাগানে তরিতরকারী অর্জ্জাইয়া দিন গুজরণ করি—এও তাই। বাগ বাগিচায় আবশ্যকমত দশ-বারটা তূলার গাছ অর্জ্জাইয়া লইতে ৩০।৪০টায় না হ'ক্ বড় জোর এক মুঠা তূলার বীচির আবশ্যক হয়। আর চরকা—তার উপকরণ ত একতাল মাটি! আর খান কয়েক বাঁশের ফালি বা চটি এবং হাত ১০।১২ পাটের দড়ি বা রশি। এই ত চাই মূলধন! সূতা কাটা শিখিতে ত দেখিতেছি দু'দিনের বেশী সময় লাগে না। এ অবশ্য মোটা সূতা, কিন্তু মোটা সূতারই প্রয়োজনীয়তা বেশী। সরুসূতা কাটিতে তূলা খুব ভাল করিয়া পিঁজিতে হয়; মোটা সূতায় তেমন—এমন কি আদৌ তুলা পিঁজিতে হয় না। মোটা সূতা যেখানে আট দশটী লাগিবে কাপড় বুননের সময় সরু সূতা সেখানে ১৫।২০টা লাগিবে, কি তাহার বেশী। মোটা সূতার গুণ বা দোষ—যিনি যেমন মনে করেন—কাপড় হয় মোটা! বিলাতি মিহি কাপড়ে যখন অভ্যস্ত ছিলাম, সেই স্বদেশী আমলের পূর্ব্বে—তার পর মিলের মোটা কাপড়ে প্রথম প্রথম অনেকের মন উঠে নাই। আনন্দের কথা যে মিলের মোটা কাপড়ে আজকে আর আমাদের দেহকান্তি ক্ষুণ্ণ হয় না। ও একটা আমাদের অভ্যাসদোষ, বা তাই বা কি করে? যে বাবুর মোটা জিনের কোট্‌প্যাণ্টে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া অপিসের কার্য্য চালাইতে বা এমনি কিছু করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে বাহিরের মুক্ত বাতাসে খদ্দর যে কেন গাত্রদাহ উপস্থিত করিবে বুঝি না। যা' হোক, মোটা সূতায় বুননের কাজ আগায় বেশী। সুতরাং সেই দিক থেকে আয়কর। আমরা ত কোনও বিদেশের বাজারে সূক্ষ্ম বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাইতেছি না। পরিষ্কার আমাদের ঘরোয়া কথা। যার ক্ষেতে প্রচুর বেগুন অর্জ্জায় তার দরজার গোড়ায় যদি আমেরিকা বা ইয়োরোপ থেকে বেগুনের জাহাজ আসিয়া পয়সায় একপণ কি এমনি কিছু দর লাগায় ত আমরা কি তাহাতে ফিরিয়া তাকাই! ক্ষেতে যার অগুস্তি বেগুন সে কেন ভিন্ দেশের বেগুনের জাহাজে লোলুপ দৃষ্টি দিবে? এমনি বিলাইয়া দিলেও আবশ্যক না থাকিলে তাহা আমাদের গৃহে স্থান পাইবে না। যাহা দরকারের বাহিরে তাহার তোয়াক্কা কে রাখে? চরকা বাদেও আর একটা জিনিস আমাদের দরকার। সে হল তাঁত। পাড়াগাঁয়ে এখনও তাঁতের বিশেষ অভাব হয় নাই—দুচারখানা দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য কিছু মজুরি দিলে তাঁতীর তাঁতেও কাপড় বোনাইয়া লওয়া চলে। তাহাতেও কাজ না হইলে গাঁয়ে গাঁয়ে অন্ততঃ একখানি করিয়া তাঁত থাকিলেও গাঁয়ের কাপড় বোনার কাজ চলিতে পারে। ধান ভানিবার ঢেঁকি ত গাঁয়ের অনেকের থাকে না; তাতে কি কাহারও চাউল ছাঁটাই আট্‌কাইয়া থাকে? একটী তাঁতের দামই বা কত? বড় জোর সাজ-সরঞ্জাম সমেত ২০৲।২৫৲ টাকা। আট দশ জন লোক যে পরিবারে, তার কাপড় জামায় বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০০৲।১২৫৲ টাকা খরচ হয়। বৎসর দুই ঐ টাকাটা অবসর সময় দু'এক ঘণ্টা চরকা ঘুরাইয়া বাগানের তূলায় সূতার কাপড় বুনিয়া লইয়া যদি বাঁচাইতে পারা যায়, ত ৫।৭ বৎসরে ঐ গৃহস্থের অবস্থার যে কি পরিবর্ত্তন হইতে পারে তাহা সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বোঝা সহজ হয়! মোটা কাপড়ের কথা আদৌ উঠিবে না, যে দিন নিজের চরকার সূতায় কাপড় বুনিয়া নিজে বা আত্মীয় স্বজনে পরিধান করেন। তখন সত্যসত্যই মনে হইবে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" সে যে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, তা নিজে হাতে যিনি চরকা ঘুরাইয়াছেন, তিনি ছাড়া অপরকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার ভাষা নাই! একটু চিন্তা করিলে মনে হয়, চরকাই আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির একটা প্রধান উপায়। আপামর সাধারণ ইতর ভদ্র

সবাই ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে উপকৃত হইবেন। কাহাকেও, কাহারও দ্বারস্থ বা মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। যে ভিক্ষান্নেও জীবন যাপন করে তার কুটীরের পাশেও ৫।৭টা তূলা গাছের স্থানের অসংস্থান হয় না। এখনকার চরকার অস্তিত্বও তার ঘরে অসম্ভব হয় না, যদি সেটার তার চাহিদা থাকে। এমন সোজা সরল জিনিসটা, যাহাতে বিশেষ কোনও আড়ম্বর নাই, দেশের কোটী কোটী লোকের অর্থাভাব যাহাতে দূর হইবে, আর্থিক সচ্ছলতায় রোগে চিকিৎসা, পথ্য মিলিবে, কোমরে মোটা কাপড় পরিয়া পেটে দু মুঠা বেশী অন্ন দিতে পারিবে, অভাব-ক্লিষ্টের মুখে হাসির রেখা ফুটিবে—সেই জিনিসটাতে কেন যে দেশের লোক উন্মুখ হইয়া পড়িল না, এ কথা ভাবিলে মনে হয়, সত্য সত্যই আমরা কি একটা মৃত জাতি? আশা নাই! আকাঙ্ক্ষা নাই! উত্তম নাই! চিরকাল অন্ধ তমসে নিমগ্ন হইয়া রহিব—এই কি জাতির গতি? আলস্যে কাটাইলে চলিবে না। বীর কর্ম্মীর ন্যায় নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, জীবনপণে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। মরণ আসে ত বীরের মরণ, বাঁচি ত বিজয়ী বীরের জয়-মাল্যে বক্ষঃ শোভিত হইবে। লক্ষ্য যখন দেখা যাইতেছে, কিন্তু পন্থা বা সুযোগের সন্ধান মিলিতেছে না, তখনই অতীতের ইতিহাস জাতির অবলম্বনীয় পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, বলে, এই পথেই এক দিন তুমি চলিয়াছিলে, এই পথই এক দিন তোমাকে চরমে পৌঁছিয়া দিয়া জয়যুক্ত করিয়াছিল—ইহাই তোমার গন্তব্য। ইতিহাসে ত ইহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে যে, এক দিন এই চরকার সূতায় তাঁতের কাপড়ে দেশের লোকের বস্ত্রাভাব দূর করিয়া দূর-দেশের চাহিদা যোগাইত। জগতের সঙ্গে সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের মস্‌লিনই ছিল শ্রেষ্ঠ। ঐ চরকা বাহিরের কোনও দেশের লোক আসিয়া ঘূরাইয়া দিত না। আমরাই ঘূরাইতাম, বিশেষ করিয়া আমাদের জননী-কন্যারাই এ কার্য্যটা করিতেন। সূতাকাটা তাঁদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মোট-মুটী কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল—চরকা চালাইতেন মেয়েরা, তাঁত চালাইতেন পুরুষেরা। তাই ত মনে হয়—আজ নব জাগরণের দিনে বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া মেয়েদের চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকিবার দিন নহে। উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁদেরই এই চরকার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা বলি না যে চরকার সাফল্য চেষ্টায় পুরুষ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন। বলিতে চাই—চরকা-লক্ষ্মীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে নারীর। চরকার স্থান বাহিরে নহে। নারীর পশ্চাতে চরকা কখনও সচল হইয়া উঠিবে না। তাহার স্থান শুদ্ধান্তচারিণী নারীজাতির সম্মুখে! জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠোর। তাঁহারা কি দেখিতেছেন না—অর্থাভাবে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা হইয়া উঠিতেছে না, পেটে আবশ্যক মত অন্ন জুটিতেছে না? রোগে ঔষধ-পথ্য না পাইয়া কত সন্তান অকালে ইহলীলা সংবরণ করিতেছে! সকলেরই মূল অর্থাভাব। চরকায় বস্ত্রাভাব দূর হইয়া পরিবারে ধনাধিক্য ঘটিবে, ছেলে মেয়েরা ভাল খাইয়া দাইয়া হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়াইবে, সে কি আনন্দের বিষয় নহে? পুরুষরা নানা বাহিরের কর্ম্মভারে ভারাক্রান্ত। তাহাদের ভার লাঘব করুন—তবেই না আপনাদের জীবন ধন্য! আজ 'পল্লীসংস্কার পল্লীসংস্কার' রব দেশের সর্ব্বত্র শোনা যাইতেছে। বাস্তবিক পল্লীর দীনতার দিকে অনেকের লক্ষ্য পড়িয়াছে,—শুভলক্ষণ। কার্য্যও কিছু কিছু হইতেছে। পল্লীসংস্কারের একটী প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত পল্লীজননী-দিগকে সজাগ করিয়া চরকা ব্রতে ব্রতী করা। পরিবারের পুরুষরা ত এ কার্য্যে অগ্রণী হইবেনই। কিন্তু সব থেকে সুসঙ্গত ও কার্য্যকরী হইবে, যদি দেশে জননীদের মধ্যে—যাঁহাদের জীবন আজ নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্নিগ্ধালোকে ধন্য হইয়াছে, যাঁহারা স্বজাতির হীনতায় কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের উত্থানের প্রচেষ্টায় অবহিত আছেন—তাঁহারা পল্লীর নারী-শক্তিকে জাগ্রত, উদ্বোধিত করিয়া চরকাব্রতে ব্রতী করেন। আজ তাঁদের সম্মুখে সব থেকে বড় পরীক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত। এ পরীক্ষায় সফলতা আসিলে নারীজাতির হীনতা আপনি স্খলিত হইয়া যাইবে। জাতির মুক্তির ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান পুরুষের সমপর্য্যায়ে আপনিই লিখিত হইয়া থাকিবে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

কাশীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটের উপর একটি নির্জ্জন চত্বরে অসিত একা বসিয়া বেণীমাধবের গগনস্পর্শী ধ্বজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। নীচে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল। ওপারে বটবৃক্ষের অন্তরালে অপরাহ্নের সূর্য্য অস্তপ্রায়। সেই ম্লান রক্তিম কিরণ নদীর বুকে, ঘাটের পথে, গাছের পাতায় ঝরিয়া পড়িতেছিল। ঘাটের পথ জনবিরল, কেবল গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিতা স্নানার্থিনী কয়েকটি নারীর আলাপের ধ্বনি মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

নদীতীরে একা বসিয়া অসিত তাহার পূর্ব্বজীবনের কথা ভাবিতেছিল। উত্তর বাংলায় এক শান্ত শ্যামল পল্লীর মধ্যে তাহাদের সেই নিশ্চিন্ত সুখময় গৃহের চিত্র স্বপ্নের মত এখনো তাহার মনে পড়ে। আর মনে পড়ে—মায়ের সেই প্রসন্ন সুন্দর মুখখানি—কত আদরে কত যত্নে যে মায়ের স্নেহের কোলে সে দিনের পর দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল। প্রতি দিন ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের চুম্বনে জাগিয়া হাসিয়া উঠিত। তাহার পর সমস্ত দিন তাঁহার সকল কাজের মধ্যে সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত অশ্রান্ত গল্প, কত কথা ও হাসির মধ্যে তাহাদের দিন কাটিত। সন্ধ্যার সময় চাঁদের আলোয় সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্প শুনিত। সেই সুখের স্বপ্নের মত দিনগুলির অস্পষ্ট স্মৃতি এখনো তাহার মনে পড়ে। তাহার পর এক দিন কিসে কি যে হইয়া গেল, তাহা সে কিছুই জানিল না—তাহার মা তাহাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহই তাহাকে সে কথা কিছু বলিল না—শুধু তাহার পিতা তাহাকে লইয়া তাহাদের গৃহ ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সেই হইতে তাহার দুঃখের জীবন আরম্ভ হইল।

আশ্রয়হীন, অর্থহীন, অসহায় অবস্থায় কত দিন পথে পথে তাহাদের জীবন কাটিয়াছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে কাতর হইয়া কত দিন মায়ের মুখ মনে পড়িয়া তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত,—অল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতি পিতার ভয়ে সে কাঁদিতে পারিত না,—নিঃশব্দে মনের ব্যথা মনে চাপিয়া নীরব রোদনে বক্ষ পূর্ণ করিয়া গুমরাইয়া থাকিত। কেহ তাহাকে একটি আদরের কথা বলিত না, কেহ তাহাকে যত্ন করিত না। একটু ভালবাসার জন্য, একটু স্নেহের স্পর্শের জন্য তৃষিত হইয়া তাহার দুঃখের জীবনের কত দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল।

তাহার পরে ক্রমে সে বড় হইল। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পিতার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের তীব্র বেদনা ও প্রতিহিংসার জ্বালার সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিল।

সে শুনিল, তাহাদের গ্রামের জমীদার গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষই তাহাদের সমস্ত দুঃখ ও অপমানের মূল কারণ। মণ্ডলগড় পরগণার নায়েবের অত্যাচারে প্রজারা উত্যক্ত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। কর্ম্মচারীদের চক্রান্তে জমীদারের নিকট কোন কথা উঠিতে পারিত না। তাহার মহাপ্রাণ পিতা প্রজাদের পক্ষ লইয়া জমীদারকে সমস্ত ঘটনা সত্য ভাবে জানাইয়া উভয় পক্ষে সদ্ভাব ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে জমীদারের রোষে পড়িয়া অনেক মিথ্যা মামলা-মোকর্দ্দমায়, নানা অত্যাচারে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল।

কিন্তু শুধু এই উৎপীড়নেই জমীদারের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল না। এক দিন তাহার পিতা কোন বিশেষ কার্য্যে গ্রামান্তরে গিয়াছিলেন,—দুই দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য, কেহ কোথাও নাই। প্রতিবেশীরা সংবাদ দিল, গত রাত্রে জমীদারের লোকজন আসিয়া ঘরের দরজা ভাঙিয়া তাঁহার পত্নীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা জাগিয়া উঠিলেও ভয়ে

জমীদারের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সাহস করে নাই। শিশু অসিত উপস্থিত তাহাদের কাছেই আছে।

সেই দিন অপরাহ্নে দীঘির জলে তাহার মাতার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিল। দুঃসহ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সতী অভিমানে ও ঘৃণায় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

তাহার পিতা জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি হারাইয়া শুধু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য ও এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। এই তাহাদের জীবনের ইতিহাস।

তাহার পর হইতে সেও তাহার পিতার মত তাহাদের বংশের অপমানকারী সেই প্রবল শত্রুর প্রতি তীব্র প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহা নিজ হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু কোন দিন কৃতকার্য্য হয় নাই। পিতা-পুত্রের সম্মিলিত চেষ্টা কতবার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। অভাবে, দুশ্চিন্তায়, গুরুতর পরিশ্রমে ক্রমেই তাহার পিতার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। অবশেষে এক দিন জীবনের ঈপ্সিত কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতেই তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিল।

অসিতের মনে পড়িল—কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর তাহার পিতার মৃত্যুশয্যা। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতর হইয়া শেষ-রাত্রে তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাবক্ষে সেই নির্জ্জন শ্মশানঘাটে এক মন্দিরের চত্বরে একা সে মৃতপ্রায় পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রাত কাটাইয়াছে। অর্থ, সম্পদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত থাকিতেও আজ পনের বৎসর ধরিয়া অসহ্য মর্ম্মবেদনায়, দারিদ্র্যে, অর্দ্ধাশনে, বিনা চিকিৎসায় তাহার পিতা মৃত্যুমুখে—নিতান্ত দীনহীনের মত, পথ-ভিখারীর মত অসহায় অবস্থায় ভূমিশয্যায় পতিত! একটা নিরুপায় হতাশা ও তীব্র তীব্র যাতনায় তাহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। উপযুক্ত পুত্র হইয়াও সে এক দিনের জন্য তাহার উৎপীড়িত, দুঃখী পিতাকে কোন স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিল না!

প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রামগোবিন্দ জাগিয়া উঠিলেন। একবার প্রাণ ভরিয়া স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করিলেন। তাহার পর উদ্দেশে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমার সময় হয়ে এসেছে অসিত! যা কিছু আমার বলবার ছিল, সে সবই তোমার জানা আছে। নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। এখন শুধু সেই সব কথাগুলোই তোমায় আবার মনে করিয়ে দিয়ে যাই…

তাঁহার মুখে রৌদ্র আসিয়া পড়িতেছিল। অসিত উঠিয়া নিজের গায়ের চাদরখানি রৌদ্র আচ্ছাদন করিয়া টাঙ্গাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি বলিলেন, আমার এই মৃত্যুশয্যায় তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, যে কাজ আমি অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাচ্ছি—তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় সে কাজ সুসম্পন্ন করবে? তোমার মায়ের সম্মান যে নষ্ট করেছে, আমাদের জীবনব্যাপী সমস্ত অপমান ও দুঃখের যে মূল, তাকে যেখানে যে কোন অবস্থায় পাবে, নির্ব্বিচারে হত্যা করবে। তার রক্ত ভিন্ন আমার আত্মা আর কিছুতেই তৃপ্ত হবে না। তোমার প্রতিহিংসা যেন তাকে পৃথিবীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত অবিরাম অনুসরণ করে। বল, সে যেখানেই থাক, তাকে খুঁজে বের করবে?

অসিত সাশ্রুনয়নে পিতার মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

রামগোবিন্দের শুষ্ক অধরে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। শান্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরে কিছু দিন অসিত লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে বেড়াইল। কোন কাযে মন দিতে পারে না কোন কিছুই ভাল লাগে না, কি করিবে কোথায় যাইবে, তাহা কিছুই মন স্থির করিয়া ভাবিতে পারে না।

এই সময় বাংলায় বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল। চারিদিকে সভাসমিতি, বক্তৃতা, বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ইত্যাদিতে সারা বাংলা টলমল্ করিতে লাগিল। অসিত যেন সহসা অকূলে কূল পাইল। জীবনের পথে নূতন আলোর সন্ধান পাইয়া সেও নবীন অনুরাগে ও উত্তেজনায় এই আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার পর হইতে কিছু দিন অসিত দলের মধ্যে থাকিয়া বাংলার দিকে দিকে অক্লান্ত ভাবে ও কঠোর পরিশ্রমে বয়কট মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন আর তাহার নিজের কথা ভাবিবার সময় বা চেষ্টা রহিল না।

উত্তেজনার পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। কাযেই যখন

সরকার পক্ষ হইতে অত্যাচার, নির্য্যাতন, নানা নূতন আইনের নাগপাশের বন্ধন আরম্ভ হইল, তখন দলের মধ্য হইতে অনেকেই একে একে সরিয়া পড়িল। দেশভক্তির আতিশয্য আর তখন তাহাদের টানিয়া রাখিতে পারিল না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে আরো একটি দল ছিল, যাহারা প্রথম উত্তেজনার মুখে দেশসেবায় নামিলেও, ক্রমে তাহারা যথার্থ দেশকে চিনিয়াছিল, দেশকে ভালবাসিয়াছিল, দেশের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহারা উৎপীড়ন, নির্য্যাতনে টলিল না,—কোন প্রলোভন, কোন আতঙ্কই আর এই ঘরছাড়ার দলকে ঘরে ফিরাইতে পারিল না। বাংলায় দিকে দিকে এই ঘরছাড়ার দলকে লইয়া নানা বিপ্লব-সমিতি গড়িয়া উঠিল। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এই সব বিপ্লববাদীর দল নানা ভাবে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

অসিতেরও আর ফিরিবার মন ছিল না। সে কিসের আকর্ষণেই বা কোথায় ফিরিবে! সংসারে তাহার কোন বন্ধন ছিল না। সে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়া বিপ্লববাদীদের দলে মিশিয়া গেল।

এই সমিতির দলভুক্ত হইয়া যখন সে নানা মতের মধ্য দিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া, নানা দিক হইতে দেশের মুক্তির অত্যুগ্র চেষ্টায় নিজের জীবনের কথা বিস্মৃত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় এক দিন পাটনার নির্জ্জন প্রান্তরে নিতান্ত অতর্কিত অবস্থায় তাহার জীবনের প্রবল শত্রুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অসিত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া তখন তটভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নদীর জলেও সেই আঁধার ছায়া। দূরে অরণ্যানীর অন্তরাল হইতে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ ঈষৎ উঁকি দিতেছিল। বেণীমাধবের মন্দির হইতে সন্ধ্যা-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ও পুরোহিতের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধীর সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল। অসিত উঠিয়া চত্বরের এক কোণ হইতে কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইল। তাহার পর যেন কাহার আসার আশায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ঘোষের সহিত দেখা হইবার পর হইতে কি দুর্নিবার চাঞ্চল্য ও উদ্বেগেই না সে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল! এই সেই তাহাদের জীবনের প্রবল বৈরী! ইহারই হাতে তাহার মা অপমানিত হইয়া ঘৃণা ও ধিক্কারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। ইহারই অত্যাচারে তাহার পিতা আশ্রয়হীন, বিত্তহীন হইয়া, পথে পথে ভিখারীর মত ঘুরিয়া নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে অকালে মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার পিতৃমাতৃহন্তা সেই নারকী আজ তাহার আয়ত্তের মধ্যে। দেশের সহিত সমস্ত যোগ ছিন্ন করিয়া এত দিন সে সুদূর পশ্চিমের এক প্রান্তে আত্মগোপন করিয়া কাটাইয়াছে। তাই তাহারা এত সন্ধান করিয়াও তাহাকে কোন দিন বাহির করিতে পারে নাই। কিন্তু এবার? এবার তাহার হস্ত হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

পৈশাচিক আনন্দে ও তীব্র প্রতিহিংসায় প্রথমে কিছুক্ষণ তাহার সমস্ত চিত্ত বিক্ষোভিত হইতে লাগিল। সে সময় সে আর কোন কাজে মন দিতে পারিল না। ঘোর উত্তেজনা ও উদ্বেগে অধীর হইয়া সে কেবলই অশান্ত ভাবে ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার মনের সে ভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার এত দিনের উদ্যত প্রতিহিংসার পাত্র কি সেই সরলহৃদয় কন্যাগতপ্রাণ সদানন্দময় বৃদ্ধ? নির্ম্মলার কাতর করুণ মুখের দিকে চাহিয়া কি উদ্বেগ ও শঙ্কাপূর্ণ হৃদয়ে মিঃ ঘোষ সে দিন বসিয়া ছিলেন। সে কি স্নেহকাতর, মমতাময় দৃষ্টি! যে হৃদয়হীন দাম্ভিক বর্ব্বরের অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের সুখের সংসার ছারখার হইয়া গিয়াছে, এ কি সেই ব্যক্তি? অসিত কিছুই বুঝিতে পারিল না। নির্ম্মলা একটু সুস্থ হইবার পর হইতে মিঃ ঘোষের সেই সরল, স্বচ্ছন্দ আলাপ, কথায় কথায়, কারণে অকারণে তাঁহার প্রাণখোলা উচ্চ হাসি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর তাহার পরিচয় পাইবার পর? অসিত অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল!

তাহার পরিচয় পাইয়া কি ঘোর লজ্জা ও অনুতাপের তীব্র জ্বালা মিঃ ঘোষের প্রসন্ন মুখে না ফুটিয়া উঠিয়াছিল? সেই অনুতপ্ত, কুণ্ঠা ও লজ্জায় নতশির বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাঁহার এত দিনের অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে হইবে! অসিতের তরুণ বীর-হৃদয় এ চিন্তায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। নিজের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে সে কখনো পশ্চাৎপদ নয়, কিন্তু এ যে একেবারে মৃতের উপর অস্ত্রাঘাত! যে নিজেই তাহার কৃত কর্ম্মের অনুশোচনায়

মরিয়া আছে, তাহার উপর আবার সে কেমন করিয়া আঘাত করিবে! আর নির্ম্মলা? সে হয় ত এ সব বিষয়ের কোন কথা ঘুণাক্ষরেও জানে না; অথচ এ ব্যাপারের সমস্ত ফলাফল সেই নিরপরাধিনীর ভাগ্যেই অতর্কিত বজ্রাঘাতের মত এক দিন পতিত হইবে!

অসিত অনেক ভাবিয়াও এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তাহাদের সমিতির আদেশে তাহাকে নিজের ব্যাপারের মীমাংসা স্থগিত রাখিয়া পাঞ্জাবে চলিয়া যাইতে হইল! সেখানে ও অন্যান্য স্থানে এই তিন চার মাস অক্লান্ত ভাবে কাজ করিয়া সে সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে আবার পশ্চিমে ফিরিয়া আসিয়াছে!

সেদিন দানাপুর হইতে ফিরিবার পথে সহসা নির্ম্মলার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে আবার তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার সহিত যে হৃদয়হীনের মত নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এ কয় দিন তাহার সকল কাজের মধ্যে, সকল চিন্তার মধ্যে তাহা কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিয়া, তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। নির্ম্মলার সেবাপরায়ণ চিত্তের যে উদ্যত সেবা প্রত্যাখ্যান করিয়া সে চলিয়া আসিয়াছিল, সেই অসমাপ্ত, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি, অনুক্ষণ তাহার অন্তরে বুভুক্ষিতের মত তীব্র দহনের জ্বালা জ্বালাইয়া রাখিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল। রৌদ্রকরদীপ্ত নির্ম্মল নীলাকাশে সহসা যেন কাহার ওই রক্তহীন, স্তব্ধ পাণ্ডুবর্ণ মুখের ছবি ফুটিয়া উঠে। অলস মধ্যাহ্নে ঝাউবনের মর্ম্মর ধ্বনির মধ্যে বাতাসে যেন থাকিয়া থাকিয়া কাহার আকুল আর্ত্তস্বর ভাসিয়া উঠে—দাঁড়ান! একটু দাঁড়ান! অসিত বাবু! কোথায় যান? এ কি তাহার হইল? কিসের এ ব্যথা? কিই বা সে এখন করিবে?

যাহার রক্তের জন্য সে তাহার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহার কথা মনে হইলেই এখন একটা অবাধ করুণার উচ্ছ্বাসে তাহার মনের জিঘাংসাবৃত্তি ডুবিয়া যাইতে চায়। অসিত প্রাণপণ বলে আপনাকে সংযত করিয়া পূর্ব্বের সেই কঠোর প্রতিশোধস্পৃহা জাগাইয়া রাখিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিল!

সেদিন সে মিঃ ঘোষের বাড়ীর আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া কি এমন অন্যায় কাজ করিয়াছে? যে তাহাদের বংশের শত্রু, তাহার মাতার সম্মান-অপহারক, তাহাদের সর্ব্ব দুঃখের মূল, সে কি নারীর মোহে পড়িয়া, সে-সব পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়া, কুকুরের মত তাহারই গৃহে, তাহারই অন্ন গ্রহণ করিতে পারে? সে যাহা করিয়াছে, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য ও করণীয়। নির্ম্মলা অবশ্য এ ব্যাপারে নিরর্থক যন্ত্রণা পাইবে; কিন্তু তাহাতে অসিতের কি করিবার আছে? আজ সে নির্ম্মলার কথা ভাবিয়া এত ইতস্ততঃ করিতেছে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে সে যখন শিশু ছিল, তখন কি তাহার কথা ভাবিয়া কেহ তাহার নির্দ্দোষ মহাপ্রাণ পিতাকে এমন পৈশাচিক ভাবে উৎপীড়িত করিতে কোন দ্বিধা করিয়াছিল? তবে আজ তাহারই বা এ দুর্ব্বলতা কেন? নির্ম্মলার চিন্তাই বা কেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে? সে তাহার কে? নির্ম্মলার সঙ্গে তাহার কিই বা সম্বন্ধ? অসিত নির্ম্মলার কথা ভুলিয়া নিজের কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল!

এই কয় বৎসরের মধ্যে সমিতির আদেশে সে ত কতবার কত জনকে হত্যা করিয়াছে! তখন ত তাহার মনে কখনো কোন দ্বিধা হয় নাই,—হত ব্যক্তির পরিবার বা পুত্র-কন্যার অবস্থার কথা কোন দিন তাহার মনে উদিত হয় নাই! মিঃ ঘোষের বেলায় বা তাহার এত ভাবিবার কথা কি আছে? তাহার এত দুর্ব্বলতা, এত ভাবনা—এ কি কেবল নির্ম্মলার জন্যই নয়? নির্ম্মলার মোহ এই সামান্য কয় দিনে তাহাকে এমন অভিভূত করিয়াছে যে, সে স্বচ্ছন্দে তাহাদের এত দিনের এত দুর্দ্দশা, এত অপমান ভুলিতে বসিয়াছে! সে কি তাহার মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার শেষ আদেশ এত সহজে, এত অনায়াসে ভুলিয়া যাইবে! যে মায়ের স্নেহের কোলে সে এ পৃথিবীর আলো প্রথম দেখিয়াছিল, যে মায়ের হৃদয়ের রক্তধারায় সে এত দিন পুষ্ট হইয়াছে, তাহার সেই স্নেহময়ী জননীর অতৃপ্ত আত্মা যে তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণামের প্রতিশোধের আশায় তাহারই প্রতি চাহিয়া আছে! এত বড় কুসন্তান সে! এত অনায়াসে সে তাহার মায়ের স্মৃতির অবমাননা করিতে বসিয়াছে!

অসিতের ধমনীতে খরবেগে রক্ত বহিল। ক্ষণিকের মোহ ও দুর্ব্বলতা ভুলিয়া সে আবার পূর্ব্বের মত সাহস ও শক্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—এ প্রলোভন যে তাহাকে জয় করিতেই হইবে! (ক্রমশঃ)

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

(২)

রেল ষ্টীমার ডাক টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি

প্রাচীন কালে জল, স্থল ও শূন্য-পথে, এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার জন্য, অথবা দূরস্থিত স্থানে সংবাদ বা পত্রাদি প্রেরণের জন্য রেল, ষ্টীমার, মোটর, টেলিগ্রাফ্ বা ইহাদের সদৃশ অপর কোন যানাদি অথবা আধুনিক ডাকের মত কোন ব্যবস্থা এ দেশে ছিল কি না, সে বিষয়ে গবেষণা করা

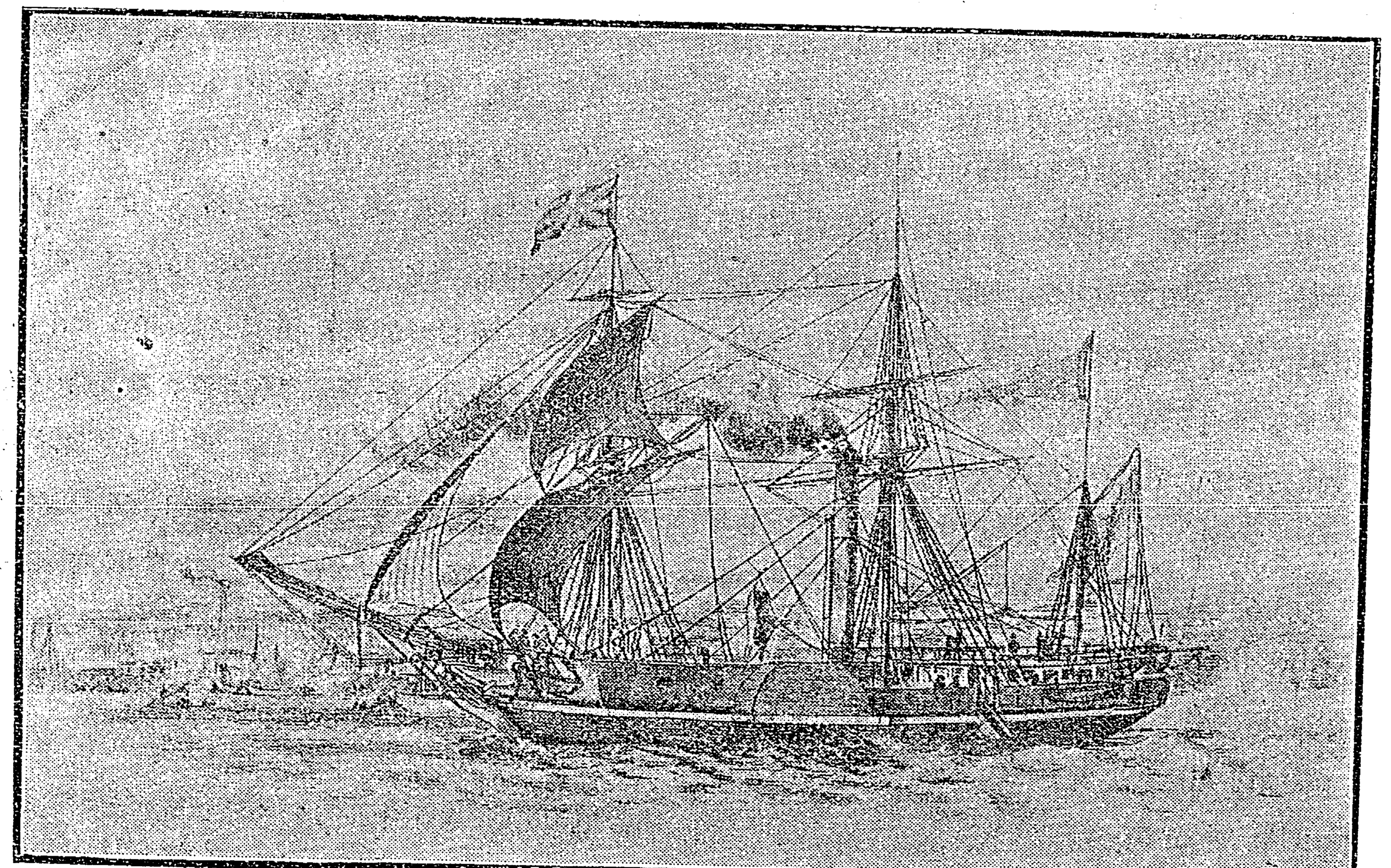

বাষ্পীয় জাহাজ—'এণ্টারপ্রাইজ'

(ইহাই প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ বিলাত হইতে এদেশে আইসে।)

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ দেশ বৃটীশ শাসনে আসার পর এখানে এই সকলের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে পুরাতন কথা, এবং ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে তৎস্থলে যে সব ব্যবস্থা ছিল, তাহার কোন কোন কথা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা বলাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জলপথে নৌকা, পান্‌সি, স্লুপ, বজরা, এমন কি সমুদ্রগামী জাহাজের এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলন ছিল ও এখনও অনেক আছে। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাষ্পীয় পোতের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার ঠিক পূর্ব্বে, যে কারণেই হোক, এ দেশে এই নৌ-শিল্পের যে অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনকার মত বাষ্পীয় পোতের ব্যবহারের অনেক পূর্ব্বেও ভারত-সমুদ্রে ইয়োরোপীয় জাহাজের গমনাগমনের কথা জানা যায়।

খৃষ্ট-জন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহুদি দেশসমূহের সহিত

ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। তাহার পূর্ব্বে বাণিজ্য বিষয়ে ভারতের সহিত ইয়োরোপের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পোর্টুগীজ্ বণিকদের আগমনের বহু পূর্ব্বে রুষ দেশীয় বণিকগণ এ দেশ হইতে মূল্যবান রেসমী বস্ত্র, উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্, শাল, মশলা ও ঔষধাদি লইয়া যাইত বলিয়া জানা যায়। (১) তৎপরে মিশর ও আরব বণিকগণের দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যার্থ আগমনের বিষয় জানা যায়। তাহাদের পণ্যও জাহাজে করিয়া যাইত।

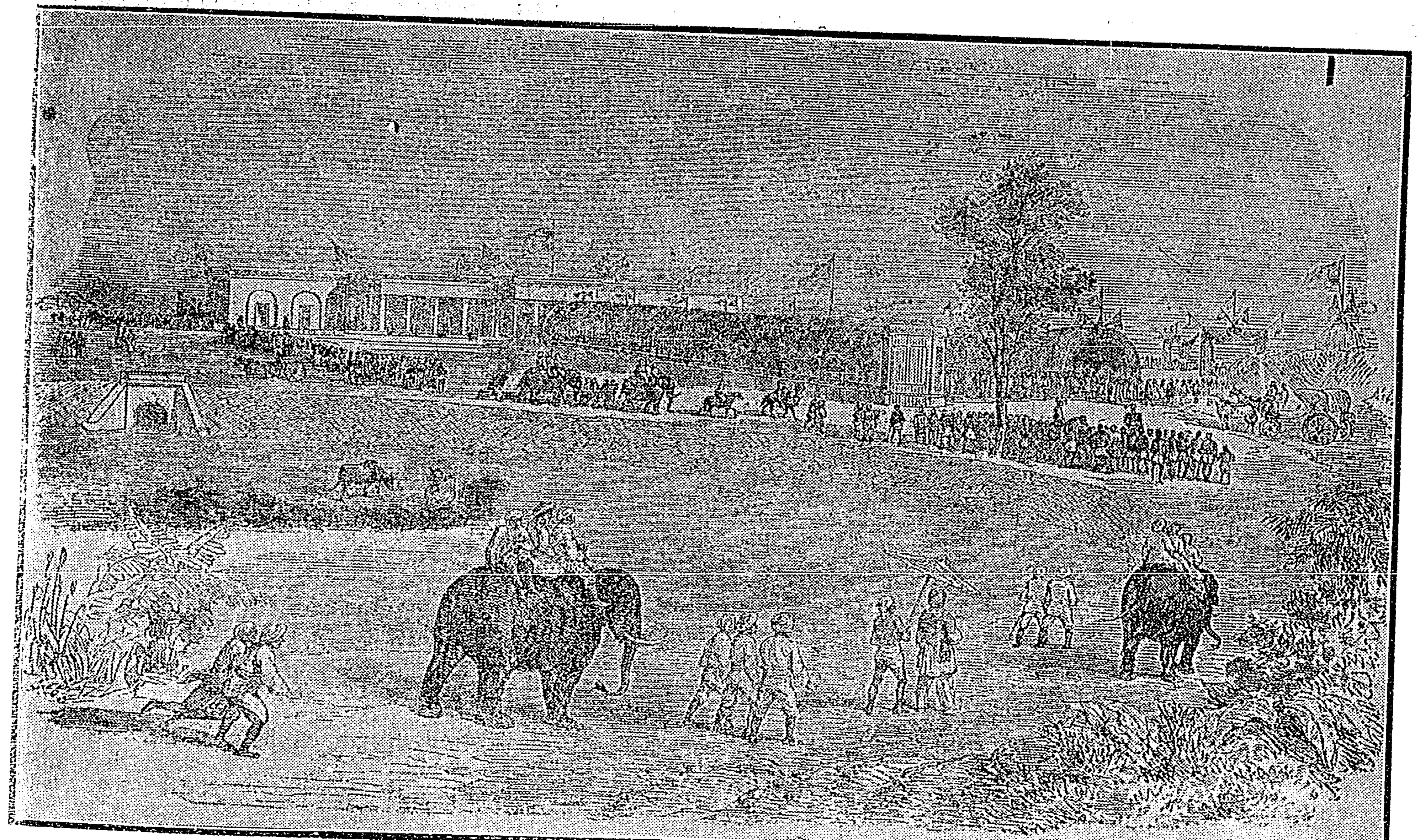

যে দিন প্রথম রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল খোলা হয় সে দিন বর্দ্ধমানে উৎসব দেখিবার জন্য লোক সমাগম

পোর্টুগীজ্ নাবিক ভাস্‌কোডি গামা ইংরাজি ১৪৯৮ সালে জলপথে মালবারে পৌছেন এবং কালিকাটে অবতরণ করেন। তাহার পর বৎসর পোর্টুগালের রাজা কর্তৃক ক্যাব্র্যাল (Pedro Alvarez Cabral) এর অধিনায়কত্বে ১২০০ লোক সহ ১৩খানি জাহাজ প্রেরিত হয়। তাহার মধ্যে ৭ খানি মাত্র কালিকাটে আসিয়া পৌঁছায়। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আরও ২২ খানি জাহাজ আসিয়া পৌঁছে বলিয়া জানা যায়। (২)

প্রথম যে বৈদেশিক রণতরী ভারতে আইসে বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা বৃটিশ রণতরী। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টারের (Lancaster) অধিনায়কত্বে ৫ খানি রণতরী আসিয়াছিল। (৩) হুগলী নদীতে সুতানুটীর শেঠদের সহিত ব্যবসা সম্পর্কে আরও পূর্ব্বে ইং ১৫৩০এ বৈদেশিক ব্যবসায়ী জাহাজ আসিত বলিয়া জানা যায়। (৪) সাম্প্রাও (Samprayo) নামক একজন পোর্টুগীজ ১৫৩৭ বা ৩৮ খৃষ্টাব্দে ৯ খানি জাহাজ লইয়া প্রথম হুগলীতে আইসে। (৫)

বঙ্গে প্রদেশে জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল এবং প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তথায়

(১) The Three Presidencies of India.

(২) Cassell's Illustraled History of India, vol. II.
(৩) The Three Presidencies of India.
(৪) The Calcutta Review 1891.
(৫) The Calcutta Review 1892.

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ডক্ নির্ম্মিত হয়। সুরাট্ ও দ্যামান নামক স্থানেও বিস্তর জাহাজ প্রস্তুত হইত। এই শেষোক্ত স্থান হইতেই প্রথম প্রথম বাঙ্গালায় বিশেষ লাভে জাহাজ সরবরাহ করা হইত। ১৭৯০ হইতে নাগাইদ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন বন্দরের জন্য দ্যামানে মোট প্রায় ১৬০০০টন ভারবাহী ৩১ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আরব ও অন্যান্য প্রদেশেও এই স্থান হইতে জাহাজ সরবরাহ করা হইত। এই সমস্ত জাহাজের নির্ম্মাতা ছিল একজন হিন্দু। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বোম্বাইয়ে যে ব্যক্তি এই শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি একজন পার্শি। সামান্য সূত্রধর হইতে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জেম্‌সেট্‌জি।

সেকালের ডাকবাহী ৩ ঘোড়ার গাড়ী

বাঙ্গলার ডক্ নির্ম্মাণের জন্য প্রথম প্রস্তাব হয় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। ১৭৮০তে উহার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হয়। ডকের নিকটেই একটি উইণ্ড মিল্ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আবরু নষ্ট হয় বলিয়া, স্থানীয় লোকেরা আবেদন করায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

কলিকাতায় প্রথম যে দুইখানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, উহা ১৭৬৯ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে। কর্ণাটের দুর্ভিক্ষের জন্যই তৎপরতার সহিত জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্য বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম যে যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম নন্‌সাচ্ (Nonsuch)। উহা ৪৮৩ টন ভারবাহী, উহাতে ৩৮টি কামানের স্থান ছিল। ইহার আট বৎসর পরে সারপ্রাইজ (Surprize) নামক আর একখানি ৩২ কামানের যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মিত হয়। ইহা দেশীয় কারিগরদের দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছিল। (৬) সুপ্রসিদ্ধ পর্যাটক গ্রাঁপ্রী (Grandpre) ১৭৮৯।৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, কলিকাতায় খুব বেশী পরিমাণে সেগুন কাষ্ঠের জাহাজ নির্ম্মিত হইত; এবং উহা বিলাতি ওক কাষ্ঠের অপেক্ষা মজবুৎ হইত।

১৭৮১ হইতে নাগাইদ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ২৭খানি এবং তৎপরে ২১ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার সন্নিকটে মোট ২২৩ খানি জাহাজ নির্ম্মিত হয়। উহারা মোট ১০১৯০৮ টন ভার বহন করিত। কলিকাতা ভিন্ন টিটাগড় ও অন্যত্রও জাহাজ প্রস্তুত হইত। এই সময় হেষ্টিংস্, কাসল্, হাণ্টলি, ভ্যান্সিটার্ট নামক কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জাহাজ ইংরাজ কোম্পানীর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকলের উপাদান প্রধানতঃ সাল ও সেগুন কাষ্ঠ ছিল। (৭) নৌশিল্পের উন্নতির জন্য ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্ত্তৃক আমদানী কাষ্ঠের উপর শুল্ক আদায় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সালিখায় যে ডক্ আছে উহা মিঃ বেকন নামক এক ব্যক্তির দ্বারা ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রথম যে জাহাজখানি সংস্কৃত হয় তাহার নাম অরফিয়াস্। (৮) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কোন্নগরে একটি ডক্ ছিল, তথায়

(৬) The Hand Book of India.

(৭) The Good Old Days of Honourable John Company ও The Hand Book of India.

(৮) The Good Old Days of Honourable John Company,

ছোট ছোট জাহাজ নির্ম্মিত হইত। (৯) রিষড়ায় সময় সময় ডেনিস্ জাহাজ লাগিত। (১০) মৌলমেনে জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্য ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ১ পিপা মদের ভাড়া ছিল ১৫ পাউণ্ড, এবং অন্য অধিকাংশ মালের ভাড়া টনপ্রতি ৩০ পাউণ্ড ১০ শিলিং ছিল। ঐ সময় আমদানী মালের উপর মাশুল টনপ্রতি ৭॥ পাউণ্ড এবং রপ্তানী মালের উপর মাশুল টনপ্রতি ২॥ পাউণ্ড হিসাবে কমাইয়া দেওয়া হয়।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ খিদিরপুরে এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম বাষ্পচালিত পোত চালান হয়। প্রথম দৈনিক যাত্রী ষ্টীমার ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়া হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত খোলা হয়। যে দুইখানি ষ্টীমার প্রথম চলাচল করিত, তাহাদের নাম কমেট্ (Comet) ও ফায়ারফ্লাই (Firefly)। তখন প্রতি আরোহীর ভাড়া ৮ টাকা লাগিত। রেলগাড়ি না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ষ্টীমারের অধিকতর সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।

ইংরাজ সরকারের আদেশে প্রথম লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্কের সময় কলিকাতায় দুইখানি ষ্টীমার নির্ম্মিত হয়। উহা কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ৮০০ মাইল ৩ সপ্তাহে যাইত। এই সময়ই বিলাত হইতে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' (Enterprise) এদেশে আইসে। উহা ১৩০ দিনে ফালমাউথ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল। (১১)

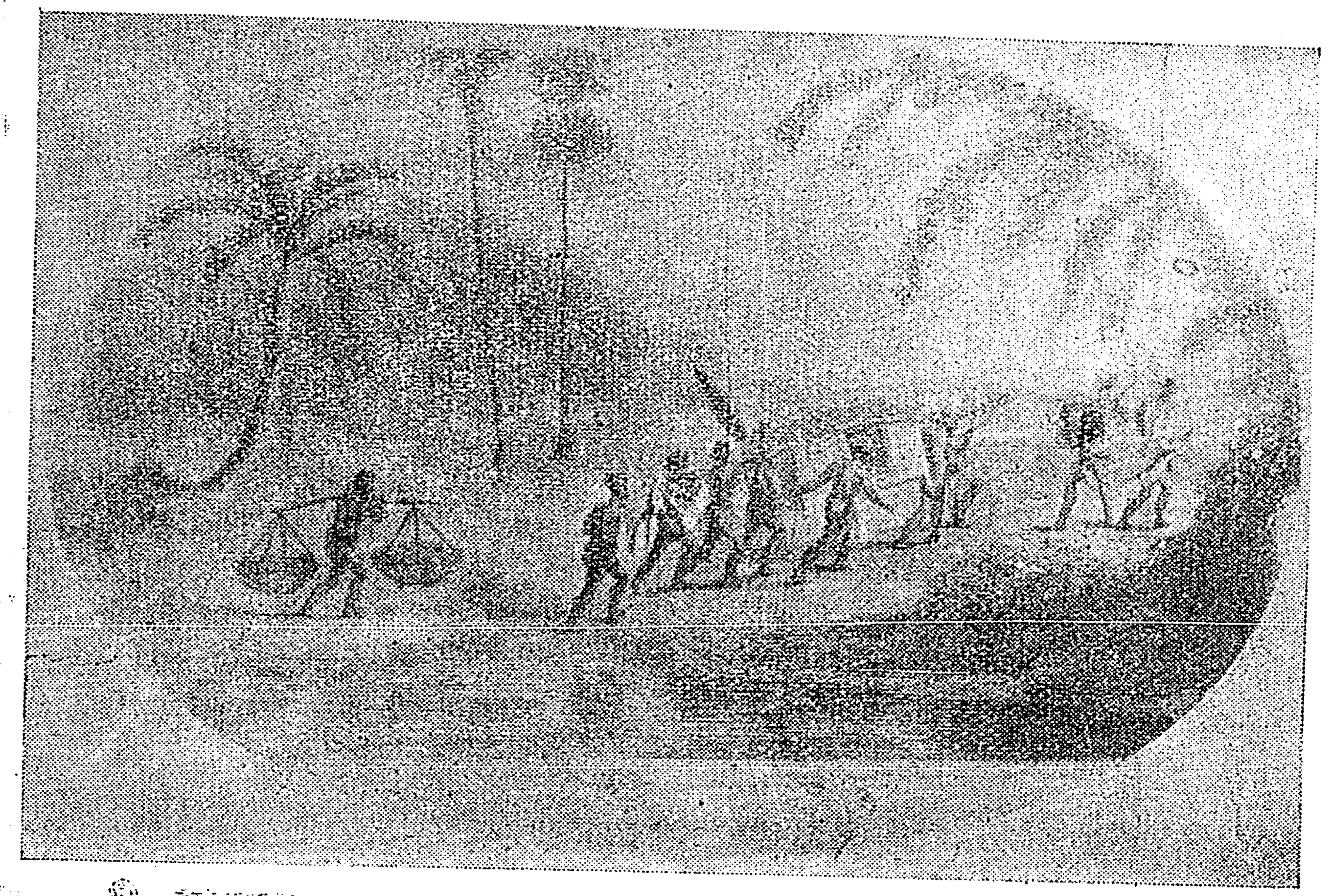

সেকালের অর্থবানদিগের নরবাহী যানে গমনাগমন

এ দেশে রেলগাড়ি হইবার অনেক পূর্ব্বেও স্থানান্তরে চিঠি পত্র পাঠানর ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বে দেশে এক শ্রেণীর লোক ছিল, তাহারা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোকের চিঠি পত্র টাকাকড়ি ও সামান্য দ্রব্যাদি পৌঁছাইয়া দিত। তাহাদের কাসিদ বলিত। পশ্চিম বঙ্গেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব অধিক ছিল। (১২) ঘোড়ার গাড়িতে ডাক লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থাও স্থানে স্থানে ছিল। মিরাট হইতে দিল্লীতে প্রথম গাড়ি করিয়া ডাক লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে কানপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়িতে ডাক যাইবার প্রথম বন্দোবস্ত হয়। (১৩)

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইবের সময়েও এ দেশে ডাকের প্রচলন ছিল এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে উহার কিছু উন্নতি হয় বলিয়া জানা যায়। ১৮৩৭ সালের পর উন্নত প্রণালীতে ষ্ট্যাম্পের প্রচলন হয়। কলিকাতা টাঁকশালের কর্ণেল্ ফরবেসের (Colonel Forbes) প্রস্তুত আদর্শ মত সিংহ ও তাল তরু অঙ্কিত দুই আনা মূল্যের টিকিট প্রথম প্রস্তুত হয়। উহা পর বৎসর হইতে চলিতে থাকে। তৎপরে বিলাতের দে-লা-রু কোম্পানী কর্ত্তৃক টিকিট তৈয়ারি হইয়া আইসে। ১৮৫৪ সালের মে মাস হইতে নাগাইদ ১৮৫৫ অব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় মোট ৪৭৭৩২৪৯৬ ডাক টিকিট প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন

(৯) Medical Gazether.

(১০) Calcutta Review, Vol. iv 1845.

(১১) The History of India, Vol. III—Marshman.

(১২) The Bengal Magazine, Vol. II, 1873-74.

(১৩) The Good Old Days of Honourable John Company.

অর্দ্ধ আনার টিকিটের বর্ণ ছিল নীল, এক আনার লাল এবং চারি আনার লাল ও নীল ছিল। (১৪) এই সময় হইতেই সস্তা ডাকের এবং সর্ব্বত্র এক হারে টিকিটের প্রচলন হয় এবং বিলাতি চিঠির মাশুলও কম হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মোট চিঠিবিলির সংখ্যা পাওয়া যায় ৩২৯১৬১৮১১। (১৫)

বৃটিশ ভারতের সহিত বাহিরের প্রথম ডাকের সম্বন্ধ প্রবর্ত্তিত হয় বোধহয় বোম্বাই হইতে মসলিপটমে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বোম্বাই হইতে প্রতি পত্রের জন্য নিম্নলিখিত মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; যথা,—পুনা ২৲, ফজিলপুর ৩৲ ৫ পাই, হায়দ্রাবাদ ৩৲ ৮ পাই; মসলিপটম্ ৪৲ ১২ পাই, মাদ্রাজ ৬/২ পাই, গঞ্জাম্ ৮/৪ পাই, কলিকাতা ৫/৯ পাই। চিঠি ডাকে দিবার সময় এই মাশুল দিতে হইত। (১৬)

এ দেশ হইতে বিলাতে প্রথম ডাক যায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। তখন হইতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে একবার করিয়া ডাক যাইতে থাকে। তখন ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া অপেক্ষা বড় আকারের বা গালা মোহর করা পত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রেরকের স্বাক্ষর সহ সরকারের সেক্রেটারি মারফৎ উহা পাঠান হইত। মাশুলের নিয়ম ছিল সিকি তোলা দশ টাকা, অর্দ্ধ তোলা পনের টাকা এবং এক তোলা কুড়ি টাকা। এই ডাক মাশুল চিঠি বিলির সময় আদায় করা হইত। (১৭)

সে সময়ের বিলাতি চিঠির মাশুলের তুলনায় এখানে মাশুল অনেক কম ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে আড়াই তোলা ওজনের চিঠির মাশুলের নিম্নলিখিত হার বিজ্ঞাপিত হয়; যথা,—বেনারস ।৵০, পাটনা ।/০, ব্যারাকপুর /০, রাজমহল ৵০, মুঙ্গের ।০, চট্টগ্রাম ।৶০, মাদ্রাজ ১৶১০, হায়দ্রাবাদ ৸০, পুনা ১।০, বোম্বাই ১॥/০, ঢাকা ৵০, ডায়মণ্ড পয়েণ্ট ৶০, কক্স দ্বীপ ।০, বাক্সার ।৶০, কটক ৵০, সুকসাগর ৶০, চন্দননগর /০, মুরশিদাবাদ ৶০, সিলেট ।/০ ইত্যাদি। (১৮)

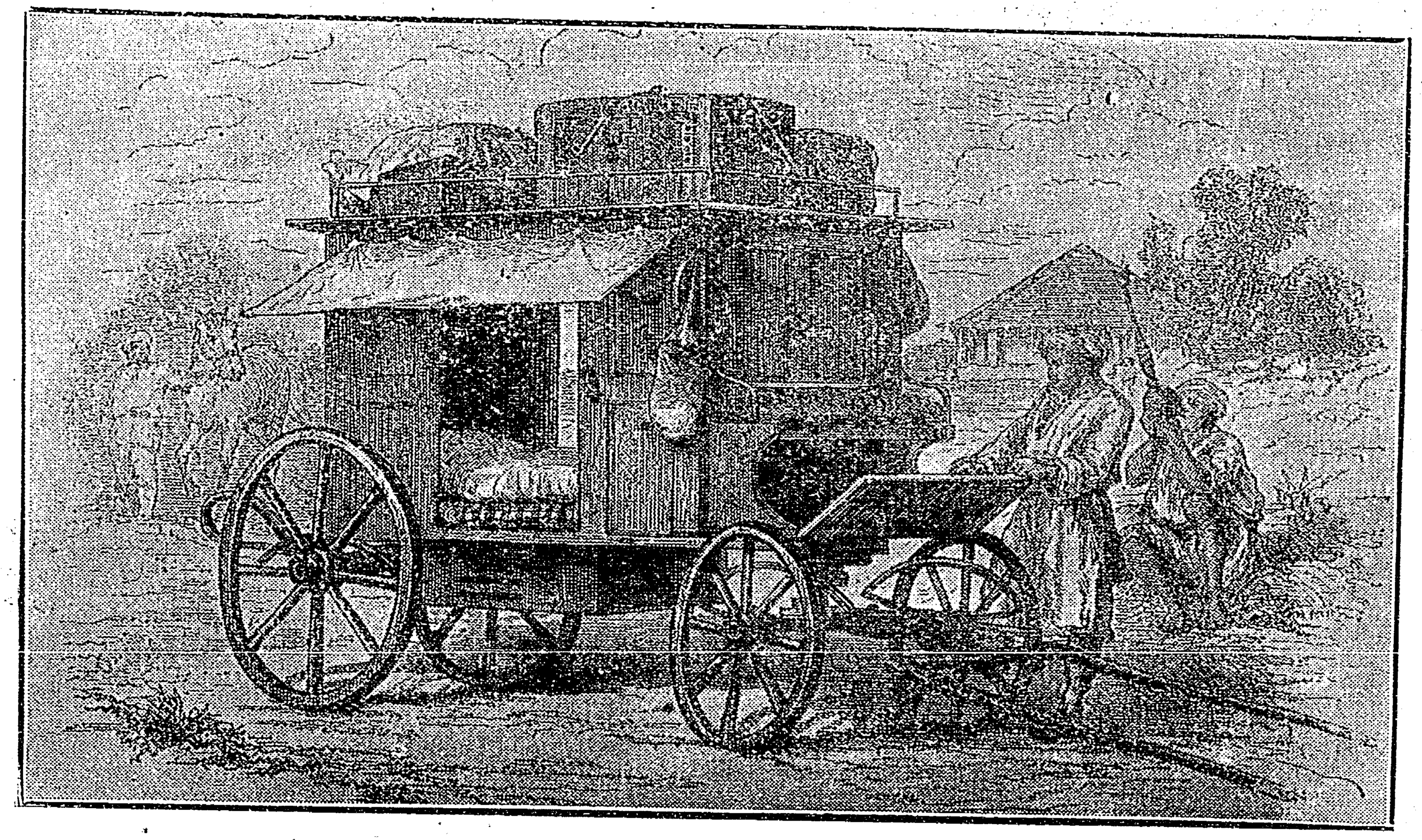

সেকালের ডাক লইয়া যাইবার গাড়ি

(১৪) Bengal Past and Present, vol—x.

(১৫) Calcutta Review, vol—xı.

(১৬) Selections from Calcutta Gazettes of the year 1789—97.

(১৭) Selections from Calcutta Gazettes of the years 1798 to 1805.

(১৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

ভারতে তাড়িত-বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা বাষ্পীয় শকট প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বেই হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়। উহা তখন সরকারি কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। সাধারণের জন্য ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রথম তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতা হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ। (১৯) ইহার পর ক্রমেই ভারতের বহু স্থানে তাড়িতবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইতে থাকে। জানা যায় ১৮৫৭ সালে ৪১৬২ মাইল; টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয় এবং কুড়ি বৎসরের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রায় চারি গুণ বৃদ্ধি পায়। (২০)

ভারতে তাড়িতবার্ত্তা প্রচলন বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম যিনি চেষ্টিত হন, তাঁহার নাম উইলিয়ম্ ব্রুক্ (Sir William Brooke O'shanghnessy M. D.)। তিনি বেঙ্গল আর্মিতে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনিই প্রথম কলিকাতা হইতে বেদ্গীরিতে টেলিগ্রাফ লাইন বসাইয়া পরীক্ষা দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বর্ম্মার সহিত যুদ্ধকালে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। (২১)

এদেশে রেলগাড়ি চলিবার পূর্ব্বে পাল্কি গাড়ি ও নৌকা প্রভৃতিতে কিরূপ ব্যয় হইত বা কত সময় লাগিত, তাহা এখনকার দিনে জানিতে কৌতূহল হয়। উড়িয়াদের এদেশে আসিয়া পাল্কির বেয়ারার কাজ করার প্রথা বহু দিন হইতেই প্রচলিত আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক ঠিকা উড়িয়া বেয়ারাদের পারিশ্রমিকের দৈনিক হার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; ৫ জন ঠিকা বেয়ারা সিক্কা ১৲ টাকা, অর্দ্ধদিন ॥০। সূর্য্যোদয় হইতে ১২টা এবং ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত অর্দ্ধদিন ধরা হইত। দূরত্ব হিসাবে ৫ মাইলের অনধিক দূর যাইবার মজুরি প্রতি বেয়ারা চারি আনা। ৮ মাইল একদিন ধরা হইত (২২) সেকালে পাল্কির মত দেখিতে অথচ চাকা বিশিষ্ট এক প্রকার ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল, উহাকে ডাক বলিত। (২৩)

দূরদেশে স্থলপথে যাইতে ঘোড়া ও হস্তী ভিন্ন পাল্কিই প্রধান অবলম্বন ছিল, কিন্তু উহা কিরূপ ব্যয়সাধ্য ছিল, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতা হইতে চন্দননগর ও গরুটী ২২॥ নাগাইদ ২৪॥ টাকা, কাশিমবাজার ও মুরশিদাবাদ ১৪৭॥ নাগাইদ ১৪৯॥ টাকা, রাজমহল ২৩৮৸ নাগাইদ ২৫৭৸, পাটনা ও বাঁকিপুর ৫০০৲ নাগাইদ ৫৪০৲, বেনারস ৭০৭॥ নাগাইদ ৭৬৪৲ টাকা পাল্কির ভাড়া ছিল। (২৪) এই সময়ে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া কিরূপ ছিল তাহা নিম্নপ্রদত্ত তালিকা হইতে জানিতে পারা যায়। ক্রিষ্টোফার্ ডেক্সটার্ (Christopher Dexter) নামক একজন ভাড়াটিয়া গাড়ির কারখানাওয়ালার ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারির একটি বিজ্ঞাপনে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল। চারি ঘোড়ার গাড়ি প্রতি দিন ভাড়া ২৪৲, মাসে ৩০০৲। দুই ঘোড়ার গাড়ি প্রতি দিন ১৬৲ মাসে ২০০৲। ছয় মাসের জন্য মাসিক ১৫০৲। এক বৎসরের জন্য মাসিক ১৩৩/৪ পাই। কেবল মাত্র ২টি ঘোড়া প্রতি দিন ১০৲, মাসে ১৬০৲, ছয় মাসে মাসিক ১১০৲ টাকা। বগি ও ঘোড়া প্রতি দিন ৫৲, মাসে ১০০৲, ছয় মাসে মাসিক ৮০৲, বৎসরে মাসিক ৬৪৲ টাকা। (২৫)

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জলপথে নৌকার ভাড়া ছিল, ৮ জন দাঁড়ির বজরা দৈনিক ২ টাকা, ১০ জনের ২॥০ টাকা, ১২ জনের ৩॥০ টাকা, ১৪ জনের ৫৲ টাকা, ১৬ জনের ৬৲ টাকা, ১৮ জনের ৬॥০ টাকা, ২০ জনের ৭৲ টাকা, ২২ জনের ৭॥০ টাকা, ২৪ জনের ৮৲ টাকা।

(১৯) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২০) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২১) Cassell's Illustrated History of India, Vol.—II.

(২২) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৩) The Hand Book of India.

(২৪) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৫) Selections from Calcutta Gazettes of the years 1798 to 1805.

৪ দাঁড়ির নৌকার মাসিক ভাড়া ২২৲ টাকা, ৫ দাঁড়ির ২৫৲ টাকা, ৬ দাঁড়ির ২৮৲ টাকা।

২৫০ মণের নৌকা ভাড়া ২৯৲ টাকা, ৩০০ মণের, (৭ দাঁড়ি) ৩৪৲ টাকা, ৪০০ মণের (৮ দাঁড়ি) ৪০৲ টাকা ৫০০ মণের (১০ দাঁড়ি) ৫০॥০ টাকা।

তখন জলপথে কলিকাতা হইতে বহরমপুর ২০, মুরসিদাবাদ ২৫, রাজমহল ৩৭, মুঙ্গের ৪৫, পাটনা ৬০, বেনারস ৭৫, কানপুর ৯০, মালদা ৩৭॥০, ঢাকা ৩৭॥০ দিন সময় লাগিত। সে সময়ে জলপথে মেসার্স্ হোমস্ এণ্ড এলেন্ (Messrs. Holmes and Allan) কোম্পানির মাল পাঠানর কাজ প্রায় একচেটিয়া ছিল। (২৬)

লর্ড ডালহাউসির শাসনকালে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ষ্টিফেন্সন্ (Mr. Rowland Macdonald Stephenson) সুপ্রিম গভর্ণমেন্টের নিকট রেলগাড়ি চালাইবার জন্য প্রথম আবেদন করেন। ইংরাজি ১৮৪৫-৪৬ সালের শীতকালে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত তিনি পরীক্ষার্থ একটা মোটামুটি সার্ভে করেন। তৎপরে তিনি বিলাত যাইয়া বোর্ট অব্ ডিরেক্টর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে তাঁহার প্রস্তাব বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করিলে, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষার্থ কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। মধ্যের ৪।৫ বৎসর কেবল মাত্র আলোচনা তর্ক বিতর্ক বাধা এবং মীমাংসা করিতেই অতিবাহিত হয়। ইহার সাফল্য সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট প্রথম বিশেষ সন্দিহান ছিলেন। এই সময়েই গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনেন্সুলা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ৫০ মাইল রেল চালাইবার অনুমতি পায়।

জর্জ্জ টার্ণবুল্ (George Turnbull) নামক প্রথম প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ষ্টিফেনসনের সঙ্গে সহকর্ম্মিরূপে থাকিয়া এ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। রেলপথের জন্য জমি সংগ্রহের সুবিধা হয় এরূপ কোন আইন না থাকায় প্রথমে বিশেষ অসুবিধা হয়। ইংরাজি ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে জমি সংক্রান্ত নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই টার্ণবুল্ তাঁহার দুইজন সহকারীর (Messrs. Purser and Evans) সহায়তায় জমিদারদের নিকট হইতে তাঁহাদের জমির উপর রেলপথ নির্ম্মাণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।

ষ্টিফেনসন্ ও টার্ণবুলের অসীম চেষ্টা সত্ত্বেও নানাবিধ অসুবিধা বশতঃ আরও দুই বৎসর বিলম্বের পর ১৮৫৩ সালের শেষে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত গাড়ি চালাইবার উপযুক্ত রেলপথ প্রস্তুত হয়। কিন্তু গাড়ীর অভাবে এবং ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর মধ্যে পড়ায় শেষোক্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত লেখালেখি করিতে প্রায় তিন বৎসর সময় যায়। ১৮৫৪ সালের জুন মাসে প্রথম এঞ্জিনখানি আসিয়া পৌঁছে এবং ২৮শে তারিখে মিঃ হজসন্ (Hodgson) উহা পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত চালাইয়া পরীক্ষা করেন। তৎপরে এই বৎসরের ১৫ই আগষ্ট হুগলী পর্য্যন্ত, ১লা সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত এবং পর বৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারি শনিবার রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পাকা রকম রেল খোলা হয়। এই বৎসর মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ৪, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮, তৃতীয় শ্রেণীর ১৭ এবং ওয়াগান্ ভ্যান্ প্রভৃতি মোট ৬৪খানি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩খানি গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার সমস্ত গুলিই কলিকাতার প্রসিদ্ধ গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানি এবং সেটন্ কোম্পানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথম যে ইঞ্জিনখানি বিলাত হইতে আসিয়াছিল তাহার নাম 'ফেয়ারি কুইন্।'

যেদিন রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম রেল খোলা হয়, সেদিন বিশেষ জাঁকজমক ও উৎসবের সহিত এই কার্য্য সমাধা হয়। এই নূতন বাষ্পীয় যান দেখিবার জন্য বর্দ্ধমান ও অন্যান্য বহু স্থানে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেলের শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা বশতঃ তিনি সমগ্র উৎসবটিতে যোগদান করিতে না পারিলেও হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রথম ভাড়া ধার্য্য হয় ১৮৶ এবং পৌঁছিতে সময় লাগে ৭ ঘণ্টা।

ভারতে নব অভ্যুদয়ের মুল বাষ্পীয় যান ও রেল লাইন প্রতিষ্ঠার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার পর সিপাহী বিদ্রোহের জন্য কিছু দিন কার্য্যের অসুবিধা হয়। তৎপরে দ্রুতগতিতে বিভিন্ন স্থানে রেলপথ ও আবশ্যক সেতু প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে থাকে। শোন নদের উপর যে সুপ্রসিদ্ধ সেতু আছে, তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য প্রথম রেল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়; কিন্তু বিদ্রোহ হেতু উহা শেষ হইতে ১৮৬২

(২৬) The Good Old Days of Honourable John Company,

সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় লাগে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে রেলপথের পরিমাণ মোট ৬৪৯৭ মাইল ছিল।

রেল খোলার পর অন্যান্য মালপত্রের সহিত কয়লা আমদানীর খুব সুবিধা হয়। পূর্ব্বে দেশীয় কয়লা এবং বিলাত হইতে জাহাজে আমদানী কয়লার দরের পার্থক্য বড় ছিল না। তখন গোযান ও নৌকাযোগে দামোদর হইয়া কলিকাতায় কয়লা আসিত। রেল খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের প্রথা তিরোহিত হইল; এবং রেলেই কয়লা আসিতে আরম্ভ হইল। ১৮৫৫ সালের ৩০শে মার্চ্চ ২৬খানি ওয়াগানে ১৪৭ টন কয়লাসহ প্রথম কয়লার গাড়ি হাওড়ায় পৌঁছায়। (২৭)

রেল ষ্টীমার ডাক টেলিগ্রাফ প্রভৃতির আদি কথা সংক্ষেপে বলা হইল। মোটরকার বা মোটর সংলগ্ন নৌকা বা ষ্টীমার এখানে প্রথম কোথায় এবং কাহার দ্বারা আনীত বা ব্যবহৃত হয়, তাহা জানিতে পারি নাই। আকাশ-পথে এরোপ্লেনে ভ্রমণ এদেশে ক্রমেই বাড়িতেছে। অদূর-ভবিষ্যতে ইহা সাধারণ যানের মত ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার সূচনা পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন প্রথায় বেলুনে উঠিয়া আকাশে বিচরণের কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে মার্চ এদেশে সর্ব্ব প্রথম বেলুন উঠে। যে ব্যক্তি এই কার্য করেন তাঁহার নাম রবার্ট্সন্। (২৮)

(২৭) (1) Bengal Past and Present, Vol.—V.—The Early Days of the East India Company.

(2) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

বিচারের অধিকার

শ্রীরমাদাস হালদার বি-এস্‌সি

(এক)

সমস্ত রাত্রি তরুণী প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করল ..... শেষে জয়ী হল তার প্রেম .....।

আজ সকালেই সে নিজেকে সংসারে সব থেকে সুখী মনে করেছিল—আর এ সন্ধ্যায় তার চেয়ে বড় দুঃখী বোধ হয় আর কেউ নেই। একটু সুখের রেখা দেখিয়ে দিয়ে দুঃখ আবার তারে নিজের কোলে টেনে নিল।

সংসারে জ্ঞানের উন্মেষ হবার পর থেকেই সে নিজেকে দুনিয়ার বুকে একলা পেয়েছে; কেউ কোথাও তার আছে বা কখনও ছিল কি না মনে পড়ে না। যখন সে এই দুনিয়ায় ভাল করে চাইতে,—ভাল করে বুঝতে শিখলে—বোর্ডিংএর ছোট্ট ঘরখানাই সে নিজের ঘরকন্না রূপে পেলে,—আর পেলে মায়ের স্নেহের আশীস্-বাণীর বদলে মিস্ গুহর মুখস্ত-করা কায়দা-দুরস্ত উপদেশগুলো। স্কুলের অন্য মেয়েদের সঙ্গেও সে ঠিক মিশতে পারত না—মিশ খেত না; আর সে মিশতেও বড় একটা চাইত না। তাই তার এ নিঃসঙ্গ জীবনে তাকে সঙ্গ দিতেছিল—তার চকচকে তকতকে বাঁধান বইগুলো, আর এক দরদী সহপাঠিনী—ছায়া।

তাকে আপন বলে ডেকে নেবার কেউ ছিল না বটে, কিন্তু মাসে মাসে বোর্ডিংএর তার সমস্ত দরকারী খরচপত্র এসে পৌঁছত—ঠিক সময়মতই বোর্ডিংএর অভিভাবকদের কাছে কোনও একটা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে। এইটুকুই সে জানত—এইটুকুতেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কে যে তার এ গোপন দাতা—সে তার এতটুকু খোঁজ করে উঠতে পারে নি, যদিচ সে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। মিস্ গুহও যে বিশেষ কিছু জানতেন তা নয়—আর যেটুকু বা তিনি জানতেন—তিনি নিজের কাছে গোপন রেখেছিলেন।

ছায়া ছিল তার সহপাঠিনী। সে থাকত বালীগঞ্জে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে;—স্কুলের বাসে চড়ে রোজ পড়তে

আসত। সে ছায়াকে আপন করে নিয়েছিল অল্প দিনের আলাপেই ; আর ছায়াও তাকে পর ভাবত না। ছায়া রেখার ব্যথার স্থানটি জানত—আর সেইটেই সে সব সময়েই বাঁচিয়ে চলত…।

পূজোর ছুটি এসে পড়েছে—মেয়েরা সব বাড়ী ফিরে চলেছে—বাড়ী ফিরবার আনন্দে সমস্ত বোর্ডিং ভরে গিয়েছে—সবাই বাড়ীর কথা কইছে—সবাই আপন আপন স্নেহনীড়ে এ আগমনীর দিনে ফিরে যাবে। স্কুলের গাড়ী একদল মেয়েকে ষ্টেশন পৌঁছে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে—গাড়ীতে মেয়েদের জিনিষপত্র তোলা হচ্ছে। মেয়েদের পুলক-ছাওয়া চপল হাসি মাঝে মাঝে কাণে আসছিল—রেখা একলা ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে এ বিদায়-দৃশ্য দেখছিল—তার নিরালা সঙ্গহারা জীবনের সঙ্গে তুলনা করছিল—আর তার চোখ উপচে জল আসছিল…।

পেছন থেকে ছায়ার কৌতুকভরা কণ্ঠ শোনা গেল—“বাবা রে বাবা! তুই যেন কি! তোকে চারিধার খুঁজে ফিরছি—আর তুই এখানে দিব্যি একলাটি দাঁড়িয়ে আছিস্…”

রেখা চোখের জল গোপন করবার চেষ্টা করলে—পারলে না। ছায়া সত্যই তাকে ভালবাসত—তার চোখে জল দেখে তার মুখখানা সন্ধ্যার মত ম্লান হয়ে গেল। ছায়া রেখার মনের গোপন ব্যথা জানত—চোখের জলের কথা চেপে দিয়ে রেখার হাত আস্তে আস্তে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে—“একটা কথা আমার রাখবি ভাই?”

“কি ভাই?”

রেখার মলিন মুখের ওপর কাতর দৃষ্টি রেখে ছায়া বলে চলল—“আগে ভাই তোকে বলতে সাহস করি নি। মা বলে দিয়েছিলেন—মিস গুহরও হুকুম নিয়ে এসেছি—তোকে ভাই এ পূজোর ছুটিতে আমার কাছে থাকতেই হবে—এ পূজোর আনন্দে তোকে এখানে রেখে একলা আমি এতটুকুও আনন্দ পাব না—”

রেখা ছায়াকে দুহাতে বুকের মাঝে চেপে ধরলে—তার চোখের পাতা দুটো ভিজে উঠল—এ দরদীর সহানুভূতিতে। সে বেশ বুঝলে—ছায়া তাকে তার সঙ্গহারা জগৎ থেকে নিজেদের জগতে টেনে এনে, তার নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী ভোলাতে চায়……

যাবার সময়ে মিস গুহ আর একবার উপদেশের থলি খুলে দিলেন—বারে বারে সতর্ক করে দিলেন, যেন misbehaviourএর complaint তাঁকে না শুনতে হয় ;—সেটা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবেন না—ইত্যাদি…।

(দুই)

সে একটা নূতন জগতের মাঝে এসে দাঁড়াল—যার স্পর্শ সে কখনও পায় নি—যা অনুভব করবার জন্য অন্তর তার মাঝে মাঝে কেঁদে উঠত। নেই এখানে তার সঙ্গহারা জীবন—না আছে এখানে মিস গুহর একঘেয়ে সতর্কতা-ভরা উপদেশ। সে একটা প্রীতির বাঁধনঘেরা স্নেহনীড়ে এসে এড়ল। ছায়ার মা তার মাথায় চুমু খেয়ে তাকে বুকের মাঝে টেনে নিলেন।

দশটি দিন—মাত্র দশটি দিন—সে এই স্নেহনীড়ে বাসা বেঁধেছিল—তার হারিয়ে-ফেলা জগৎকে সে এই দশটি দিনই মাত্র ফিরে পেয়েছিল ;—তার পর—তার পর আবার তাকে ফিরে যেতে হয়েছিল—তার বোর্ডিংএর দেওয়াল-ঘেরা ছোট্ট ঘরে তার একলার জগতে…।

এই নূতন জগতে কিন্তু তাকে ধরা দিতে হয়েছিল—। সে বোর্ডিংএ ফিরে গেল ; কিন্তু তার ছোট্ট মনটাকে পাছু ফেলে।

ছায়ার দাদা তরুণ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলো শেষ করে, বইয়ের বোঝা ঠেলে ফেলে দিয়ে বিশ্রাম নিয়েছিল। এই বিশ্রামে তাকে আনন্দ দিতে সাথী জুটেছিল দুটি—এক তার হাসি-মাখা চঞ্চল ছোট বোন ছায়া—আর দ্বিতীয় তার ছবি আঁকার বাই।

এই দুটিকে নিয়ে ছিল সে ব্যস্ত ঠিক এমনি সময়ে রেখা তার নতুন-খোঁজা তরুণ চোখের সামনে এসে দাঁড়াল……।

রেখাকে ছায়া নিজেদের ঘরকন্না দেখান শেষ করে দাদার ঘরকন্না দেখাতে নিয়ে চলল। চুপি চুপি দরজার ভারী পর্দ্দা সরিয়ে সে রেখাকে নিয়ে পা টিপে টিপে দাদার চিত্রশালায় প্রবেশ করলে— ; তরুণ শিল্পী তখন দুয়োরের দিকে পেছন ফিরে বসে নিবিষ্ট মনে ক্যানভাসের ওপরের ‘তরুণীর’ মুখে তুলি চালিয়ে তার বুকের ‘গোপন ব্যথা’ ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পাচ্ছিলেন। পা টিপে টিপে ছায়ার ঘরে ঢুকবার শব্দ যে তিনি পান নি তা নয়—এবং ছায়ার

কিছু নূতন দুষ্টুমিও বুঝতে পেরেছিলেন ; কিন্তু তিনি মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে নীরবে নতমুখে তুলি আর রং নিয়ে কাজ করে যেতে লাগলেন।

দুয়োরের পাশে একটা ইজেলের ওপর সাদা ক্যানভাস্ চড়ান একটা বড় ফ্রেম দাঁড় করান ছিল। রঙ্গিন খড়ির দু একটা লাইন ছাড়া তার সব জমিটাই সাদা ছিল ; এইটার সামনে চুপচাপ রেখাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ছায়া পা টিপে টিপে দাদার আসনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। শিল্পী গম্ভীর ভাবে তখনও তুলি চালিয়ে চলেছেন ; ছায়া ছবিখানার ওপর চট্ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বলে উঠল—“চমৎকার!”

দাদার গম্ভীর মুখে সাফল্যের সলাজ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ঘাড় না ফিরিয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“ভাল হচ্ছে রে?”

কথা কেড়ে নিয়ে চটপট ছায়া উত্তর দিল—“ভাল বলে ভাল—Superb!—ক্ষুধার্ত্তের ভাবটা এর মুখে কি চমৎকারই না তুমি ফুটিয়ে তুলেছ!—”

তরুণ শিল্পীর হাত থেকে রংয়ের তুলি পড়ে গেল—সে হতাশ ভাবে সামনের ছবির পানে চেয়ে বসে রইল—ছায়ার এ অদ্ভুত শিল্পজ্ঞান দেখে সে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে উঠতে পারলে না। মনে কিন্তু তার বেশ একটু ঘা লাগল… মেয়েটা একটু আর্ট চিনলে না…শিল্পের একটু কদর জানলে না! কোথায় তরুণীর বুকের সমস্ত ‘ব্যথা’ তার মুখে চোখে সে ফুটিয়ে তুলেছে, আর সেটা ছায়ার চোখে হ’ল কি না সামান্য পার্থিব পেটের ক্ষুধা!

দাদার এ ভাব পরিবর্ত্তনের দিকে এতটুকু লক্ষ্য না করেই ছায়া হঠাৎ চপল হাসিতে সমস্ত ঘরখান ভরে তুলে বল্লে—“ওমা—তাই ত! বেশ নামটিও যে দিয়েছ দেখছি—‘তরুণীর ব্যথা’! এত ক্ষিদে পেয়েছে যে পেট ব্যথা কচ্ছে ……।”

তরুণ আর সহ্য করতে পারলে না। মাথা নীচু করে তুলিটি জমি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে, “ছায়া, দেখ, সব সময় তামাসা ভাল লাগে না। তোমাকে মানা করে দিয়েছি, শুনবে না ; আমি যখন ষ্টুডিওতে ব্যস্ত থাকি—আমাকে বিরক্ত কর না।”

পেছনে দুয়োরের কাছে ক্যানভাসের ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে, মুখে রুমাল চেপে মুখ টিপে টিপে রেখা হাসছিল— ; চোখ, মুখ, কাণ তার চাপা হাসিতে রক্তাভ হয়ে উঠেছিল—সেদিকে চোখ পড়তেই ছায়া হাসি চেপে বলে উঠল—“যাই বল না দাদা—তোমার চেয়ে যে আমি ভাল ছবি আঁকি তার প্রমাণ আজ হাতে হাতে দেব। ঘাড়টা ফিরিয়ে একবার আমার ছবিখানা দেখ—নিশ্চয়ই তুমি তারিফ করবে।”

ছায়ার চিত্রবিদ্যার দৌড় তরুণের ভালরকমই জানা ছিল। এইবার সে ছায়াকে কোণঠাসা করতে পারবে—উৎসাহে ও আগ্রহাতিশয্যে সে ফিরে দাঁড়াল ও ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। রেখাও ভারী মুস্কিলে পড়ল—তরুণের দৃষ্টির সামনে সে নত হয়ে পড়ল—চাপা হাসি চাপতে গিয়ে সে ঘেমে উঠল।—

তরুণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল বটে, কিন্তু পলকহীন চোখে সে চেয়ে রইল। তার শিল্পীর চোখ বলল—হাঁ, ছবি বটে! ক্যানভাসের বুকে একে যদি ঠিক এমনি ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পার তবেই তুমিই শিল্পী!

ছায়ার দুষ্টু হাসিতে তরুণের চমক ভাঙ্গল— ; সে অপ্রতিভ হয়ে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে রং আর তুলি নিয়ে খেলতে সুরু করল। রেখাকে টেনে এনে দাদার হাত থেকে রং আর তুলি কেড়ে নিয়ে ছায়া তার পরিচয় দিল—“এ রেখা—আমার সহপাঠী ও একমাত্র সাথী।”

এই তাদের প্রথম দিনের পরিচয় ; দশদিনে দুজনে ক্রমশঃ কাছে এসে পড়েছিল—এমনি সময়ে রেখার ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—রেখা বোর্ডিংএ ফিরে গেল।

(তিন)

স্কুলের বাসে করে ছায়ার স্কুলে যাওয়া বা বাড়ী ফেরা দাদার আর পছন্দ হ’ল না। হুকুম হ’ল—বাড়ীর ‘কারে’ করে যাবে ; আর তরুণ নিজেই পৌঁছে দিয়ে আসবে ও ফেরত আনবে।

মা আপত্তি তুললেন—বললেন, “তুই কেন বাপু—বাড়ীতে সোফার বসে থাকতে—এত কষ্ট করবি? স্কুলের গাড়ীতে করে যাওয়া আসা তোর পছন্দ না হয়, বেশ ত সোফারকে বলে দিস—”

মার কথা শেষ হতে না দিয়েই তরুণ বুঝিয়ে দিলে—“তুমিও যেমন মা—এতে আর কষ্ট কি?—দেখেছ না, চুপচাপ ঘরের কোণে বসে থেকে থেকে শরীর কি রকম হয়ে যাচ্ছে।

না কিছু খেতেই পারা যায়—ক্ষিধেই হয় না তার খাব কি। —এতে একটু বেড়ান হবে—শরীরটা হয়ত একটু ভাল হলে যেতে পারে—" ইত্যাদি।

তরুণ মায়ের তুর্ব্বল স্থানটিতে আঘাত করেছিল;—তিনি আর আপত্তি কল্লেন না—পুত্রের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনায় মালাছঁড়াটা মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে পড়লেন।

ছায়া মুখ টিপে একটু হাসলে…।

স্কুলের ছুটির পর তরুণের সোজা ছায়াকে নিয়ে বাড়ী ফেরবার চাইতে রেখাকেও সঙ্গে নিয়ে, স্বাস্থ্যের কল্যাণে বেড়াতে যাবার সখটা ভয়ানক চেপে ধরল—আজ বোটানিকাল গার্ডেন্—কাল জু, এমনি করে সে সারা কলকাতা সহরটা চলে বেড়াতে লাগল।—

ছায়া প্রথম প্রথম আপত্তি তুললে না। তুচার দিন পরে হঠাৎ একদিন রেখাকে একটা টিপুনি দিয়ে আপত্তি তুলে বসল—"দাদার না হয় ক্ষিদে হয় না—শরীর ভাল নেই—স্বাস্থ্যের কল্যাণে এবং ক্ষিদে বাড়ানর জন্য বেড়ানটা দরকার; কিন্তু আমরা তুটি প্রাণী যে স্কুল থেকে সোজা বেরিয়ে না খেতে পেয়ে মারা যাই—"

তরুণ লজ্জা পেলে। পর দিন থেকে তুজনের জায়গায় চার জনের খাবার ভরা টিফিন্-বাস্কেটটা সঙ্গে আনতে ভুল করত না। ছায়ার আর আপত্তির কোন কারণ রইল না।

যেদিন ছায়ার সঙ্গিনীর বেড়াতে যাওয়া হয়ে উঠত না, সেদিন তরুণের আর বেড়াতে যাবার এতটুকু উৎসাহ থাকত না; এদিক ওদিক তুটো রাউণ্ড দিয়ে তার মাথা ধরে উঠত—অমনি সে আবিষ্কার করে ফেলত তার পেট্রলও বড় শীঘ্র ফুরিয়ে এসেছে—সে সোজা বাড়ী ফিরত। ছবির ঘরে ঢুকে অযত্নে-ফেলে-রাখা ছবিগুলোর ধূলো ঝেড়ে সে আবার ছবি আঁকতে বসত—।

(চার)

এমনি করেই তাদের দিনগুলো কাটছিল…।

আজ সকালে রেখার নিরালা জীবনের সব থেকে শুভ মুহূর্ত্ত গিয়েছে—সে শিল্পীর প্রণয়-নিবেদন পেয়েছে; ঠেকিয়ে রাখবার মত তার আর কিছুই ছিল না। সে আগে থেকেই নিজেকে বিলিয়ে রেখেছিল—তাকে তার প্রিয়ের প্রণয়-পাশে ধরা দিতে হয়েছে…।

তার তুঃখের জীবনের তুঃখের বোঝা নেমে গিয়েছে—তার সুখের নদী আজ কানায় কানায় পূর্ণ—।

বিকেলে সে তার ছোট্ট আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছোট্ট মুখখানা বারে বারেই দেখছিল; আর তারই পাশে তরুণের মুখখানা কল্পনায় টেনে এনে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠছিল…দরজায় ঘা পড়ল—খবর এল, মিস্ গুহ ডাকছেন।

নেমে এসে সে মিস গুহর ঘরে গিয়ে ঢুকল। মিস্ গুহ গম্ভীর মুখখানাকে আরও কতকটা অস্বাভাবিক গম্ভীর করে, তাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তার পর অনেকখানি জবরদস্তি কেসে বিস্তর ভূমিকা করে তুখানা চৌকো মোটা লেফাফা তার দিকে ঠেলে দিয়ে জানালেন, তার সাত বৎসর বয়স থেকে তাঁরা তার প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার পান—এত দিন পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত ভাবেই তাঁরা তা পালন করে এসেছেন। সে এখন পূর্ণবয়স্কা ও সাবালিকা। আজ তাঁরা এটর্ণির অপিস থেকে পত্র পেয়েছেন ও সমস্ত হিসাবপত্র মিটিয়ে পেয়েছেন। এ তুখানা পত্রও তার জন্য সেখান থেকে এসেছে। সে এখন স্বাধীনা—ইচ্ছা করলেই সে বোর্ডিং থেকে চলে যেতে পারে। তবে তিনি আশা করেন—তাঁদের এত দিনের যত্নের শিক্ষা বৃথা যাবে না—সে এত শীঘ্র লেখাপড়া ছেড়ে চলে যাবে না। আরও তিনি আশা করেন, তার জীবনের সমস্ত ইতিহাস, যা জানবার জন্য সে এত উৎসুক, সমস্তই সে এই পত্র তুখানায় পাবে। সমস্ত পড়ে ভাল বুঝে সে তার কর্ত্তব্য স্থির করবে।

পত্র তুখানা নিয়ে সে ধীর পদে ওপরে চলে এল—ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রথম পত্রখানা—যেটাতে এটর্ণি আপিসের ছাপ-মারা, সেইটাই সে আগে খুললে। পত্রখানা ছোট—পড়তে তার বেশী সময় নিল না। পত্রে ছিল—

প্রিয় মহাশয়া,

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পুরাতন মক্কেল আপনার অভিভাবিকার নিকট হইতে আমরা আপনার এবং আপনার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তির ভার পাই।—আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রভৃতি দেবার জন্য আমরা অনুরুদ্ধ হই—এবং আপনি স্বাবালিকা হইলে যেন সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়—আমাদের উপর এইরূপই আদেশ ছিল। প্রথম অনুরোধ আমরা খুবই বিশ্বস্তভাবে পালন করিয়াছি—

আপনি এখন সুশিক্ষিতা এবং সাবালিকা। যত সত্বর সম্ভব সুবিধামত আমাদের আপিসে আসিয়া দেখা করিলে, আমরা দ্বিতীয় আদেশ পালন করিব—সমস্ত সম্পত্তি আপনাকে বুঝাইয়া দিব।

আপনার এবং আপনার বিষয়-সম্পত্তির ভার নেবার প্রায় চার বৎসর পরে সঙ্গের পত্রখানি আমাদের হাতে আসে। আপনার অভিভাবিকা মৃত্যুশয্যায় পুরী হইতে ইহা আমাদের নিকট পাঠান। আমাদের উপর আদেশ ছিল—আপনি পরিণত বয়স্ক হইলে ইহা আপনাকে যেন দেওয়া হয়। আমরা আদেশ পালন করিলাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত
ইত্যাদি ইত্যাদি
এটর্ণিজ্-এট্ ল।

এই পত্রখানা খুলে পড়ে দ্বিতীয় পত্রখানা খোলবার তার সাহস চলে গেল। সে স্থানুর ন্যায় নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

পত্রখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ সে নাড়া চাড়া করলে। কেমন যেন একটা অজানা ভীতি তাকে ঘিরে ধরলে। এতে আছে তার অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস—তার হারিয়ে-ফেলা জগতের সঙ্গে বাঁধন—প্রায় আঠার বৎসর পরে তাকে কবর খুঁড়ে তোলা হচ্ছে…কিজানি…কি আছে…কে জানে।

অনেকবার মনে তার দ্বিধা এল—কাজ নেই—কাজ নেই…সে জানতে চায় না—সে নূতন জগৎ পেয়েছে—তাকে সে আঁকড়ে ধত্তে যাচ্ছে—পুরোনো হারিয়ে-ফেলা জগৎ তার হারানই থাক—কবর খুঁড়ে কঙ্কাল সে টেনে তুলতে চায় না……

এটাকে না পড়ে জ্বালিয়ে দিলেই তো তার পুরোনো জগতের সঙ্গে চিরদিনের আড়াল হয়ে যায়! সে দেশলাইয়ের কাটি জ্বাললে—কাটি জ্বলে জ্বলে তার আঙ্গুলে আগুনের তাত লাগতেই সে সেটাকে টেনে ফেলে দিলে—পুরোনো জগতের সঙ্গে তার একমাত্র বাঁধনকে সে আপন হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে না…।

ভেতর থেকে কে যেন তাকে ডেকে বললে—না—না,—তোকে জানতেই হবে—সত্যালোকে তোর স্বরূপ তোকে চিনতেই হবে—তোর প্রিয়ের—তোর বাঞ্ছিতের মঙ্গলের জন্য সত্যালোকে তোকে তোর চিনতেই হবে। সে তার অন্তরের বাণীই মানলে—তরুণের মুখখানা মনের চোখের সামনে রেখে পত্রখানা সে খুলে ফেললে। আট বৎসর আগের লেখা,…লেখা একটু মলিন হয়ে এসেছিল…কিন্তু পড়তে তার বিশেষ কষ্ট হ'ল না। সে পড়তে লাগল—

বঞ্চিতা অভাগি ছোট মা আমার!

কখন যে আমি তোকে লিখব তা ভাবিনি'—মা হয়ে মেয়ের কাছে নিজের কাহিনী যে কখন বলতে পারব তা ভাবিনি—সমস্তই আমি লুকুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ—আজ মরণ আমার শিয়রে—আমার দেবতা ঐ পরপারের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছেন—আমার ভুলটুকু ক্ষমা করে তিনি আমায় ডাকছেন—তাই তোর জীবনটা একেবারে আঁধারে ঘিরে রেখে—সেখানে গিয়েও শান্তি পাব না জেনে—আজ মরণকে শিয়রে রেখে লিখতে বসেছি।—

জীবনে একটু ভুল করে বসেছিলাম বলে কতটা শাস্তি আমি যেচে নিয়ে সয়েছি—তা যদি জানতিস! ওঃ! সব থেকে বড় শাস্তি আমি নিয়েছি তোকে বুক থেকে ছিঁড়ে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে। কাছে রাখতে সাহস হ'ল না। নিজের নিশ্বাস নিজেরই বিষে ভরা মনে হ'ল; নিজেকে বিশ্বাস করতে আর পারলাম না। তার পর তুই বড় হলে তোর মুখের দিকে চাইতাম কি করে?—তাই এটর্ণি ডাকিয়ে তোর আর বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করে ফেললাম। আমরা তাঁদের পুরোনো মক্কেল—তাঁরা সমস্ত ভার নিলেন, আমারও সমস্ত ভাবনা চুকল।

যে ভুলে আমায় এতবড় শাস্তি সইতে হয়েছে, সেই ভুলের কথাটাই বলতে চাই। কিন্তু সত্যি, একটু ভেবে দেখিস মা—শাস্তি কি আমার যথেষ্ট হয় নি?

স্বামী ছিলেন আমার দেবতা—তিনি ছিলেন সংসারে একা—আমারও পিতৃকুলে কেউ ছিল না। বিবাহিত জীবনে আমার চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেউ ছিল না। বিয়ে হবার তুবছর পরে তোমায় তাঁকে উপহার দিলাম—মা হলাম—সে কি আনন্দ—কি সুখ—কিন্তু এত সুখ আমাদের সইল না। তোমার জন্মের প্রায় এক বৎসর পরে আমার বিবাহিত জীবন শেষ হ'ল—পরের দেশের ডাকে আমায় তোমায় ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হ'ল। তোকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আমি মাটিতে আছড়ে পড়লাম।

তোমার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ছিল অগাধ—জ্ঞাতি শত্রুও ছিল অগণ্য। এ অনাথা বিধবা আর শিশু সন্তানকে আশ্রয়-চ্যুত করতে সবাই উঠে পড়ে লাগল—; আমি চারিধার আঁধার দেখলাম।

তাঁর এক বাল্যবন্ধু ছিলেন ;—তোমার পিতাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি এই বিপদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন—বন্ধুর স্ত্রী-কন্যাকে কেউ যাতে আশ্রয়চ্যুত করতে না পারে! আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

জ্ঞাতি-শত্রুরা এতে একটা নূতন ছল পেলে। আদালতে প্রমাণ করতে চেষ্টা পেলে—আমি ভ্রষ্টা……; বিষয়-সম্পত্তি আমাতে আর আমার কন্যাতে অর্শাতে পারে না…

তোমার পিতৃবন্ধু বড্ড দমে গেলেন—আমিও কিছু কম দমি নি'—কিন্তু জিদ আমার বেড়ে গেল—তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বল্লাম—বিষয় যে করেই হ'ক বাঁচাতেই হবে।

—এখন শুধু ভাবি—এ জিদটা যদি আমার না হ'ত; বিষয় যেত—যেত; তাহ'লে এতবড় ভুলটা হয়ে যেত না—জীবনভোর অনুতাপ করতে হ'ত না—বুক থেকে তোকেও ছিনিয়ে দূরে ফেলতে হ'ত না……

যাক্—বিষয় রক্ষা পেল; এই মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামে আমরা বড্ড কাছে এসে পড়েছিলাম; এই হলো আমার কাল। জীবনে সুখের স্বাদ আমি পেয়েছিলাম—কিন্তু তৃপ্তি আমার হয় নি—মেয়ের কাছে বল্‌তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে…দুজনে আচমকা হঠাৎ খেলার ছলে, মুহূর্ত্তেকের অবিবেচনায় এমনি ভুল করে বসলাম যে, সে মুহূর্ত্তের ভুল আর শোধরাবার উপায় ছিল না। এমনি অবস্থার মাঝে এসে আমরা দাঁড়ালাম যে, তাঁর আমায় বিধবা-বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় রইল না।—

তিনি মুষ্‌ড়ে পড়লেন—বন্ধুর প্রতি এ বিশ্বাসঘাতকতায় তার অন্তর ভেঙ্গে পড়ল—; আর আমি—আমি—চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলাম্।

ঠিক হ'ল বিধবা-বিবাহ মতে আমায় বিয়ে করে রেখে তিনি চিরদিনের মত আমার পথ থেকে সরে যাবেন—একটু শান্তি খুঁজতে—প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু তা আর করতে হল না—আমাদের অনাগত অনাহূত তরুণ অতিথিকে বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে আনবার আগেই—বিধাতা বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে টেনে নিয়ে গেল—রেখে গেল আমায় শুধু প্রায়শ্চিত্ত করতে…।

আমাদের ভুলের অতিথিও একবার চোখ-মেলে পৃথিবীর আলো দেখে বিদ্রূপের হাসি হেসে ফিরে গেল…।

তার পর কতবার মরতে চেষ্টা পেয়েছি—তুই আমায় আঁকড়ে ধরেছিলি—মরতে পারিনি; তোকে কোথায়—কার কাছে ছেড়ে যাব? তুই যে তাঁর রক্তের একমাত্র প্রতিনিধি—তুই যে আমার বিশ্বের দেবতার একমাত্র দান…।

বছর চারেক পরে হঠাৎ এক দিন টের পেলাম আমার দিন ঘুনিয়ে এসেছে—; মুক্তির আনন্দে প্রাণ ভরে উঠল। বিষয়-সম্পত্তি আর তোর বন্দোবস্ত আগেই করে রেখেছিলাম—তখনও ভেবেছিলাম—আমার সমস্ত জীবন তোর কাছে লুকিয়ে যাব।

পুরীতে চলে এলাম্—এইখানেই মরব বলে। আমার দেবতাকে এইখানেই আমি প্রথম পাই—আবার এইখানেই তাঁকে হারাই। নিত্য জগন্নাথ দেবের চরণ দেখছি—আর অঝোরে কাঁদছি; নিত্য সন্ধ্যার আঁধারে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে সমুদ্রের কান্নার সঙ্গে নিজের কান্না মিশিয়ে দিচ্ছি—তবু কি মনের মলিনতা ধুয়ে যাচ্ছে না?

ডাক্তার বলছে আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে—খুব বেশী ধরলেও আর এক সপ্তাহ—সাত দিন—মাত্র সাত দিন! তার পর মুক্তি—মুক্তি! ওঃ! কি আনন্দ! কাল রাতে তাঁকে দেখেছি—তাঁর অভয় বাণী শুনেছি—আমায় ক্ষমা করেছেন—আমায় বুকে টেনে নিতে গেলেন—কোথা থেকে কারা যেন এসে তফাৎ করে দিলে। নিশ্চয়ই—এ সত্যি না! হাঁরে; এ কি হতে পারে?—তিনি আমায় ক্ষমা করলেও কি সত্যি আমার কাছ থেকে তারা তাঁকে তফাৎ করে দেবে?—

আর তুইও আমায় ক্ষমা করিস মা—এত দিন তোর কাছে সমস্ত লুকিয়ে রেখেছিলাম বলে। আমায় ঘৃণা করিস নি!—দুফোঁটা চোখের জল তোর এ অনুতপ্তা মায়ের উদ্দেশে ফেলিস্।

আঃ। এ মরণের আগে যদি আর একবার তোকে বুকে জড়িয়ে ধত্তে পাত্তাম—তেমনি করে আগেকার মত সমস্ত ভুলে গিয়ে—!

অনুতপ্তা মা।

একবার, দুবার, বারবার সে পত্রখানা পড়লে। চোখে তার একফোঁটা জল ছিল না। তার পর নতজানু হয়ে বসে পড়ল বুকের মধ্যে চিঠিখানা চেপে ধরে। বুক ভেঙ্গে তার বেরিয়ে এল—'মা—মা—অনুতপ্তা মা আমার।'—

তার পর সে জ্ঞান হারিয়ে সেই খানেই ঢলে পড়ল।

(পাঁচ)

চেতনা ফিরে পেয়ে সে সমস্ত রাত্রি প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করল—শেষে জয়ী হ'ল তার প্রেম।

সে মিথ্যার আড়ালে নিজেকে ঢেকে নিয়ে বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে ধরা দেবে না—দেবে না। নিজেকে সে প্রবঞ্চনা করবে না। তার প্রিয়কে সে সমস্ত কাহিনী বলে মুক্তি চাইবে—কাঁটা হয়ে চিরজীবন সে প্রিয়ের বুকে ফুটে থাকবে না।

বাতি জ্বেলে সে তরুণকে পত্র লিখতে বসল;—চোখ দিয়ে তার ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল। এই তার তরুণকে প্রথম এবং এই তার শেষ পত্র। তরুণকে লিখলে—

"আমি মুক্তি চাই—ওগো মুক্তি চাই:—এ সঙ্গে মায়ের সে পত্রখানা পাঠাচ্ছি—পড়লে সমস্ত জানতে পারবে। আমি নিজেকে যখন ধরা দিয়েছিলাম—বিশ্বাস করো—এ কাহিনী তখন আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। আমায় ক্ষমা করো।

"আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না—কারণ দেখা পাবে না—আমি তখন বহু দূরে। আর দেখা হলেও শুধু কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। বিদায়! আমার দুঃখের জীবনে একমাত্র তুমিই যে সুখের রেখা ফুটিয়ে তুলেছিলে, হে দাতা, আমি তা ভুলব না। এই ক্ষণিক সুখের স্মৃতিই হবে আমার জীবনের সাথী।

রেখা।"

মায়ের কাহিনী আর পত্রখানা একখানা লেফাফায় বন্ধ করে সে বাতি নিভিয়ে ক্লান্ত দেহ বিছানায় লুটিয়ে দিলে শেষরাত্রে।—

সকালে ঘুম যখন তার ভাঙ্গল, তখন তার বন্ধ কপাটের ওপর দুমদাম ঘা চলেছে। দরজা খুলে দিতেই একমুখ হাসি নিয়ে ছায়া ঘরে ঢুকল। আনন্দের আবেগে সে রেখাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—"আমি বড্ড খুশী হয়েছি। দাদা আমায় সব বলেছে—" হঠাৎ সে রেখাকে ছেড়ে চমকে সরে দাঁড়াল—রেখার ছাইয়ের মত সাদা রক্তহীন মুখখানা চোখে পড়তেই।

রেখার হাত দুখানা চেপে ধরে মিনতির সুরে কান্না-ভরা কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হয়েছে ভাই!—আমায় বলবিনি—?"

রেখা বিছানায় বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল; একটা কথাও সে ছায়াকে জানাতে পারলে না। ছায়া অনুমানে বুঝে নিল সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে—দাদার সুখের নীড় বাঁধবার আগেই ভেঙ্গে পড়ে গেছে। সে কোন মতে কান্না চেপে দাদার পত্রখানা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

(ছয়)

তরুণ একখানা ছবি নিয়ে ব্যস্ত ছিল—সে রেখার। রেখা সেই প্রথম যেদিন তার ছবির ঘরের দুয়ারে ছবির মত এসে দাঁড়িয়েছিল—প্রেমিক শিল্পী সেইটিই ক্যানভাসের বুকে ফুটিয়ে তুলছিল। প্রায় শেষও করে এনেছিল। এইটিই তার রেখাকে তার প্রথম উপহার হবে বলে সে বেছে নিয়েছিল।

ছায়া ঘরে ঢুকল। আজ সত্যই শিল্পী এত তন্ময় ছিল—তার সর্ব্বেন্দ্রিয়—তার অন্তর বাহির এতটা কাজে মগ্ন ছিল যে, সে সত্যই ছায়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। ছায়া ছবির দিকে একবার চেয়েই কেঁদে ফেললে। তরুণ চমকে পেছন ফিরতেই সে ছুঁড়ে পত্রখানা ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

লেফাফার ওপরে রেখার হাতের লেখা দেখে তরুণ ব্যাকুল আগ্রহে পত্রখানা খুলে ফেললে। রেখার পত্র!—তার প্রথম পত্র! এক নিশ্বাসে সে ছোট্ট পত্রখানা পড়ে ফেললে—ব্যথার দুঃখে মুখখানা তার ম্লান হয়ে গেল—টল্‌তে টল্‌তে সে সামনের আসনখানায় বসে পড়ল।

সে তার কর্ত্তব্য মুহূর্ত্তেকে স্থির করে ফেললে—তার মুখের ওপর একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠল। মুক্তি! মুক্তি!! নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তার মুক্তি চাইবার অধিকার?

রেখার মায়ের পত্রখানা খুলে পড়বার সে এতটুকুও প্রয়োজন আছে মনে করলে না। এতটুকু কৌতূহলও তার হল না। পত্র দুখানা পকেটে ভরে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নামছে—ওপর থেকে ব্যথাভরা কণ্ঠে ছায়া ডাকলে—দাদা!

"রেখাকে আনতে চললাম ছায়া" বলেই তরুণ মুখ না ফিরিয়েই বেরিয়ে গেল।

* * * * * * *

মিস গুহর শত অনুরোধ সত্ত্বেও রেখা বোর্ডিংএ আর একবেলাও থাকতে রাজী হল না। তার প্রিয় যে কোনও মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে—তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে পারে। দুর্ব্বল নারী সে—তার ডাককে সে অবহেলা করতে পারবে না ;—তার সংকল্প ভেসে যাবে—না—না—তার প্রিয়ের মঙ্গলের জন্য তাকে পালাতেই হবে।—

রেখাকে ষ্টেসনে পৌঁছুবার জন্য গাড়ী এসে গেছে—তার জিনিসপত্র ওঠান হয়েছে। রেখা ওপরে তার জগতের পরিচিত একমাত্র আশ্রয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল—তরুণ হর্ণ বাজিয়ে ফটকে ঢুকল।

রেখার জিনিস-বোঝাই গাড়ীর পাশে গাড়ী থামিয়ে পলকে সে ব্যাপারটা বুঝে নিল। মিস গুহকে বল্লে, "মিস বসুর জিনিসপত্র গুলো আমার গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে বলুন। ওঁকে আমার ষ্টেসনে পৌঁছে দেবার কথা ছিল—আমার দেরী দেখেই বোধ হয় অন্য গাড়ী ডাকিয়েছেন।"

নীচে নেমেই তরুণকে সামনে দেখে রেখার মুখ মড়ার মত ফেকাসে, রক্তহীন হয়ে গেল। সে তখন টলছিল—গাড়ী-বারান্দার একটা থাম ধরে সে কোন মতে সামলে নিল।

তরুণ গাড়ীর দরজা খুলে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে—"রেখা, উঠে এস।" এ ডাককে অগ্রাহ্য করবার শক্তি তার ছিল না। পা পা করে এসে কলের পুতুলের মত সে গাড়ীতে উঠে বসল।

—পথে দুজনেই অভিভূতের মত বসে রইল—কথা বলবার শক্তি দুজনেই হারিয়ে ফেলেছিল। মোড় ঘুরে গাড়ী যখন ছায়াদের ফটকের মধ্যে ঢুকছে—রেখা আপন কণ্ঠ ফিরে পেল—আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল—"এ তুমি কি কচ্ছ—কি কচ্ছ – জান না—বুঝছ না—"

স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তরুণ উত্তর দিল—আমি যা করছি রেখা আমি ঠিক জানি—বেশ বুঝি।"

গাড়ী থামিয়ে রেখাকে টানতে টানতে সোজা তরুণ তার চিত্রশালায় ঢুকলে। রেখা তখন টলছিল—তার প্রিয়ের দৃঢ় বাহুপাশ তখনও তাকে খাড়া রেখেছিল।

রেখার অসম্পূর্ণ ছবির সামনে পৌঁছে রেখাকে গাঢ় কণ্ঠে তরুণ বল্লে—"রেখা! তুমি মুক্তি চাইছ—আমায় ছেড়ে যেতে চাইছ?—কোন্ অধিকারে?—নিজেকে একবার বিলিয়ে দেবার পর তোমার মুক্তি চাইবার তো কোন অধিকারই নেই।" তার পর পকেট থেকে পত্র দুইখানি বার করে বল্লে "এর মধ্যে আমার যেটা পড়বার ছিল—পড়েছি। তোমার মায়ের কাহিনী পড়বার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না—আমিও পড়িনি।"—তার পর মায়ের কাহিনী টুকরে টুকরো করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে বল্লে—"এর দরকার আমার কাছে এর থেকে বেশী নয়; আর তোমার আমার মাঝে যা কিছু আসুক—তারও দশা হবে ঠিক এই রকম।"

আর্ত্তকণ্ঠে রেখা জমির ওপর লুটিয়ে পড়ল—"কি করলে? কি করলে! ওটা তোমার জানা দরকার ছিল – দরকার ছিল—ওতে আমার সত্য পরিচয় ছিল—আমার মা—"

রেখার মুখ চেপে ধরে—তাকে ধরে তুলে তরুণ বল্লে—"ঠিকই করেছি রেখা,—আমায় ভুল বুঝ না—ওতে আমার কোনই দরকার ছিল না—তুমি আমার প্রেমকে অতখানি নামিয়ে দিও না রেখা। মায়ের কর্ম্মের জন্য তুমি দায়ী নও—তার জন্য শাস্তি তুমি নিতে যাও কোন অধিকারে? আর তোমার মা—যাই হোন না তিনি—আমাদের গুরুজন, পূজ্য—তাঁর ভুল-চুকের বিচার করবার আমাদের কতটুকু অধিকার রেখা?"

রেখা একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে জ্ঞান হারিয়ে তার প্রিয়ের বুকে লুটিয়ে পড়ল।

ছায়া ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে যাচ্ছিল—তরুণ হেঁকে বল্লে—"রেখাকে ফিরিয়ে আনলাম ছায়া!"

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

পিলু সাওয়ান্ তেওড়া

ঝরিছে ঝর ঝর গরজে গর গর
স্বনিছে স্বর স্বর শ্রাবণ মা!
তটিনী তর তর সরসী ভর ভর
ধরণী থর থর শিকত গা!
বিরহী ধর ধর মানিনী সর সর
চাহিছে থর থর সুলোচনা
বালিকা দলে দলে চলিছে গলে গলে
বিটপী তলে তলে ঝোলে ঝুলা
কৃষক হলে হলে বলাকা জলে জলে
নাচিছে টলে' টলে' শিখীর পা
পরাণ পলে পলে পড়িছে ঢ'লে ঢলে'
উঠিছে বলে' বলে' "তুমি কোথা"!

২
| রা- রা |
৩ ১ ২ ৩ ১
II { | সা সা রজ্ঞা | রা রা | রা জ্ঞা | রা রা রমা | জ্ঞা রা | সা সা
ঝা রি ছে ঝ র ঝ র গ র জে গ র গ র
বা লি কা দ লে দ লে চ লি ছে গ লে গ লে

৩ ১ ২ ৩ ১
সা র রা | র রা | রপা মা | গা গা গা | রসা া- | ন্সা রজ্ঞা। }
স্ব নি ছে স্ব র স্ব র শ্রা ব ণ মা — — —
ত লে ঝো লে ঝু লা — — —

২´ ৩ ১ ২´ ৩ ১
{ | রা রা · রা | রমা মা | মগা মা | পা পা পা | পা পা | পমা ধপা ।
ত টি নী ত র ত র স র সী ভ র ভ র
ক্ষু য ক হ লে হ লে ব লা কা জ লে জ লে

২´ ৩ ১ ২´ ৩ ১ ২´
রা রা রা | রমা মা | মপা পা | মা ধপধা পা | মা ।- | গরগা রা- } | রনা না না |
ধ র ণী থ র থ র শি ক - ত গা - — — বি র হী
না চি ছে ট লে’ ট লে’ শি খী - র পা - — — প রা ণ

৩ ১ ২´ ৩ ১ ২´ ৩
না না- | না ধা | পধা পধা পা | মা মা | মা রগা | সা সরা রা | রা রা |
ধ র ধ র মা নি নী স র স র চা হি ছে খ র
প লে প লে প ড়ি ছে ঢ লে’ ঢ লে’ উ ঠি ছে ব লে’

১ ২´ ৩ ১
রপা মা | গা গা গা | রসা ।- | ন্সা- রজ্ঞা | ||
খ র সু লো চ না — — —
ব লে “তু মি কো থা — — —

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অভিনব কাচ—

অষ্ট্রিয়াতে এক বৈজ্ঞানিক এমন এক প্রকার কাচের আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাকে ইচ্ছামত বেতের মত বাঁকান যায়। ছবিতে

অভিনব কাচ

দেখুন একজন এই অদ্ভুত কাচের তৈরী একটী ছড়িকে বেতের ছড়ির মতন বাঁকাইয়া ধরিয়াছেন। এইবার কাচকে নানাপ্রকার নতুন নতুন কাজে ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে।

নতুন রকমের টেলিফোন—

আমরা সাধারণতঃ যে প্রকার টেলিফোন দেখি, তাহা হাতের সাহায্যে তুলিয়া কাণে লাগাইয়া কথা শুনিতে হয়। তখন আর অন্য

নতুন রকমের টেলিফোন

কোন কাজ করা যায় না। সম্প্রতি 'অডিয়ফোন' নামে এক প্রকার নতুন ধরণের টেলিফোন ব্যবহার হইতেছে। ইহা টেবিলের উপর কাণের পাশে এবং হাতের কাছে থাকে। রিসিভারটি এমন ভাবে তৈয়ারী যে একটু বাঁকিয়া বসিলেই তাহা কান স্পর্শ করিবে।

টেলিফোনের কথা শুনিতে শুনিতে হাতের অন্য কাজও বেশ চলিতে পারে। ছবি দেখিলে ব্যাপারটি বেশ ভাল বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের দেশে আপিস ইত্যাদিতে ইহার প্রচলন এখনও হয় নাই।

লুথার বুর্ব্যাঙ্কের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি

লুথার বুর্ব্যাঙ্কের নাম জগৎ-প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদ জগতে এই আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকে অদ্ভুত উপায়ে ইনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফলে পরিণত করিয়াছেন। গম, যব

লুথার বুর্ব্যাঙ্কের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি

বার্লি ইত্যাদি নানা শস্যকে তিনি আকারে এবং সারে বৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক অখাদ্য ফলকে সুমিষ্ট লোভনীয় ফলে রূপান্তরিত করিয়াছেন। এক ইঞ্চি ফুলকে ৮ ইঞ্চি করিয়া প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। সামান্য কথায় ইহার সম্পূর্ণ কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করা যায় না। সম্প্রতি তিনি এক অতি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন, কেবল তাহারই কথা এই প্রসঙ্গে বলিব। তিনি একটি অতি ক্ষুদ্র গাছ দেখেন। গাছটি বোধ হয় লম্বায় এক ইঞ্চি—ইহাতে আবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলও ফুটিত। প্রত্যেকটি ফুল বোধ হয় ২৩ ইঞ্চির বেশী হইত না। নানা প্রকার চেষ্টার পর তিনি এক ইঞ্চি গাছকে প্রায় ৬ ফিট লম্বা করিয়াছেন; ইহার পাতাগুলি প্রকাণ্ড হইয়াছে; ফুলগুলিও বড় বড় গোলাপের মত হইয়াছে। টবে এই গাছ রাখিলে অতি শোভনীয় হয়। ছবি দেখিলেই গাছটির পরিচয় পাইবেন। গাছের পিছনে লুথার বুর্ব্যাঙ্ক গাছের গুঁড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বৃহত্তম তারকার কথা—

আমরা পৃথিবীর লোকেরা সূর্য্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এমন কতকগুলি নতুন তারকার আবিষ্কার সম্প্রতি হইয়াছে—যাহাদের তুলনায় আমাদের জীবনদাতা সূর্য্যকে নগণ্য বলিয়া মনে হয়।

একটি মোটরকারকে যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ক্রমাগত পৃথিবীর উপর দৌড় করান যায়, তাহা হইলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে তাহার সময় লাগিবে মোট ১৭ দিন ৮ণ্টা। এই প্রকারে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে লাগিবে প্রায় পাঁচ বৎসর। কিন্তু এণ্টারেস্ (Antares)

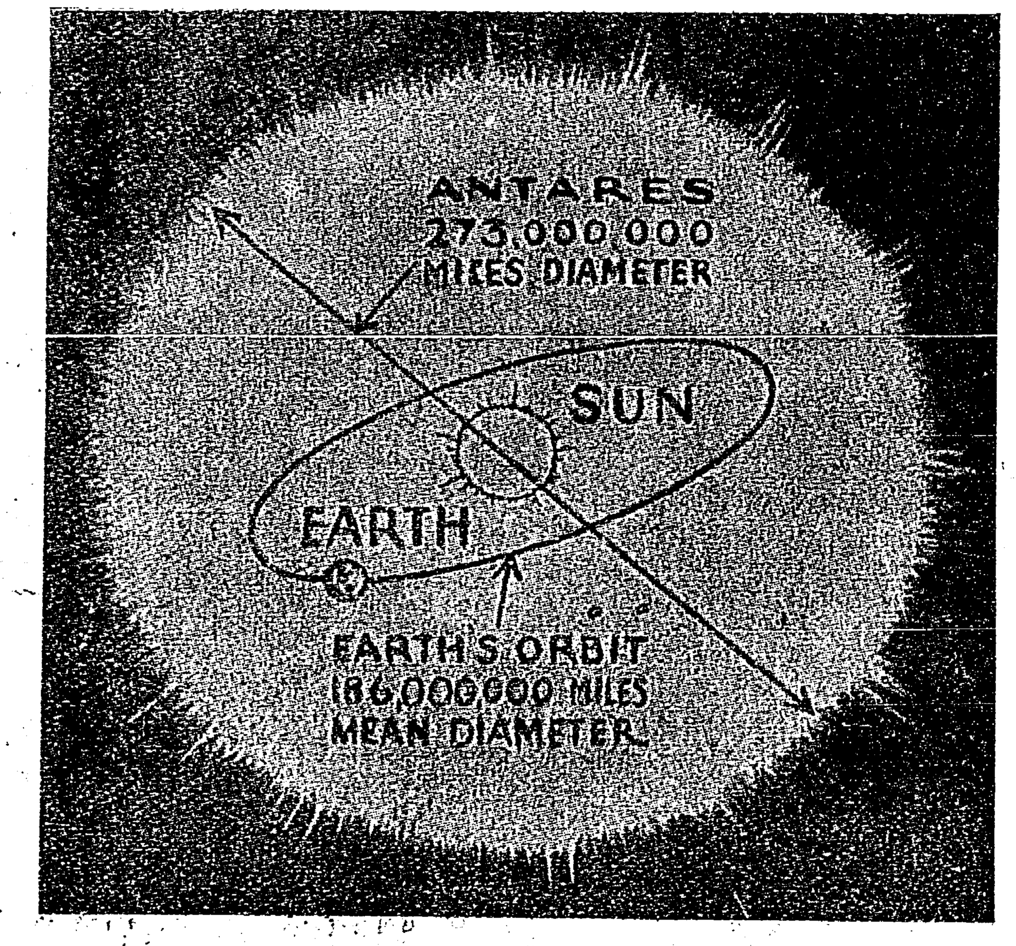

বৃহত্তম তারকা

নামক একটি নক্ষত্রকে এই মোটরকার কতদিনে একবার ঘুরিয়া আসিবে, তাহার কল্পনাও বোধ হয় অনেকে করিতে পারিবেন না। এণ্টারেসকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিবে—১,৩৭০ বৎসর মাত্র! ইহা হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে এই সুবৃহৎ তারকার ব্যাস ২৭৩,০০০,০০০ মাইলেরও বেশী—অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ৩০০ গুণেরও বেশী। এণ্টারেস্ ছাড়াও এই প্রকার অকল্পনীয় আকারের তারকা আছে।

"Betilgense" এবং "alpha Hercules"—ইহাদের মধ্যে দুইটি। ইহারা এত প্রকাণ্ড যে পৃথিবী সূর্য্যকে যে পথে প্রদক্ষিণ করে, সমস্ত পথ জুড়িয়াও একটিরও স্থান সংকুলান হইবে না।

এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আগুনের গোলক আকাশে ভীষণ বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা কল্পনা করিলে মন অদ্ভুত বিস্ময়ে পূর্ণ হয়! এই প্রশ্ন মনে আসে যে তারকার আকারের এবং বৃহত্ত্বের কোনো সীমা আছে কি না? বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক এ, এস্, এডিংটন্ (A. S. Eddington) নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক মাপ-জোকের দ্বারা এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সূর্য্যের যে "Mass"—অন্য কোনো তারকা তাহার ৫০ গুণ পর্য্যন্ত বড় হইতে পারে। তাহার বেশী বড় কোন তারকা আকাশে অটুট অবস্থায় থাকিতে পারে না। কোনো তারকা সূর্য্যের দশ গুণ বড় হইতে পারে, কিন্তু Mass অর্থাৎ তারকা-মধ্যস্থিত দ্রব্যসমূহের ওজনও যে সেই অনুপাতে বেশী হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। Volume অর্থাৎ প্রসার এবং Mass অর্থাৎ মধ্যস্থিত দ্রব্যসমূহের ওজন—আলাদা জিনিস। এণ্টারেস্ তারকার Volume সূর্য্যের ৩০০ গুণেরও বেশী, কিন্তু তাহার Mass সূর্য্যের Mass অপেক্ষা মাত্র ৫০ গুণ বেশী! সূর্য্যের Massএর ৫০ গুণ Massওয়ালা তারকা আকাশে থাকিতে পারে, তাহার বেশী হইলে সে আপনার বেগে কোটি কোটি ভাগে চূর্ণ হইয়া সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তাহাকে অটুট রাখিতে পারিবে না।

এডিংটন ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তারকার যেমন বৃহত্ত্বের সীমা আছে, তেমনি তাহার ক্ষুদ্রত্বেরও একটা সীমা আছে। তাঁহার মতে যদি কোন তারকার "মাস্" সূর্য্যের "মাসের" ১/২ অন্তত না হয়, তাহা হইলে সেই তারকা হইতে কোনো প্রকার আলো বা জ্যোতিঃ নির্গত হইবে না। কারণ কোন তারকার "মাস্" সূর্য্যের "মাসের" ১/২ অন্তত না হইলে তাহার তাপ ৫৪০০ (ফারেনহাইট্) হইবে না এবং তাপ এই পরিমাণ না হইলে কোন তারকা দূর হইতে দৃশ্যমান হইতে পারে না।

ক্ষুদ্রকায় তারকাদের মধ্যে *alpha* Centauriর নাম করা যাইতে পারে। ইহার ব্যাস মাত্র ১৫৫,০০ মাইল—সূর্য্যের ব্যাস ৮৬৫,৩৫০ মাইল। এই তারকা হইতে যে জ্যোতিঃ বাহির হয় তাহা সূর্য্যের আলোর মাত্র ১/১০০০০ ভাগ। এহ সূত্র ধরিয়া আরো একটি জিনিষ এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়াছেন। সূর্য্যের যৌবনকালে তাহার তাপ ছিল প্রায় ১৬,২০০ (এফ্) কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার তাপ মাত্র ১০,৪০০ (এফ্)। অতএব দেখা যাইতেছে যে সূর্য্য ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছে—এবং শীঘ্রই এমন দিন আসিতে পারে যখন সে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং আমরা সব জমিয়া বরফ হইয়া যাইব। তবে আমাদের খুব বেশী ভয় পাইবার কারণ নাই—কারণ বৈজ্ঞানিকেরা ভরসা দিতেছেন যে সূর্য্যের পৃথিবীর ক্ষতি করিবার মত ঠাণ্ডা হইতে এখনও কোটী বৎসরেরও বেশী সময় লাগিবে।

অভিনব দোলনা—

আপনা হইতেই দোল খাইতে পারে, এমন একটি দোলনা শিশুদের জন্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেড় দুই বছরের শিশুরা এই দোলনা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারিবে। দোলনার বসিবার জায়গায়

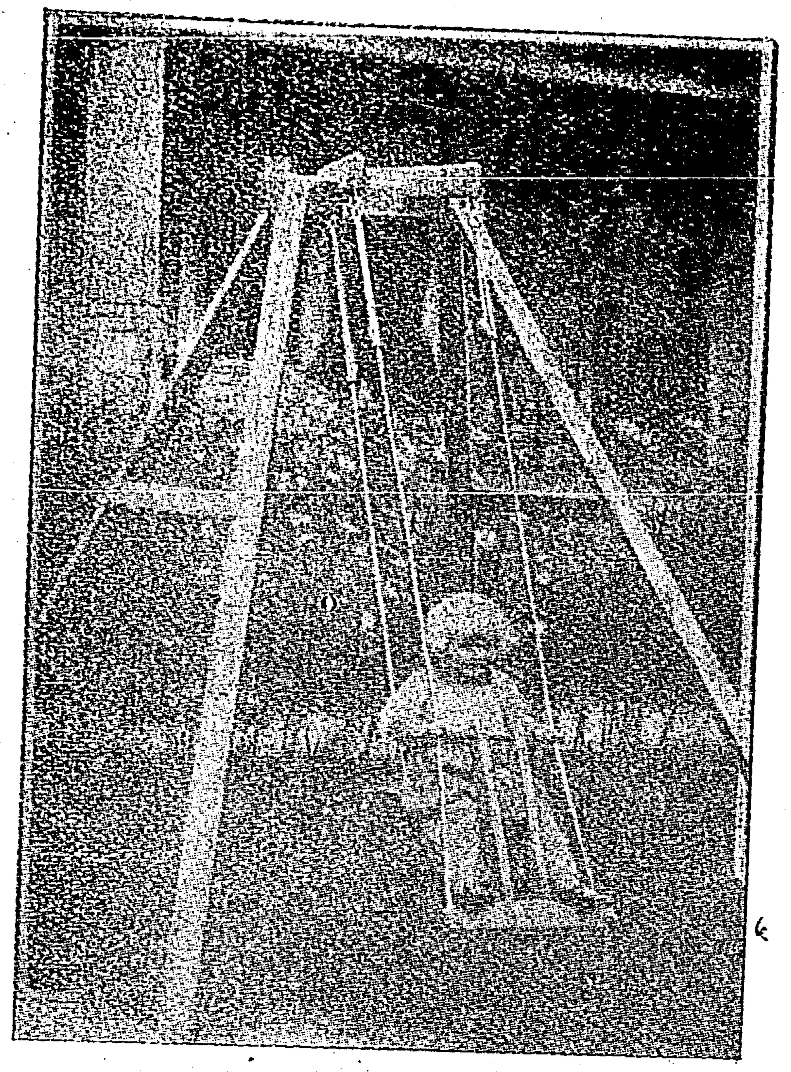

অভিনব দোলনা

ঘেরাটোপ দেওয়া আছে। শিশুরা নির্ভয়ে বসিতে পারিবে। কাছাকাছি কোনো পাহারা রাখিবারও বিশেষ দরকার নাই। একবার পায়ের ঠেলা এবং একবার হাতের ঠেলা দিলেই দোলনা দুলিতে আরম্ভ করিবে। দোলনায় যে বসিয়া থাকিবে, অন্য কাহারও সাহায্য না লইয়াই সে নিজে নিজেই ইহা করিতে পারিবে। আমাদের দেশে গৃহস্থ বাড়ীতে এই প্রকার দোলনার প্রচলন করিলে বাড়ীর মেয়েরা শিশুদের দোলনায় বসাইয়া নিশ্চিন্ত মনে গৃহকর্ম্ম করিতে পারিবে।

চেহারা সাদৃশ্য—

একই রকম দেখিতে দুইজন লোক আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই। চেহারা এক রকম হইলেই যে তাহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা বা রক্ত-সম্বন্ধ আছে—এ কথা আমরা মনে করি না। কিন্তু হল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Prof. Van Bemmelen বলিতেছেন দুইজন লোকের চেহারা একরকম হইলে তাহাদের মধ্যে রক্ত-সম্বন্ধ অবশ্য অতি সুদূর ভূতকালের হইতে পারে। বিভিন্ন দেশ এবং জাতির লোক হইলেও এই কথা খাটে। কারণ ইতিহাস খোঁজ করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে ৩০ পুরুষ বা তারো পূর্ব্বে এই বিভিন্ন জাতির অনেক লোক কোনো এক জাতির লোক ছিল। বহু লোকের রক্ত এবং রং নানা

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে পরীক্ষা করিয়া একজন রুশীয় বৈজ্ঞানিকও ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। কতকগুলি ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে অতি সামান্য কয়েকজন লোকের সহিত কয়েকজন জগৎপ্রসিদ্ধ লোকের কি অদ্ভুত চেহারার সাদৃশ্য আছে।

চেহারা সাদৃশ্য

বাইসাইকেল্‌-নৌকা—

ছবিতে যে নৌকা দেখিতেছেন—উহার মধ্যে একটি সাধারণ সাইকেল ফিট্‌ করা আছে। সাইকেলের প্যাডেলের সাহায্যে নৌকা চলে। এই অদ্ভুত নৌকার আর একটি বিশেষত্ব আছে। বাইসাইকেলের

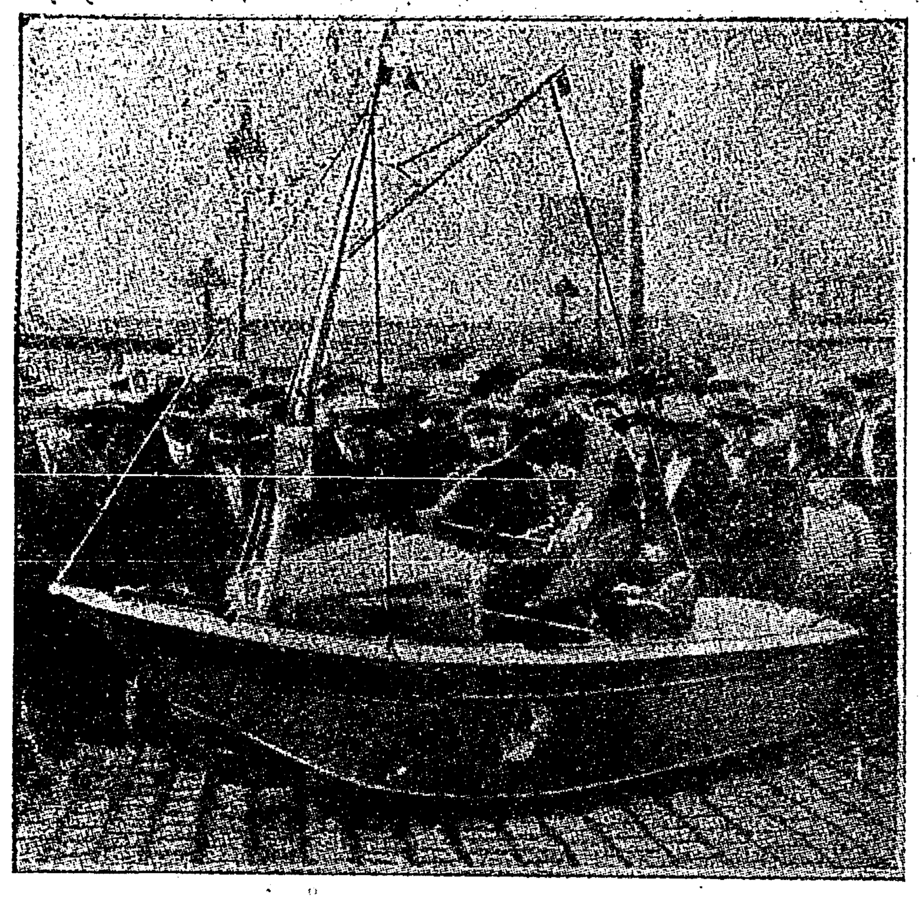

বাইসাইকেল নৌকা

গায়ে নৌকা এমন ভাবে তৈয়ারী যে ইহার ভারসমতা খুব সুন্দর এবং এই কারণেই বাইসাইকেলে বসিয়া নৌকাটীকে জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই চালান সহজসাধ্য হইয়াছে। এই নৌকার আবিষ্কর্ত্তা একজন ফরাসী ভ্রমণকারী—তাঁহার নাম মেরিয়াস্‌ ফেলি।

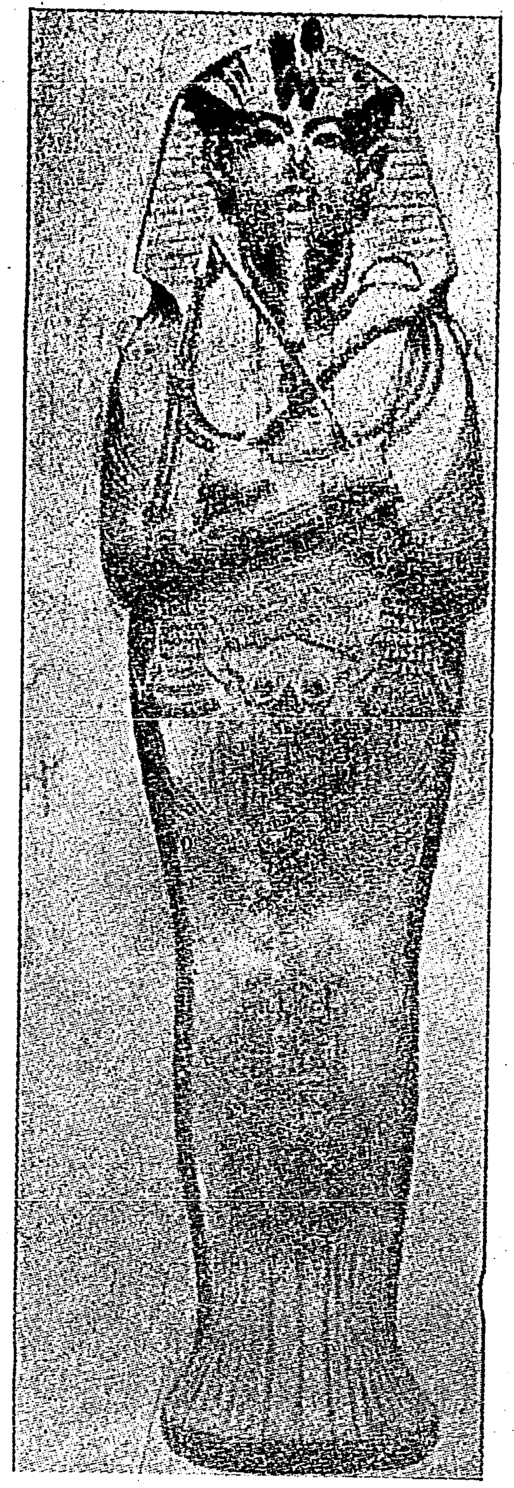

টুট্‌-আংখ্‌-আমেনের কফিন্‌—

ছবিতে, কিছুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত টুট্‌-আংখ-আমেনের কফিন এবং তাঁহার স্বর্ণমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। কফিনটিও আগাগোড়া সোনার তৈয়ারী। টুট্‌-আংখ-আমেনের স্বর্ণমূর্ত্তির খোদাই সেই সময়কার স্বর্ণকারদের আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। প্রত্যেকটি দাগ, প্রত্যেকটি টান পরিষ্কার—পাকা হাতের কাজ বলিয়া বোঝা যায়। স্বর্ণমূর্ত্তি সামান্য একটু ময়লা হইয়া গিয়াছিল—ইহাকে এখন আবার ভাল করিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। মূর্ত্তিতে যে পরিমাণ সোনা আছে, তাহার বর্ত্তমান দাম প্রায় ৭৫০,০০০ টাকা। মূর্ত্তিটি সোনার পাত পিটাইয়া গড়া হইয়াছে। ৬ ফুট লম্বা। টুট্‌-আংখ আমেনের কবরে যে সমস্ত আশ্চর্য্য-জনক দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে—এই স্বর্ণমূর্ত্তি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

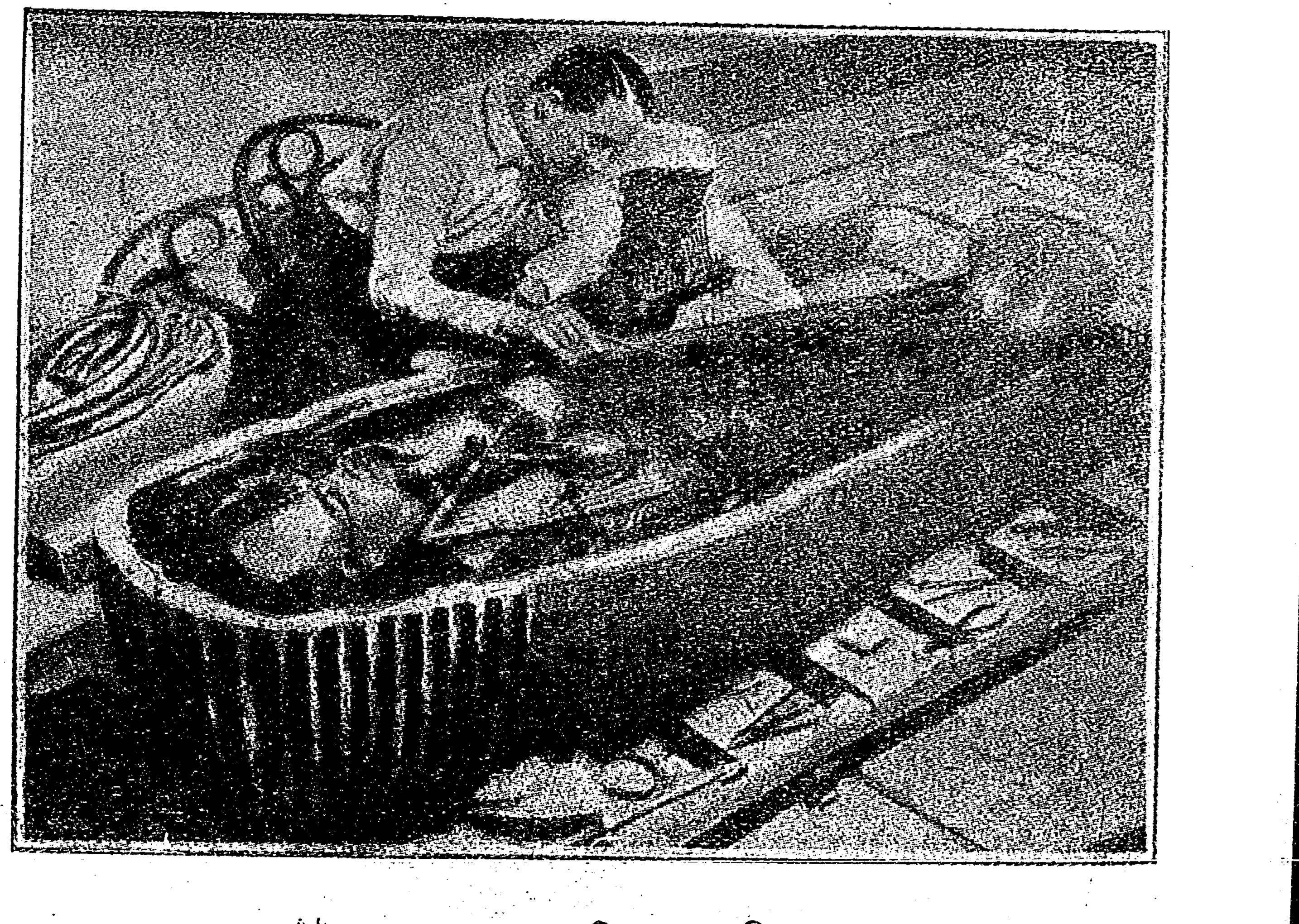

টুট্‌-আংখ আমেনের কফিন (২ খানি)

হাতের টিপ—

এল্‌, স্যামুয়েল মুর—বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। তাহার বাড়ী আমেরিকার এক সহরে (Newtonville—Mass)। সম্প্রতি সে তাহার হাতের আশ্চর্য্য টিপের এক নমুনা দেখাইয়া জগৎকে অবাক্‌ করিয়াছে। ক্রমাগত সাড়ে ৬ ঘণ্টাকাল ধরিয়া যে বন্দুক ছোঁড়ে—এবং এই সাড়ে ছয় ঘণ্টায় যে ২৫০০টি গুলি ছুঁড়িয়া ২,৪৯৯টি বুল্‌স্‌-আই মারিয়াছে। অর্থাৎ একটিমাত্র গুলি তাহার লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অক্ষম হয়। বন্দুক এত তাড়াতাড়ি ছোঁড়া হয় যে বন্দুকের লোহার

হাতের টিপ

অংশ গরম হইয়া স্যামুয়েলের হাতে ফোস্কা করিয়া দিয়াছে। এমন অদ্ভুত হাতের টিপের কথা খুব কমই শোনা গিয়াছে।

কলের দ্বারা প্যাক-বাক্সে বোতল প্যাক

কলের দ্বারা প্যাক্‌-বাক্‌সে বোতল প্যাক্‌—

ঔষধ বা অন্য কোন দ্রব্য-পূর্ণ বোতল চালান দিবার সময় প্যাক করা বাক্‌সে দেওয়া হয়। এই প্যাক করার কাজটি সাধারণত হাতের সাহায্যেই করা হইয়া থাকে। বোতল ভর্ত্তি করা কলের সাহায্যে বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি একজন মেক্‌সিক্যান যুবক একটি কল তৈয়ার করিয়াছে। এই কল ভর্ত্তি-বোতল প্যাক বাক্‌সে প্যাক করিবে। প্যাক করিবার জন্য আলাদা লোকের দরকার হইবে না। ভর্ত্তি করার কল হইতে বোতলগুলি পূর্ণ এবং ছিপি-আঁটা হইয়া একটি মঞ্চের উপর আসিয়া সারি সারি জমা হইবে। এই মঞ্চ হইতে বোতলগুলি একটি একটি করিয়া মঞ্চের নিম্নে স্থিত প্যাক বাকসে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইবে। প্যাক্‌-বাক্সটি বোতল-পূর্ণ হইবামাত্র নিকটস্থিত ঠেলা গাড়ির উপর চলিয়া যাইবে। সমস্ত ব্যাপার কলের দ্বারা হইবে—কেবলমাত্র একজন লোক দাঁড়াইয়া কল চালাইবে। এই কল প্যাকিং খরচ এবং সময় দুই সংক্ষেপ করিবে এবং আশা করা যায় বড় বড় কারখানায় এই কলের সমাদর অতি শীঘ্রই হইবে।

৭১ বছর বয়সে ৪২০০ মাইল সাইকেল দৌড়—

এম, সি, প্লুমার, বোষ্টোন সহরের লোক। ইঁহার বয়স মাত্র ৭১ বছর। সম্প্রতি এই বৃদ্ধ-যুবক তাঁহার বাইসাইকেলে করিয়া বোষ্টোন হইতে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো পর্য্যন্ত দৌড় দিয়াছেন। দূরত্ব মাত্র ৪২০০

৭১ বৎসর বয়সে ৪২০০ মাইল সাইকেল দৌড়

মাইল! গড়ে প্রতি দিন ইনি ৯০ হইতে ১৫০ মাইল গিয়াছেন! সমস্ত দিনে রাঁতে ঘুমাইয়াছেন ৪:৫ ঘণ্টা। সবলকায় যুবকদের মধ্যেও এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

ঘোড়ার গ্যাস্ মুখোস—

অনেক যুদ্ধ-বিদের মতে ভবিষ্যতে যে মহাযুদ্ধ হইবে, তাহা বন্দুক কামান ইত্যাদি লইয়া হইবে না। এই লড়াই বিপক্ষদলের মধ্যে গ্যাসের লড়াই হইবে। উভয় পক্ষই চেষ্টা করিবে বিপক্ষ দলকে বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা নির্ম্মূল করিতে। এই গ্যাস আকাশস্থিত এরোপ্লেন হইতে নীচে শত্রুদলের সহর এবং কেল্লা ইত্যাদির উপর ফেলা হইবে। সৈন্যদলকে এই প্রকার বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার মুখোস আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুখোস পরিয়া অনায়াসে গ্যাসের মাঝখান দিয়া চলা-ফেরা করা যায়; নাকের মধ্যে গ্যাস কোনো রকমেই প্রবেশ করিবে না।

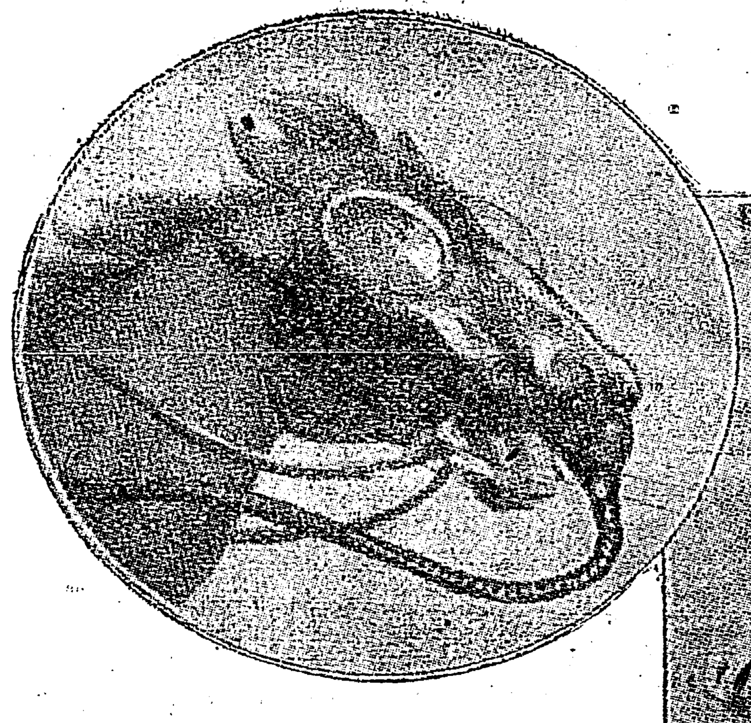

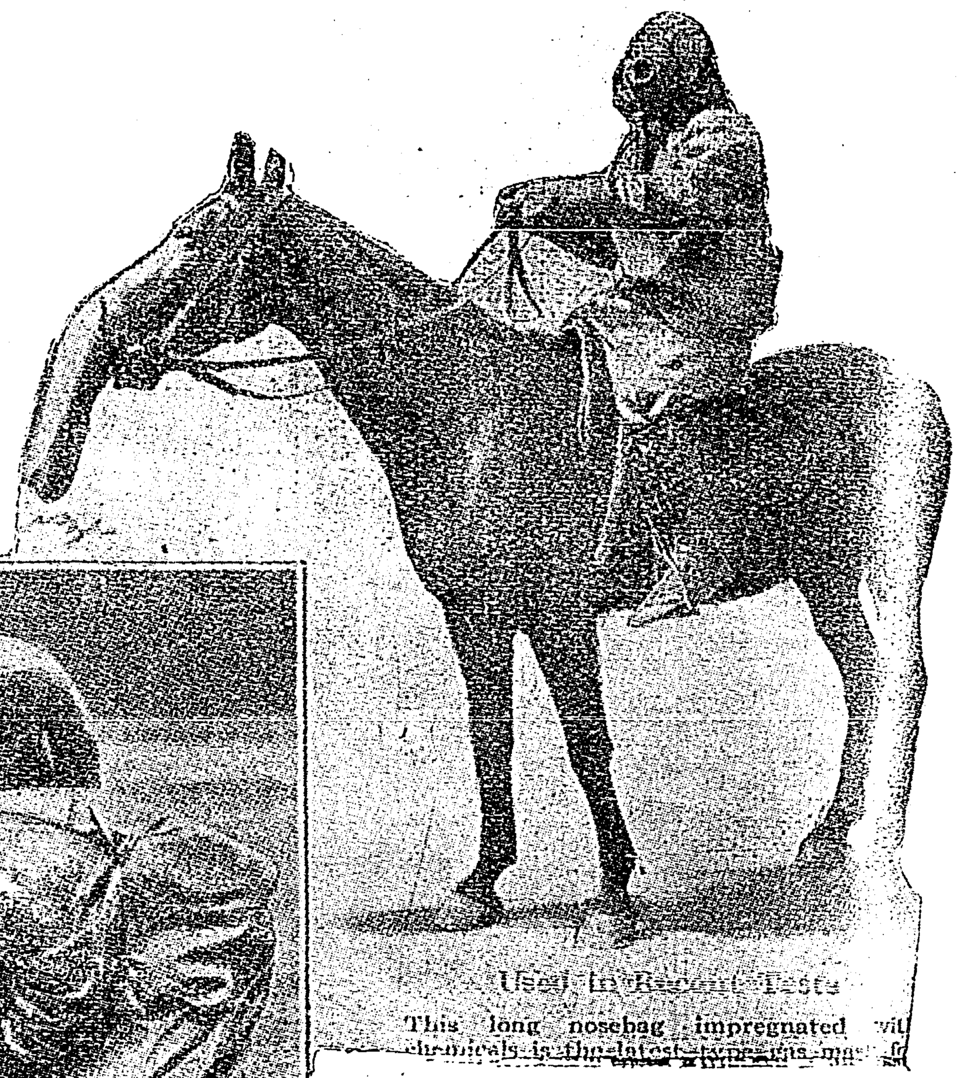

ঘোড়রে গ্যাস্ মুখোস

এখন জন্তুদিগকে, বিশেষতঃ যে সকল জন্তু এবং পাখী যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য মুখোস আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। এই কার্য্যে সফলতা লাভ হইয়াছে অনেকখানি। একটি ঘোড়াকে এই মুখোস পরাইয়া গ্যাসের মাঝখান দিয়া দৌড়ান হইয়াছে—ঘোড়ার কোনও প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। ঘোড়ার মুখোসটি দেখিতে অনেকটা তাহার দানা খাইবার ঝোলার মতই। মুখোসটি কাপড়ের তৈরী। অবশ্য এই কাপড়ে নানা-প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য মাখান থাকে, তাহাতে গ্যাস আটকাইয়া যায়। ঘোড়ার ক্ষুর বিষাক্ত গ্যাসে নষ্ট হইয়া যায়—সেইজন্য ঘোড়ার ক্ষুরে চামড়ার আবরণ দেওয়া হইবে। কুকুরের জন্য যে মুখোস তৈরী হইয়াছে, তাহাতে তাহার সমস্ত মুখ এবং মাথা আবৃত থাকিবে। কুকুর অনেক সময় মুখ দিয়া নিশ্বাস টানে—সেইজন্য তাহার কেবল নাক ঢাকিলেই চলিবে না, মুখও গ্যাসের সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

পায়রার জন্য কোন প্রকার মুখোস এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—তবে তাহার খাঁচার জন্য গ্যাস্-প্রুফ ঢাকনি তৈয়ারী হইয়াছে। পায়রার পায়ে সংবাদ-লিপি বাঁধিয়া দিয়া, তাহাকে চট্ করিয়া খাঁচা হইতে বাহির করিয়া দিয়া আকাশের দিকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। গ্যাস তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিবার পূর্ব্বেই পায়রা সংবাদ লইয়া আকাশে বহু উচ্চে উঠিয়া যায়।

গ্যাস্-মুখোস লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা চলিতেছে। এরূপ (?) হইলে হয়ত মানুষ এবং অন্যান্য জন্তুর সমস্ত শরীর আবৃত করিবার মত গ্যাস্-আবরণীর আবিষ্কার হইতে পারে; কারণ এমন গ্যাসও আবিষ্কার হইতে পারে, যাহা শরীরের চামড়ার যেখানে লাগিবে, সেইখানটাই পোড়াইয়া দিবে।

অভিনব আবাস—

(ক) প্রাচীন কালে কোন কোন জাতির লোকে গাছের উপর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আনন্দে বসবাস করিত। বর্ত্তমান কালে একজন অতিসভ্য নিউইয়র্কবাসী এই প্রকার একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বাড়ীখানি অবশ্য কেবলমাত্র গাছের উপর ভর করিয়াই নাই—ইস্পাতের থাম্বার সাহায্যও লওয়া হইয়াছে।

(খ) ইংলণ্ডের এক সহরে জল যোগাইবার জন্য একটি ওয়াটার টাওয়ার আছে। এই ওয়াটার-টাওয়ারে ৩০,০০০ গ্যালন জল থাকে।

এই টাওয়ার বা স্তম্ভের উপর মিসেস্ ম্যালকম্ ম্যাসন নাম্নী এক গল্প-লেখিকা চমৎকার বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

(গ) অতি গরম দেশে এক পাহাড়ের গায়ে পাথর খুদিয়া একটি ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া এক সাহেব বাস করেন। ইহাতে বাহিরের গরমে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হয় না।

(ঘ) কালিফোর্নিয়ার একটি হাসপাতালের ছাতকে রোদের গরম হইতে বাঁচাইবার জন্য ছাতের কয়েক ফুট উপরে আর একটি ছাত খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই উপরের ছাতকে, ছাতের ছাতা বলিলেও চলে। ইহার ফলে হাসপাতালের ঘরগুলি গরম হয় না। রোগীরা আরামে নিদ্রা যাইতে পারে।

(ঙ) ইংলণ্ডে দারুণ গৃহসমস্যার দিনে সমুদ্র-তীরের এক সহরে একটি নৌকাকে দ্বিতল গৃহরূপে পরিণত করিয়া এক পরিবার বাস করিতেছে।

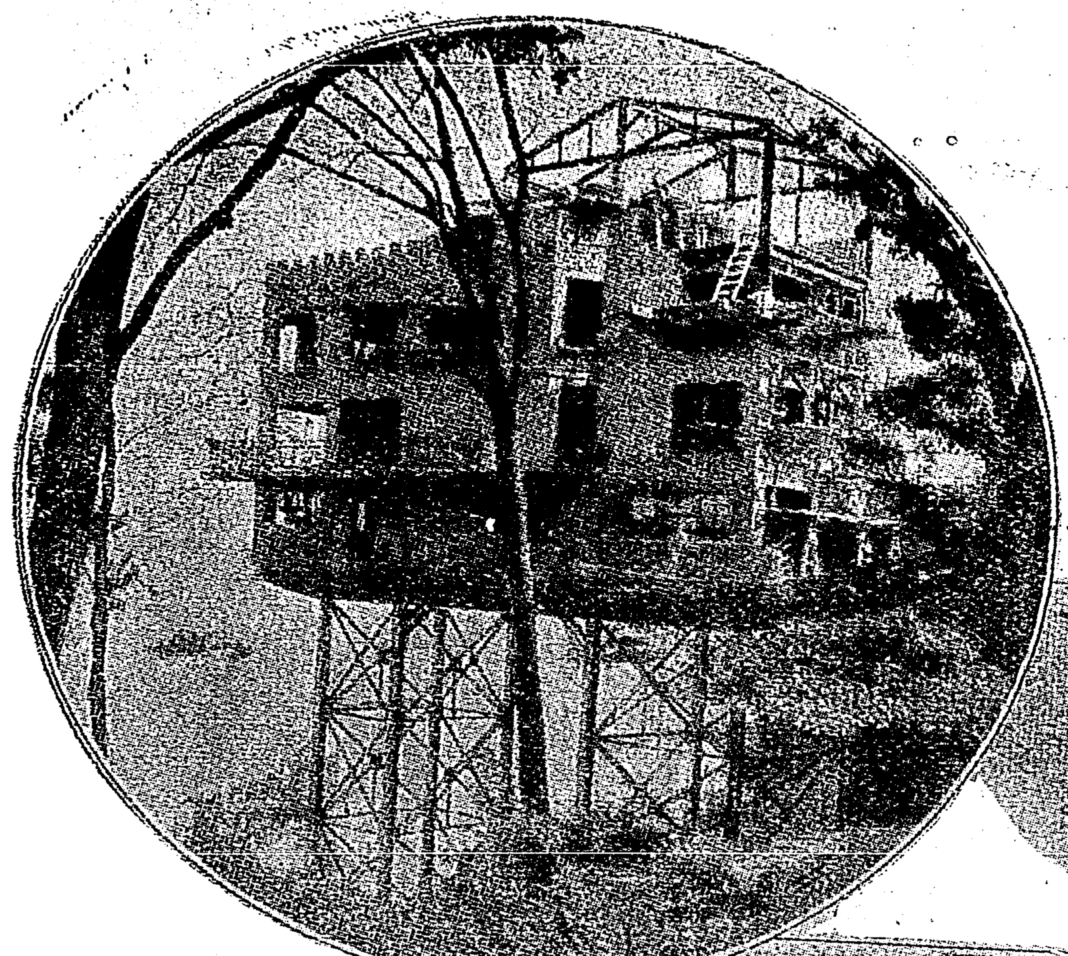

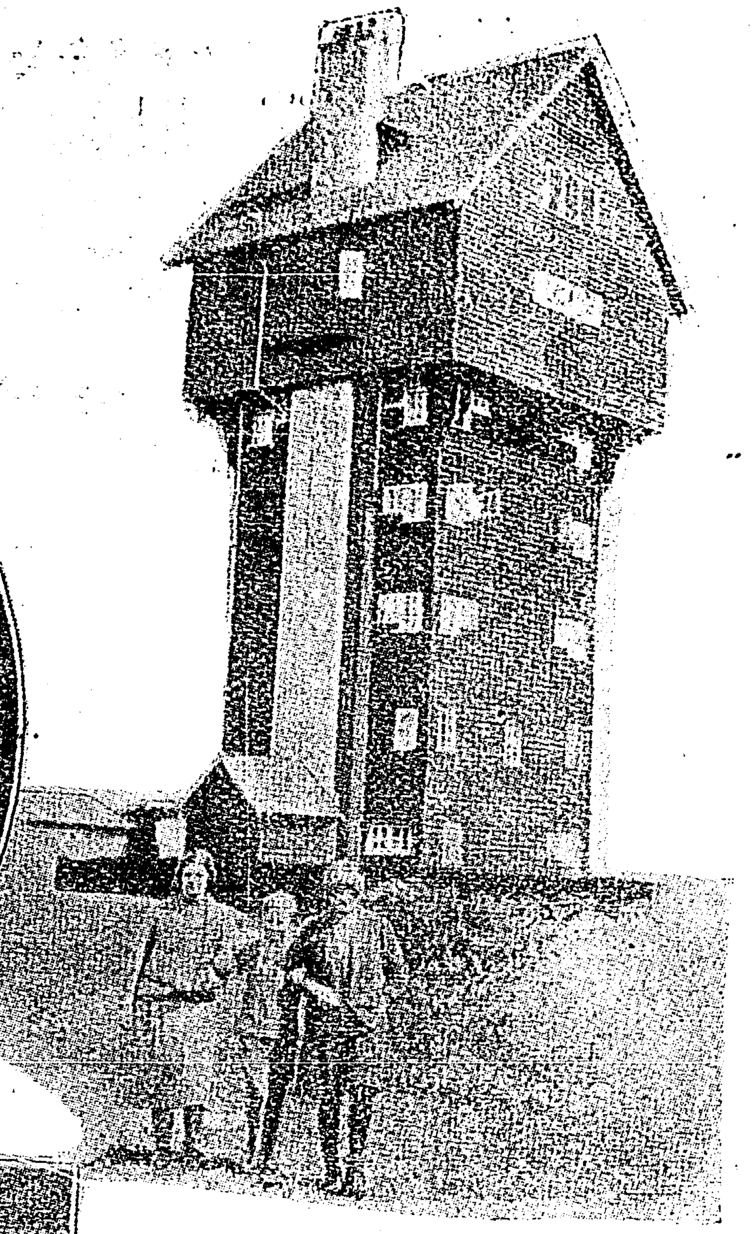

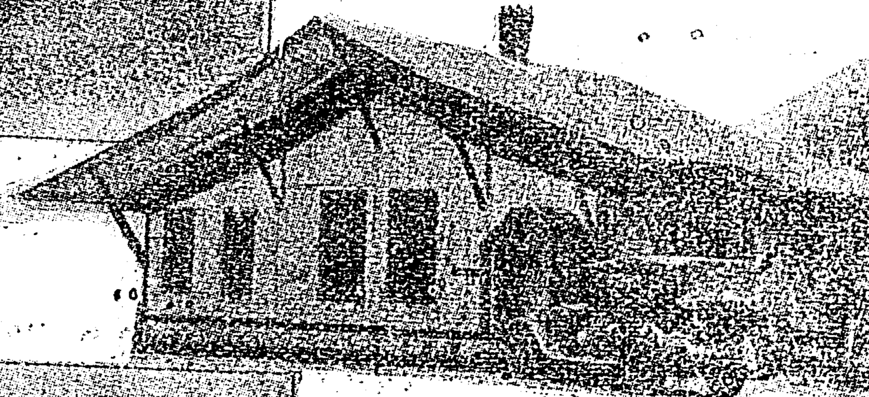

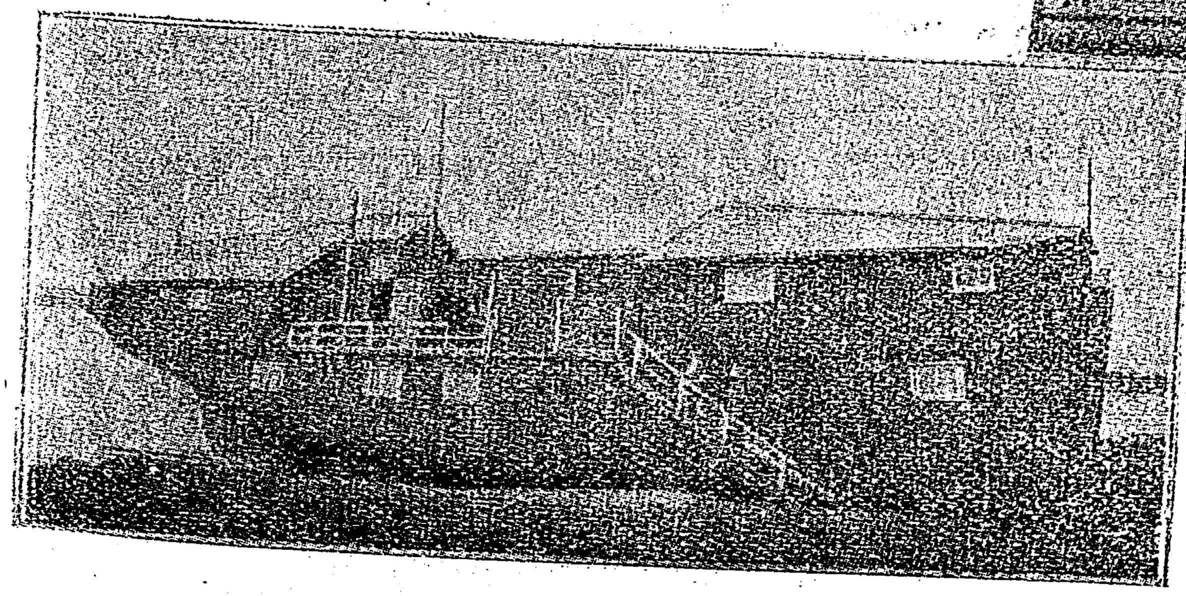

অভিনব আবাস

জনমানবহীন বরফ-দ্বীপ

কেঁপ হর্ণের দক্ষিণে কুমেরু-মহাসমুদ্রে কয়েকটি বরফাবৃত; জনমানববৃক্ষলতাহীন দ্বীপ আছে। তাহার মধ্যে একটি দ্বীপের নাম "Elephant Island" অর্থাৎ "হস্তী দ্বীপ"। নাম দেখিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে এখানে প্রচুর হাতী পাওয়া যায়, বা দ্বীপটি দেখিতে হাতীর মত। কাপ্তান হার্লে তাঁহার সহচরদের লইয়া এই দ্বীপে প্রায় আট মাস কাল বাস করেন। নতুন কোন দ্বীপ বা দেশ আবিষ্কার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই দ্বীপের কতকগুলি ছবি তুলিতে তাঁহারা সমর্থ হন। বরফের গুহা, বরফের জঙ্গল,

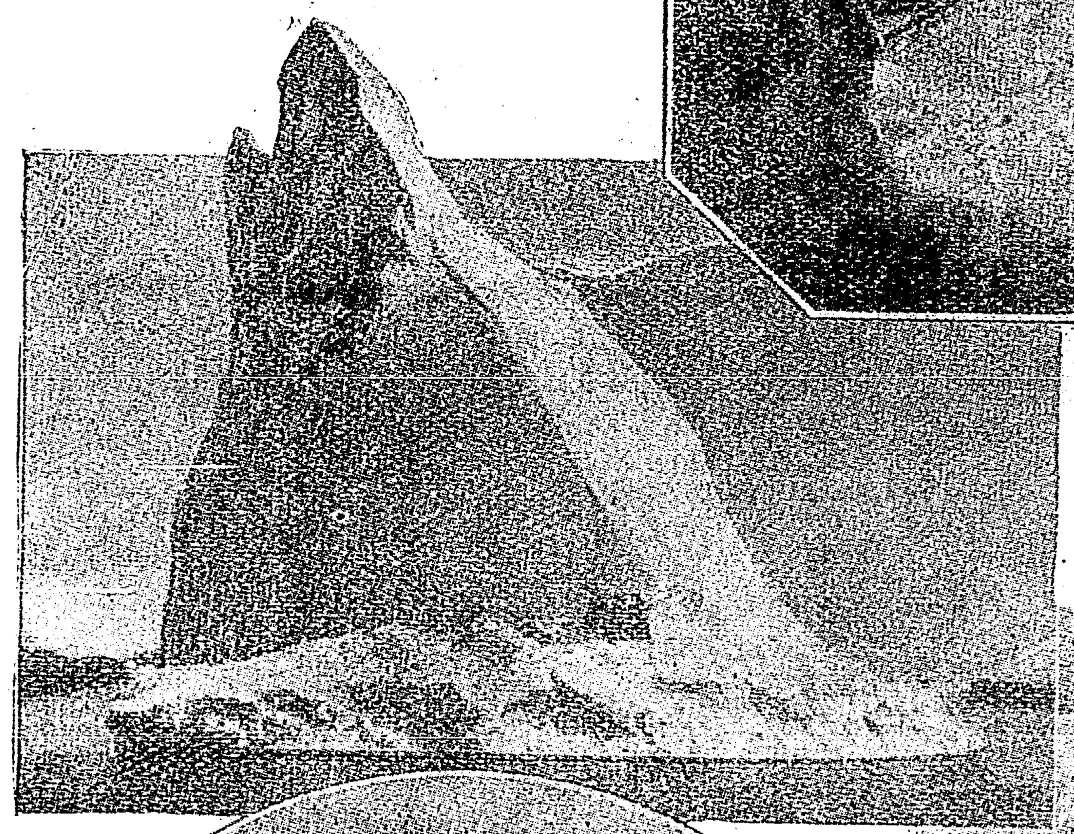

বরফের স্তম্ভ ইত্যাদির দ্বারা এই দ্বীপটি পূর্ণ। এখানে যাহা কিছু আছে, সবই বরফের,—বরফ ছাড়া আর কিছু নাই—এ যেন বরফের রাজত্ব। ছবিতে বরফ-দ্বীপের কয়েকটি দৃশ্য দেওয়া হইল।

জনমানবহীন বরফ-দ্বীপ

জাঁতা-পাথরের অভিনব ব্যবহার—

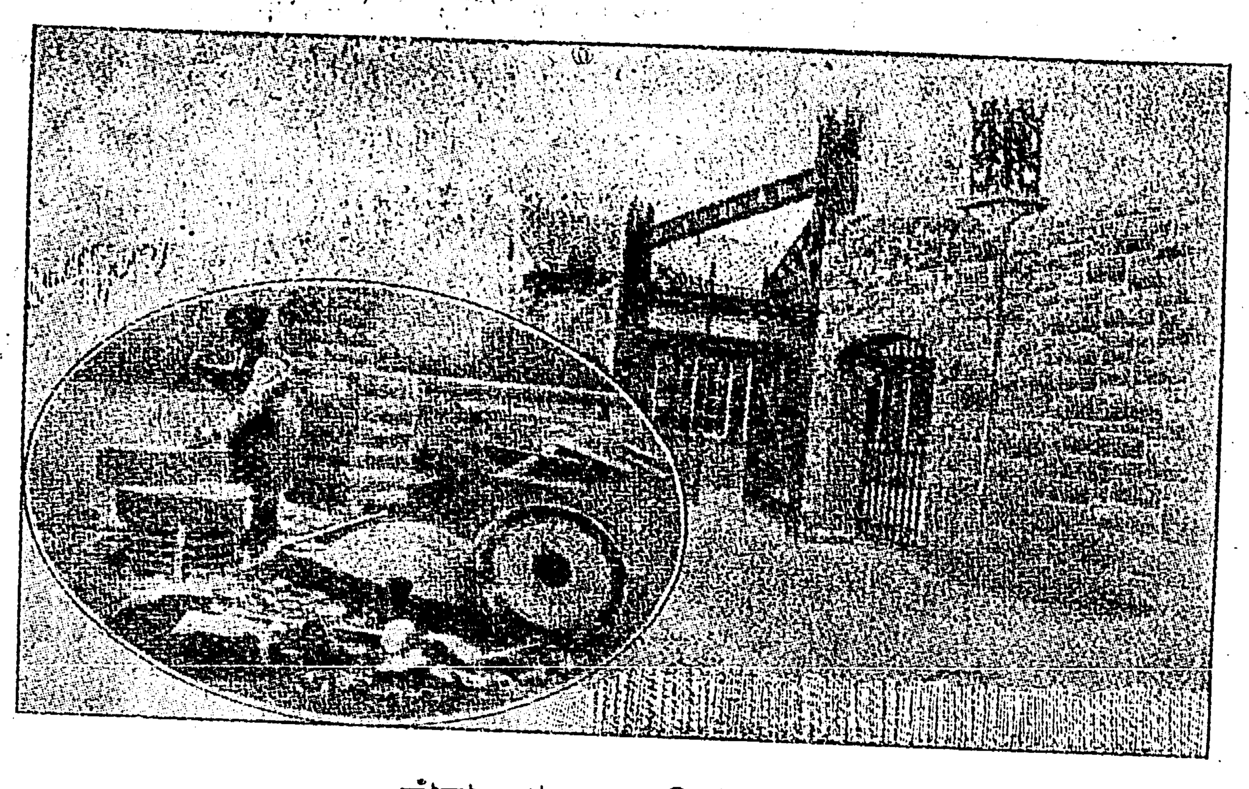

জাঁতার পাথরের অভিনব ব্যবহার

আমাদের দেশে জাঁতার ব্যবহার বহু কাল হইতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু জাঁতা পুরান এবং অকেজো হইয়া গেলে আমরা জাঁতার পাথর ফেলিয়া দিই। কিন্তু এই সকল পাথর দিয়া শক্ত এবং সুদৃশ্য দেওয়াল নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই। ফিলাডেলফিয়া সহরের এক কারখানাওয়ালা এই সকল জাঁতা-পাথর সংগ্রহ করিয়া তাঁহার কারখানার চারিদিকে লম্বা এবং দৃঢ় দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি সম্পূর্ণ গীর্জ্জাও এই অব্যবহার্য্য জাঁতা-পাথর দিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এক একটা জাঁতা-কলে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ জাঁতাপাথর নষ্ট হয়, তাহাতে সেই সকল পাথর দিয়া অনায়াসেই ছোট ছোট দু তিনটি বাড়ী তৈয়ার করা যায়।

ব্রাহ্মণ

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

১

মাণিকপুরের কালী-মন্দির সে অঞ্চলের সকাম ও নিষ্কাম ভক্তির মূর্ত্তবিকাশের একমাত্র লীলাক্ষেত্র ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অমন জাগ্রত দেবতা বড় বড় তীর্থ-স্থানেও নাকি বড়-একটা দেখা যায় না। সেখানে ভক্তি-ভরে মানৎ করিয়া কেহ নাকি কখনও বিফলকাম হয় নাই।

বৃদ্ধ পদ্মনাভ দেবশর্ম্মা সেই মন্দিরের সেবায়েৎ অর্থাৎ মন্দিরের আয় হইতে তিনি নিজের সংসার বেশ সচ্ছলরূপে চালাইয়া কিঞ্চিৎ জমি-জমা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। পাশ্চাত্য জাতি প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া খাটাইয়া লইতেছে বলিয়া সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাচ্য হিন্দু যে তার দেবতাকে পর্য্যন্ত খাটাইয়া লইবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না।

বৃদ্ধ পদ্মনাভ যে পরম নৈষ্ঠিক ছিলেন তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—পত্নী সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান জন্মে নাই। অজাত-সন্তান বলিয়া ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী কখনও দুঃখ প্রকাশ করিতেন না, বরং গৌরব করিয়াই বলিতেন "আমি যে মা কালীর 'দৃষ্টি পড়া' মেয়ে, তাই মা আমাকেও নিজের মত করেছেন।"

বৃদ্ধ পদ্মনাভের কিন্তু মনে সুখ ছিল না। বার্দ্ধক্যের ভারে যখন তিনি একান্ত অপটু হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া দেবসেবার জন্য পূজারী ভাড়া করিতে হইল। কিন্তু ভাড়া-করা পূজারী তাঁহার মত পূজা-সামগ্রীর অল্পতা দেখিলে কেবল মন্ত্রচুরি করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, পরন্তু সেই সামান্য উপকরণেরও কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতে আলস্য করিত না। সুতরাং কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিত্যতা হেতু মন্দিরের আয় যতই হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল, বৃদ্ধ পদ্মনাভ ততই ত্রাস প্রাপ্ত হইয়া ঘন ঘন পূজারী পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গুটি-দুইচার পূজারী পরিবর্ত্তনের পর বিধি সদয় হইলেন—পদ্মনাভ একটী প্রকৃত সাধু-স্বভাব পূজারীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে সংগ্রহ করিলেন।

তাহার নাম সত্যশরণ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে। তার যৌবনের দীপ্ত সুষমার প্রখরতা শুদ্ধচিত্ততার সংস্পর্শে স্নিগ্ধ ও গম্ভীর—যেন শ্রাবণের সমেঘ মধ্যাহ্ন-আকাশ!

সত্যশরণ পিতৃমাতৃহীন। বাড়ী ঘর নাই বলিলেই হয়। সুতরাং সে পদ্মনাভের সংসারেই থাকিয়া পদ্মনাভ ঠাকুরের 'দৈব ব্যবসায়' চালাইবে স্থির হইল। ইহাতে পদ্মনাভ ঠাকুর অনেকটা নিরুদ্বেগ হইলেন; ভাবিলেন—বাঁচা গেল, চুরিটা রক্ষে হ'ল।

দেবসেবার জন্য সত্যশরণ মাসিক দক্ষিণা কত চাহে জিজ্ঞাসা করায় সত্যশরণ কহিল—"মায়ের পূজা ক'রব, তাঁর প্রসাদ পাব—এই আমার যথেষ্ট—! কখন টাকাটা সিকেটা দরকার হয়—জানাব।"

পদ্মনাভ মনে-মনে বলিলেন—সোনারচাঁদ ছেলে একেই বলে! প্রকাশ্যে বলিলেন—"বেঁচে থাকো বাবা!… দীর্ঘজীবী হও!"

২

সত্যশরণকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়া পদ্মনাভ যতটা ফলপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন ফলে কিন্তু ততটা হইল না। পূজার ফল মূল বা নৈবেদ্যর চাউলের পরিমাণ প্রায় পূর্ব্ববৎ, তবে দক্ষিণালব্ধ অর্থের পরিমাণটা কিছু বাড়িয়াছে সত্য। পদ্মনাভ একদিন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যশরণ বলিল—"আজ্ঞে যারা পূজা দিতে আসে তাদের প্রসাদ কিছু বেশী করে দিতে হয় কিনা, তাই এদিকে কিছু কম হয়, আর দক্ষিণার পয়সা থেকে তো তা কিছুই দিতে হয় না, তাই সমস্তটাই পান!"

বৃদ্ধ দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন—"এঁ্যা…প্রসাদ বেশী-বেশী করে দাও?…কেন? এঃ! তোমায় অর্ব্বাচীন পেয়ে ব্যাটারা সব ঠকিয়ে নেয়!"

সত্যশরণ ধীরকণ্ঠে বলিল—"আজ্ঞে, না, তারা প্রসাদের পরিমাণ নিয়ে কখনও কোন কথা বলেনি আমি নিজে থেকেই—"

বৃদ্ধ একবার চমকিয়া উঠিলেন—"এঁ্যা! নিজে থেকে তাদের বেশী করে দাও?…আরে ছ্যা! ছ্যা!—তুমি এত নির্ব্বোধ তা তো জানতুম না!…না, না, ভবিষ্যতে আর ও-রকম কোরো না! প্রসাদ দেওয়া এই বুঝেছ কিনা—যত কমে পার সারবে!"

বৃদ্ধের হৃদয়ের পরিচয়ে সত্যশরণের মনের ভিতরটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে কোন উত্তর করিল না।

বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন…"নৈবেদ্যর চালটার পরিমাণ তেমন বাড়ছে না কেন বল ত? তা' থেকে তো কোন খরচ হয় না!"

সত্যশরণ সশঙ্ক নম্র স্বরে বলিল—"আজ্ঞে তা হয় কিছু—এই সিকি পরিমাণ!

বৃদ্ধের যেন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এমনি ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বল কি?…প্রসাদের সঙ্গে নৈবেদ্যর চালও তুমি বিতরণ আরম্ভ করেছ!"

"আজ্ঞে প্রসাদের সঙ্গে নয়—"

"তবে কার সঙ্গে বাপু?"—পদ্মনাভের কণ্ঠস্বরে শ্লেষ-বিমিশ্রিত।

"এই দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জ আতুর—এদের এক মুঠা এক মুঠা ভিক্ষে দিতে হয়!"

"ভিক্ষা দিতে হয়?…তার মানে?…যদি না দিই?—আমার মাথাটা কেটে নেবে তা'রা?…না, না, সত্যশরণ, এসব ভাল নয়! তুমি ছেলে মানুষ—তোমায় সৎ বলেই জানি…তা আমায় কোন জিজ্ঞেসবাদ না করে অতটা কর্ত্তৃত্ব কোরো না!" সত্যশরণের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে নীরবে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পদ্মনাভ সেইদিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে স্বগত বলিল—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ…কোন ব্যাটাকে আর বিশ্বাস করবার যো নেই!

৩

সত্যশরণের ভক্ত হৃদয় প্রত্যহ দেবীপূজার কালে যেমন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িত—এক দিন পূজা করিতে বসিয়া তেমন আর হইতেছিল না—সে কেবলই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল! তাহার মনে হইতে লাগিল—দেবী আজিকার পূজা যে গ্রহণ করিলেন না, তাহা বুঝাইয়া দিতেই যেন এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইলেন। প্রথমে তাহার সন্দেহ হইল সে কোনরূপ অশুচি অবস্থায় পূজায় রত হয় নাই ত? কিন্তু স্মৃতি সাহায্যে সবিশেষ সন্ধান করিয়াও সে তাহার দেহমনের শুচিতার ত্রুটি দেখিতে পাইল না। তখন সে পূজা-সামগ্রী কোন প্রকারে অপবিত্র হইয়াছে কিনা জানিবার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য-বাহকদিগকে একে একে

প্রশ্ন করিতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব নৈবেদ্যর শুচিতার সমর্থন করিতে গিয়া, কে কি মানসে পূজা মানত করিয়াছে, তাহাও বলিতে লাগিল। এক ব্যক্তি বলিল—"ঠাকুর, আমি কখনও মার পূজার জিনিস অপবিত্র করিতে পারি! তুমি তো জান না—মা আমায় কি কৃপা করেছেন"—এই বলিয়া সে যাহা বলিল, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তাহার শ্বশুরের বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র-সন্তান হওয়ায়, তাহার শ্বশুরের সম্পত্তি লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না; এজন্য সে মার নিকট তার শিশু শ্যালকের মৃত্যু-কামনা করিয়া পূজা মানত করিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে আজ দুই দিন হইল সেই শ্যালক হঠাৎ মারা গিয়া তাহার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছে।

এই ভীষণ মানতের কথা শুনিয়া ঘৃণা ও ক্ষোভে সত্যশরণের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। সে এতক্ষণে বুঝিল—কেন দেবী আজ পূজা গ্রহণ করেন নাই। সে বারেক মর্ম্মান্তিক বেদনাভরা দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির পানে তাকাইয়া তাহার নিবেদিত পূজার সামগ্রী সমূহ তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে বলিল—"নিয়ে যাও তোমার জিনিস—এ পূজো মা গ্রহণ করেন নি!"

সে ব্যক্তি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি অপরাধ হয়েছে ঠাকুর, যে, মা এ পূজো—"

পূর্ব্ববৎ কঠোর স্বরে উত্তর হইল—"চলে যাও এখান থেকে!—পাপিষ্ঠ!"

সেইদিন হইতে সত্যশরণ পূজার মানস জিজ্ঞাসা না করিয়া পূজার ভার গ্রহণ করিত না। কথাটা পদ্মনাভের কানে পৌঁছিবার আগেই, এক দিন জমিদার বাটী হইতে এক বিপুল পূজার ভার উপস্থিত হইল। সত্যশরণ নব রীতি অনুসারে পূজার মানসের কথা জিজ্ঞাসা করিল। শুনিল, জেলা কোর্টে যে বড় উকীল তাঁহার বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক ফৌজদারী মোকর্দ্দমা চালাইতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর 'শুভ সংবাদে' এই পূজার অনুষ্ঠান!

সত্যশরণ সে পূজার ভার ফিরাইয়া দিল। জমিদারের লোক বলিল—"জমিদার বাবু কারণ জিজ্ঞেস করলে কি বলব?"

"বোলো—হিংসার পূজা মা গ্রহণ করেন না।"

৪

নবীন দত্ত দুরন্ত জমিদার। তবে, দুরন্ত জমিদার বলিতে সাধারণত যাহা বুঝায়, তিনি তাহা ছিলেন না। প্রজার ধনসম্পত্তি বা ঝি-বউড়ীর উপর তিনি কখনও লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিতেন না। প্রজা খাজনা তামাদি করিয়া দিলে তাঁর তত আপত্তি হইত না; কিন্তু তাঁহার প্রাপ্য 'রাজমান্যের' এক কড়া-ক্রান্তি কেহ হানি করিলে, তার আর নিস্তার থাকিত না। সুতরাং যখন শুনিলেন তাঁর পূজা ফেরত আসিয়াছে, তখন একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া হুকুম দিলেন—"শা—ভট্‌চার্য্যকো পাকাড় লেয়াও!"

পদ্মনাভ ঠাকুর তখন আহারান্তে আচমন করিয়া সবে মাত্র 'খড়কে ভক্ষণ' কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, এমন সময় জমিদারের ভোজপুরী দরোয়ান গিয়া উপস্থিত—"আভি যানে হোগা!"

হঠাৎ জমিদারের এই জরুরী তলবে পদ্মনাভ ঠাকুরের প্লীহা চমকাইয়া উঠিল—বলিলেন "খবর ভাল তো সব—দরোয়ানজী!" দরোয়ানজী কিঞ্চিৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ভালা কি বুরা হাম কেয়া জানে—যানে কো সাব মালুম হোগা।"

দ্বারবানের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে পদ্মনাভ বুঝিলেন, ব্যাপার সুবিধার নয়। তিনি সত্যশরণকে ডাকিয়া সব বলিলেন। সত্যশরণ অনুমানে কতকটা বুঝিতে পারিলেও, তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিল—"কেন ডাকচেন, একবার শুনে আসুন…না হয় আপনি থাকুন, আমি শুনে আসিগে।"

পদ্মনাভ জমিদারকে চিনিতেন; সুতরাং নিজে না গিয়া বকলয়ে কাজ সারিতে ভয় পাইলেন,—বলিলেন "না—না, তা করে কাজ নেই,—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমিই যাই, তুমি না হয় আমার সঙ্গে এস।"

"তাই চলুন" বলিয়া সত্যশরণ পদ্মনাভের সহগামী হইল।

তাঁহারা গিয়া দেখিলেন জমিদারবাবু একমনে ঘনঘন গড়গড়ার নল টানিতেছেন। তাঁহার মুখখানা তখন উষ্মা-ভরা ধূমায়মান ইট পাঁজার মত গম্ভীর দেখাইতেছিল। দেখিয়াই পদ্মনাভ বুঝিলেন ব্যাপার সঙ্গীন! তিনি একবার ব্যাকুল চোখে সত্যশরণের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন—সত্যশরণ নির্ব্বিকার।

পদ্মনাভ গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জমিদার তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও তাঁহার দিকে না তাকাইয়া আপন মনে গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। আধঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পদ্মনাভ বলিলেন—"আমায় ডেকেছিলেন ?"

"হুঁ" বলিয়া জমীদার পূর্ব্ববৎ নিবিষ্টমনে ধূমপানে রত রহিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছিল। এই অবস্থায় আরও প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল—কোন কথা নাই। পদ্মনাভ আবার বলিলেন—"কি জন্যে ডেকেছিলেন ?"

পদ্মনাভের দিকে না তাকাইয়াই ধূমপান করিতে করিতে জমীদার বলিলেন—"তোমার কালী-মন্দিরের পাশে আমি একটা কালী-মন্দির স্থাপন করবার ইচ্ছা করছি··· তোমার কি মত ?"

কথার মর্ম্মটা পদ্মনাভ বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল—"আজ্ঞে, মায়ের মন্দির থাকতে আবার নূতন মন্দির স্থাপনের প্রয়োজন তো—"

"প্রয়োজন আছে বৈ কি!—তোমার ও কালী তো আর আমাদের মত পাপিষ্ঠ নরাধমের পূজা গ্রহণ করেন না!"

পদ্মনাভ ভাবিলেন—জমীদার রহস্য করিতেছেন···তাই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি···পাপিষ্ঠ ?—নরাধম ?··· ছিঃ ছিঃ একথা বলবেন না!"

"আমি পাপিষ্ঠ—নরাধমই ত!···তা নইলে আমার পূজা ফিরে আসে ?"

পদ্মনাভ হতভম্ব হইয়া বলিলেন—"এ্যাঁ···আপনার পূজো ফিরে এসেছে!···(সত্যশরণের দিকে চাহিয়া) এসব কি সত্যশরণ ?"

সত্যশরণ এতক্ষণ জমিদারবাবুর অগোচরে দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং সত্যশরণের নামোল্লেখে জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যশরণটা আবার কে ?"

"আজ্ঞে, আমার পূজারী।"

"তোমার পূজারী ?···সেই তাহলে আমার পূজো ফিরিয়ে দিয়েছে ?···কৈ সে ?"

সত্যশরণ নির্ভীকভাবে আসিয়া জমিদারের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সেই শুচি সৌম্য তরুণ বদনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যে নবীন দত্তের মত দুরন্ত জমীদারও ক্ষণেকের জন্য কেমন অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার পুজো ফিরিয়ে দিয়েছিলে ?"

সত্যশরণ নির্ব্বিকার চিত্তে স্থির গম্ভীর স্বরে বলিল—"হাঁ···আমিই ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।"

"জান, তুমি পূজো ফিরিয়ে দিয়ে কার অপমান করেছিলে ?"

"সে পূজার সামগ্রী অশুচি বলেই আমি তা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছি··· কারুর অপমান করতে নয়।"

জমীদার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অশুচি?' ধীর স্থিরকণ্ঠে সত্যশরণ বলিল—"হাঁ, অশুচি বৈকি!··· আপনি য' মানস করে পূজা মানত করেছিলেন তাতে পূজার সামগ্রী অশুচি হয়েছিল!"

জমিদার বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—"ব্যাটা আমার ভারি পণ্ডিত দেখচি—"

সত্যশরণ এইবার ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল—"আপনি কথাবার্ত্তায় অভদ্র নহেন—এই আমার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন দেখছি আমার ধারণা ভ্রান্ত; সুতরাং আর এখানে থাকা আমার কর্ত্তব্য নহে"—এই বলিয়া সত্যশরণ সেস্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, জমিদার গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"বরজলাল!"

"হুজুর!" বলিয়া এক দ্বারবান উপস্থিত হইল। জমিদারের আদেশ হইল—"মরিচখানা মে ইস্‌কো লে যাও।" মরিচখানার অর্থ যে কুঠরিতে দুরন্ত প্রজাদের পূরিয়া লঙ্কার ধোঁয়ার সাহায্যে শায়েস্তা করা হয়।

৫

পদ্মনাভ সত্যশরণের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখপ্রকাশ ও তাহার হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া কিছুতেই জমিদারবাবুর ক্রোধের শান্তি করিতে পারিলেন না। জমিদারবাবু জেদ ধরিয়াছেন—সত্যশরণ যদি তার উদ্ধত ব্যবহার ও উক্তির জন্য তাঁহার উঠানে দশ হাত মাপিয়া নাকে খত দেয় তবেই তাহার নিস্তার। পদ্মনাভ অনেক কাকুতি-মিনতি করায় দণ্ডের পরিমাণ দশ হাত হইতে এক হাতে নামিয়াছিল। কিন্তু সত্যশরণের প্রকৃত পরিচয় পদ্মনাভের তেমন জানা

ছিল না; তাই তিনি ভাবিয়াছিলেন, মরিচখানার দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের আশায় হয় ত সত্যশরণ অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তিটুকু গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবে না। যে ব্যক্তি সত্যশরণের নিকট এই লঘুকৃত শাস্তির বার্ত্তা লইয়া গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাপ্‌রে! এক ফোঁটা বামুন ছোক্‌রাটার কি তেজ!···দুদিন জলগ্রহণ করেনি···তায় দিন দুবার লঙ্কার ধোঁয়া···তবু কি মনের বল!···বলে কি না—বোলো তোমার জমিদারবাবুকে···আমি বশিষ্ঠের জাত···মরবার ভয় রাখি না!"

অবশেষে মনে মনে একরূপ পরাজয় স্বীকার করিয়াই জমিদার বাবু সত্যশরণকে ছাড়িয়া দিলেন। মুক্তিদান কালে কেবল এইটুকু তাহাকে বলিয়া রাখিলেন—"ভেব না—তোমায় মুক্তি দিলুম!"

সত্যশরণ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না—বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। পদ্মনাভের বাড়ী গিয়া শুনিল—তিনি আর এক নূতন পূজারী নিযুক্ত করিয়াছেন। গ্রামের জমিদারের বিষচক্ষে যে পড়িয়াছে, তাহাকে আশ্রয় দিয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিতে তিনি রাজী নহেন!

পরদিন শুনা গেল কালীমন্দিরে সিঁদ দিয়া চোরে দেবী-প্রতিমার সমূহ অলঙ্কার চুরি করিয়াছে।

ইহার দুই দিন পরে জমিদার বাবুর অর্থ বলে এবং পুলিস প্রভুদের মাহাত্ম্যে সত্যশরণ বমালসহ ধরা পড়িয়া থানায় আনীত হইল। বিচারে চুরি সপ্রমাণ হইয়া গেল। বিচারক সত্যশরণকে যথারীতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি দোষী না নির্দ্দোষ ?" উত্তরে সত্যশরণ ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া বলিল—তিনি জানেন।

বিচারক সত্যশরণের তরুণ বয়স ও এই তাহার প্রথম অপরাধ বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি মাত্র এক বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ করিলেন।

কারাগারে যাইবার পূর্ব্বে সত্যশরণ একবার পদ্মনাভের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তিনি সে সময় জমীদার বাবুর বাটীতে স্বস্ত্যয়নের জন্য দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকায় দেখা করিতে পারেন নাই।

*   *   *   *

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কাহারও পক্ষে যেন কত যুগ; আবার কাহারও পক্ষে যেন সেদিনকার কথা! সত্যশরণ জেল হইতে খালাস হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মাণিকপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কালীমন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিতেছিল। সত্যশরণের স্থির বিশ্বাস ছিল যে—মন্দিরে সে নূতন বিগ্রহ দেখিবে···কেন না, যে বিগ্রহের পূজা সে করিত সে বিগ্রহ যে—মায়ের প্রাণ যেমন সন্তানের অকারণ লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইয়া গোপনে পরতে পরতে ফাটিয়া যায়—তেমনি নিশ্চয়ই ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মন্দির সম্মুখে আসিয়া সত্যশরণ দেখিল—তাহার ধারণা ভুল! যে প্রতিমার পূজা করিতে করিতে সে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলিত, যে প্রতিমাকে সে কোন দিন পাথরে-গড়া ভাবিতে পারে নাই, ভাবিতে গেলে নিজেকে বড় নিরাশ্রয় মনে হইত—সে প্রতিমা তো তেমনি রহিয়াছে···মানুষের বুকের ব্যথা স্বার্থের পাষাণ-ভিত্তি ভেদ করিয়া হৃদয়ান্তরে না পৌঁছিতে পারে, কিন্তু ভক্তের ব্যথা যে দেবতার বুকে গিয়া লাগে নাই—এই দৃশ্যে চোখের জলে সত্যশরণের বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল মন্দির-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ও! তুই তাহলে দেবী নস্···মানুষের হাতে-গড়া পাষাণের স্তূপ!···তাই তোরও মানুষের মত ব্যাভার·····হা—হা—হা···" সহসা সেই ভগ্নকণ্ঠে বাতুলের অট্টহাস ফুটিয়া উঠিল। সত্যশরণ ঝড়ের মত কোথায় উধাও হইয়া গেল।

পরিচিতদের মধ্যে কে একজন বলিল—"সত্যশরণ না ?"

"সেই রকম তো মনে হ'ল...দেখচি পাগল হয়ে গেছে—"

"তা হবারই ত কথা···দেবতার জিনিস্ চুরি কর্‌া কি যে-সে পাপ!"

পারসীকগণের গায়ত্রী

(অহুন-বইর্য্য)

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

বিধিনিষেধাত্মক পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থরাজিকে সমাশ্রয় করিয়াই জগতের যাবতীয় মহৎ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই শাস্ত্রগ্রন্থরাজি পুনরায় নিগূঢ়ার্থময় ও পবিত্রতর কতিপয় মন্ত্রের মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত। আবার এই মন্ত্রসমষ্টির কেন্দ্রস্থলে উহাদিগের মূলস্বরূপ একটি করিয়া নিগূঢ়তমতত্ত্বসম্পন্ন পবিত্রতম মন্ত্র প্রায় সকল ধর্ম্মেই বর্ত্তমান। ইহাই ধর্ম্মের প্রাণ—গায়ত্রী। উদাহরণ স্বরূপ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈদিকী গায়ত্রী, খৃষ্ট-ধর্ম্মের **Paternoster,** ইস্‌লাম-ধর্ম্মের "বিস্‌মিল্লা অর্‌-রহমন উর্‌-রহিম্" ইত্যাদি ও প্রাচীন পারস্যধর্ম্মের "অহুন বইর্য্যো"র নাম করিতে পারা যায়।

হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট হিন্দুর গায়ত্রী (বৈদিকী) সাধারণ সূর্য্যস্তুতি বলিয়া বোধ হইলেও, ভক্তিমান্ হিন্দুর (বিশেষতঃ দ্বিজাতির) নিকট যেমন ইহা সার ধন বলিয়া বিবেচিত হয়, জরথুষ্ট্রমতাবলম্বী ব্যতীত অপরাপর জাতির চক্ষুতে "অহুন বইর্য্য" সেইরূপ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যহীন (এমন কি কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রলাপ) বলিয়া বিবেচিত হইলেও, প্রত্যেক স্বধর্ম্মানুরাগী পারসীকের নিকট ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ও জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে পুণ্যশ্লোক জরথুষ্ট্রের উপদেশের সার মর্ম্ম এই মন্ত্রটির মধ্যে নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয়; এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞ ধীমান্ অনুমান করেন যে, মন্ত্রটি উক্ত মহাপুরুষেরই রচনা।

ছন্দঃ ও স্বর অবিকৃত রাখিয়া শাস্ত্রীয় পাঠপদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রটির যথাযথ আবৃত্তি করিলে উচ্চ স্তরে (higher plane) যে "অপূর্ব্ব" (subtle effect) সমুৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাত্মক্রিয়াকুশল থিয়সফিষ্টগণ তাহার প্রকৃত বিচারে সমর্থ। এ স্থলে কেবল সামান্যতঃ উহার অর্থ লইয়া আলোচনা করা

যাইবে। তবে ভূমিকা স্বরূপ এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, মন্ত্রটির অর্থ সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাবিধি উহার আবৃত্তি করিলে, সমগ্র অবেস্তা গ্রন্থ পাঠের ফললাভ হইয়া থাকে। অমূলক বাক্য বলিয়া কেহ যেন এই চিরপ্রচলিত জনশ্রুতিকে অবজ্ঞা না করেন! জরথুষ্ট্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম ইহার অন্তরে নিহিত আছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতএব ইহার পাঠে সমগ্র অবেস্তাপারায়ণের ফল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? এই জন্যই ইরাণীয়গণের যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্যে "অহুন বইর্য্য" আবৃত্তি করিবার বিধান। ইহা যে কেবল ইরাণীয়গণের গায়ত্রী স্বরূপ, তাহা নহে; ইরাণীয় মুমূর্ষুর পক্ষে ইহা তারক-ব্রহ্ম নাম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ও শ্রাদ্ধকালে ইহার বহুবার আবৃত্তি আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহলোকে ও পরলোকে এই মন্ত্রটিই ইরাণীয়গণের প্রধানতম অবলম্বন—শান্তির দ্বার। তাই বলা হইয়াছে—"অহুনেম্-বইরীম্ তনূম্ পাইতি,"—অহুন বইর্য্য তনুকে (আত্মাকে) রক্ষা করে।

কিংবদন্তী এই যে, জরথুষ্ট্র স্বয়ংই মন্ত্রটির রচয়িতা বা দ্রষ্টা। তাহার পর হইতে দেবতাগণ উহা তাঁহাদিগের প্রধান অস্ত্র-রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। নরাধিপ "স্রওযে"র ইহা প্রধানতম অবলম্বন।

তিন পাদে ও ত্রি-সপ্ত পদে মন্ত্রটি রচিত। শুনা যায় যে, প্রাচীন অবেস্তা গ্রন্থও একবিংশতি "নস্‌ক" বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল। আলেক্‌জাণ্ডার কর্ত্তৃক পার্‌সিপোলিস্-নগরী-দাহে উহা বিনষ্ট হয়। (১) অনেকে অনুমান করেন যে, অহুন বইর্য্যের প্রত্যেক পদটি অবেস্তার প্রত্যেক নস্‌কের প্রতিরূপ মাত্র।

মন্ত্রটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এই স্থলে কিছু বলা আবশ্যক। নানা মুনির নানা মত চির দিনই লোকপ্রসিদ্ধ। অতএব মন্ত্রটির বিভিন্ন অনুবাদ, ভাষ্য, ব্যাখ্যা, টীকা ও টিপ্পনী প্রভৃতি যে সর্ব্বসাকল্যে ত্রিশটিরও অধিক হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? কোন কোন পাশ্চাত্য মনীষী ইহাকে দুর্ব্বোধ, অসংলগ্ন ও অর্থহীন বলিয়া স্পষ্টবাদিতা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন! এরূপ সৎসাহস সকলের নাই বলিয়া মন্ত্রটির যথাসম্ভব সরল ও সংলগ্ন ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। মদীয় অবেস্তা-শিক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক, মাননীয় ডাক্তার ইরাক্ জেহাঙ্গীর সোরাব্‌জী তারাপোরওয়ালা মহোদয় আমাকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারেই নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটি লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। মন্ত্রটি মোটেই দুর্ব্বোধ বা অসংলগ্ন নহে; পক্ষান্তরে উহা অতি সরল অথচ গভীরতম সত্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া মন্ত্রটির আলোচনা এখানে সম্ভব হইবে না। তবে আনুষঙ্গিক ভাবে যেটুকু না বলিলে নয়, তাহাই মাত্র বলা যাইবে।

ঋক্‌টি (২) তিন পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে আটটি, দ্বিতীয়ে ছয়টি ও তৃতীয়ে সাতটি পদ—সর্ব্বশুদ্ধ একবিংশতিটি। ছন্দঃ, গায়ত্রী। মন্ত্রটির প্রত্যেক পাদে গড়ে গায়ত্রীর দুইটি পাদ। মোটের উপর মন্ত্রটি দুইটি আর্ষী গায়ত্রী ঋকের সমান।

প্রথম পাদ (৩)—

যথা অহু বইর্য্যো॥ অথা রতুশ্ অষাৎ-চিৎ হচা॥,

[যথা—যেমন, যথা ; অহূ—অহু, গাথায় দীর্ঘ, অসু—পৃথিবীর অধিপতি ; বইর্য্যো—√বৃ—বরণ করা, সর্ব্বশক্তিমান্ (যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ) ; অথা—তথা, তেমন ; রতুশ্—ঋষি ; অষাৎ—ঋতাৎ, ধর্ম্মহেতু ; চিৎ—নিশ্চয়ই ; হচা—সচা, সহ ;]

যেমন নরপতি (এই পৃথিবীতে) সর্ব্বশক্তিমান্, তেমনি ঋষিও (ইহলোকে ও পরলোকে) ঋতপ্রভাব বশতঃ নিশ্চয়ই (সর্ব্বশক্তিমান্) ;

দ্বিতীয় পাদ—

বঙ্‌হেউশ্ দজ্‌দা মনঙ্‌হো॥

শ্যওথননাম্ অঙ্‌হেউশ্ মজ্‌দাই॥,

---

(১) এই জন্য ইরাণীয়গণের নিকট Alexander the Great Alexander the Damned বলিয়া পরিচিত।

(২) আশা করি, এ নাম দেওয়াতে হিন্দু সম্প্রদায়ের কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না। মহর্ষি জৈমিনির মতে তাহাই ঋক্, যেখানে অর্থবশে পাদ-ব্যবস্থা। এখানেও ঠিক সেই ঘটনাই ঘটিয়াছে।—লেখক

(৩) অবেস্তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ বাঙ্‌লা বর্ণমালা দ্বারা দেখান সম্ভব নহে। অনুসন্ধিৎসুগণ Selections from Avesta and Old Persian (P. 152) দেখিতে পারেন। এখানে যতদূর সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণ দেওয়া গেল।

[বঙ্‌হেউশ্‌—বসোঃ, সৎ ; দজ্‌দা—(বৈদিক) দত্তা, দত্তানি, দানানি, দানসমূহ ; মনঙ্‌হো—মনসঃ, মনের ;— বঙ্‌হেউশ্‌ মনঙ্‌হো—এখানে অবেস্তা-ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সমাস হইয়াছে—সদন্তঃকরণের ; শ্যওথননাঁম্— √শ্যু—√চ্যু—(বৈদিক) চ্যৌতনানাম্ (৪), কর্ম্মকারিগণের ; অঙ্‌হেউশ্‌—অসোঃ, প্রাণের জীবিতগণের, প্রাণিরাজ্যের ; মজ্‌দাই-মজ্‌দায়, মেধসে (Geldner)—প্রভুর নিমিত্ত ;] ভূতনাথের (প্রজাপতির) নিমিত্ত যাঁহারা কর্ম্ম করেন, সদন্তঃকরণের দানসমূহ তাঁহাদেরই নিমিত্ত (রক্ষিত থাকে) ; অর্থাৎ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সদন্তঃকরণের দান পাইবার অধিকারী, অর্থাৎ তাঁহাদেরও চিত্ত পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে ;

তৃতীয় পাদ—

ক্ষথ্রেম্-চা অহুরাই আ ॥ যীম্ দ্রিগুব্যো দদৎ বাস্তারেম্ ॥

[ক্ষথ্রেম্—ক্ষত্রম, বীর্য্য,বল ; চা— চ, গাথায় দীর্ঘ, এবং ; অহুরাই—অসুরায়, অসুরস্য, ষষ্ঠী স্থলে চতুর্থী, অসুরের ; যীম্—যম্, যাহাকে ; দ্রিগুব্যো—দরিদ্রেভ্যঃ, দরিদ্রগণকে ; দদৎ—অদদাৎ, দিয়া থাকেন,—অতীত কালের অর্থ ইহাতে নাই ; বাস্তারেম্— সাহায্য ।]

এবং অসুরের (পরমেশ্বরের) বল তাঁহারই জন্য, যিনি দরিদ্রকে সাহায্য দান করেন।

এই স্থলে "অসুর" (অহুর) শব্দটি লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। বৈদিক সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বরুণ, সবিতা, ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ সকলেই "অসুর" বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন। মৈত্রায়ণী সংহিতায় "অহুর" শব্দটিরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার অসুর শব্দের বহুবিধ ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন ; তন্মধ্যে— অসুর (অসু র)=প্রাণদাতা—এই সমাধানই সর্ব্বাপেক্ষা সরল। ন+সুর=অসুর (দেব নহে—দৈত্য)—এ ব্যুৎপত্তি প্রাচীন বৈদিকী সংহিতায় পাওয়া যায় না। এখন কিন্তু এই শেষোক্ত অর্থই সাধারণের পরিজ্ঞাত। ইরাণীয় "অহুর" শব্দ বৈদিক "অসুর" শব্দের প্রতিরূপ মাত্র।

"রতু" ও "অষ" শব্দও সম্পূর্ণ নূতন। রতু বলিতে বুঝায় জ্ঞানী, নব নব দ্রব্যের আবিষ্কর্তা, দ্রষ্টা বা সংস্কৃত পর্য্যায়ের ঋষি। ইনি অন্তর্জগতের প্রভু—অধ্যাত্ম-জগতে শক্তিমান্। আর "অহু" ঠিক ইহার বিপরীত—বহির্জগতের প্রভু—নরপতি। জরথুষ্ট্র স্বয়ং একাধারে রতু ও অহু—রাজর্ষি। উভয় জগতেই তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি রাজবংশীয় ; অতএব অহুত্বে তাঁহার জন্মগত অধিকারও বিদ্যমান।

রতু ও অহুগণের মধ্যে রতুই সমধিক প্রভাবান্বিত। ইহার কারণ তাঁহার "অষ" বা "ঋত"। ভাষা-তত্ত্বের নিয়মাবলী অনুসারে অষ ও ঋত সমপর্য্যায়ভুক্ত। "ধর্ম্ম" শব্দের দ্বারা ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটুকু সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না। কবিবর Tennysonএর ভাষায় বলিতে গেলে—

"One God, one Law, one Element,
And one far-off Divine Event,
To which the whole Creation moves"
(In Memorium)

—ইহাই "অষ"। এই অষকে পরের যুগে আমরা দেবতা যোনিরূপে পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাই। অহুর মজ্‌দের ছয়জন প্রধান পার্শ্বচর-পার্শ্বচরী (৫)। ইঁহাদিগের সাধারণ নাম —"অমেষা স্পেন্‌তা" (পবিত্র অমরগণ)। ইঁহাদিগের অন্যতম "অষ-বহিশ্‌ত"—এই ঋতের রূপান্তর এবং স্বর্গস্থ অগ্নির অধিপতি। "বোহু-মনো" পশুগণের অধিপতি। "ক্ষথ্র-বইর্য্য"—ধাতুগণের অধিপতি। ইঁহারা তিনজনই পুরুষ, এবং যথাক্রমে উক্ত মন্ত্রটির পাদত্রয়ে উল্লিখিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর তিনজন স্ত্রী দেবতা আছেন ;—"স্পেন্‌ত আর্‌মইতি"—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও অষের সহ-যোগিনী। অপর দুইজন যমজ ভগিনী—"হউর্ব্বতাৎ" ও "অমেরেততাৎ" (অমৃততাৎ)—যথাক্রমে জল ও উদ্ভিদ্ জগতের অধিষ্ঠাত্রী। এই ছয়জনই প্রধান। এতদ্ব্যতীত নরাধিপ "স্রওষ"ও অহুরমজ্‌দের খুব প্রিয়। তিনি ভক্তির দেবতা। মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাঁহারই অধিকারে আইসে। "অষি" (আশীঃ)—একজন অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীদেবতা, অহুরের নিরতিশয়

(৪) ঋ. রে. সং.—১০।৫০।৪

(৫) প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা তাঁহার এক একটি aspectএর personification মাত্র—অনেকটা archangelগণের অনুরূপ।

প্রীতিভাজন। পরের যুগে ইনি সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী "শ্রী" বা "লক্ষ্মী" রূপে পরিণত হইয়াছেন। আর অহুর মজ্‌দের পুত্র হইতেছেন "আতর্"—স্বর্গীয় অগ্নি স্বয়ং। ইহাই হইল অহুরমজ্‌দ ও তদীয় ব্যূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

প্রথম পাদে এই অষের কথা বলা হইয়াছে। অষের প্রভাবে রতু পরলোককে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছেন। অতএব ইহলোকের অধিপতি অপেক্ষা তিনি শতগুণে অধিক শক্তিমান্। সকল দেশেই ঋষির মহত্ত্ব একরূপ সর্ব্ববাদি সম্মত। অষই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঐশী ইচ্ছা অনুসারে যে রতু চালিত হইয়া থাকেন, তিনি সকল অধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত—ধর্ম্মশক্তিতে শক্তিমান্। তুচ্ছ পার্থিব শক্তি তাঁহার নিকট পরাজিত। ইহাই প্রথম পাদের সারমর্ম্ম।

দ্বিতীয় পাদে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, সদন্তঃকরণের দান সমূহ তাঁহারাই প্রাপ্ত হ'ন। অর্থাৎ যাঁহারা সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া মানবজাতিকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যান, তাঁহারাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কর্ম্ম করেন ; এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ মার্জ্জিত হইতে মার্জ্জিততর, এবং ধীশক্তি পরিস্ফুট হইতে পরিস্ফুটতর হইতে থাকে। জ্ঞানের আলোকে তাঁহাদিগের চিত্ত উদ্ভাসিত হয়। তাঁহারা স্বয়ং যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, মানবজাতিকে উন্নত করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি ততই তাঁহাদিগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে "শ্যওথন" শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ইরাণীয় জাতি কর্ম্মমার্গের সাধক ছিলেন। যখন কোন পারসীক তাঁহার মেখলা (যজ্ঞোপবীত ?) কটিদেশে বন্ধন করেন, তখন তাঁহাকে দুইবার 'অহুন বইর্য্য' আবৃত্তি করিতে হয়, এবং সম্মুখের গ্রন্থিদ্বয় "শ্যওথননাঁম" বলিয়া বন্ধন করিতে হয়—যেন তিনি কর্ম্ম করিবার জন্যই কোমর বাঁধিতেছেন। প্রকৃতির সহিত পুরুষের (জীবের) যে অবিশ্রান্ত সংঘর্ষ অহোরাত্র চলিতেছে, অবেস্তার দার্শনিক অংশে তাহারই রহস্য উন্মুক্ত হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক নরনারী এই সংঘর্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ ; কিন্তু সকলে তাহার বিষয় অবগত নহে। অষের বিধানানুসারে ইরাণের প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ আপনাকে সদা সর্ব্বদা এই অনাদি অনন্ত মহাসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত বলিয়া মনে করেন। বৈদান্তিকের মোক্ষ তাঁহাদিগের প্রার্থনীয় নহে ; সংসার-সংগ্রামে জয়লাভ করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ইহাই তাঁহাদিগের মূলমন্ত্র—ইহাই অষ। যাঁহারা এই বিধানের অনুকূলে যোগ দেন, জ্ঞানের আলোকে তাঁহাদিগের চিত্ত উদ্ভাসিত ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া থাকে ; ক্রমে মোক্ষ নিকটবর্ত্তী হয়।

আদিযুগে অষের প্রাধান্যই সর্ব্বসম্মত ছিল, পরের যুগে (খুব সম্ভব অবেস্তা পুনর্লিপিবদ্ধ হইবার সময়ে) বোহুমনো তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। চিত্তগুহায় জ্ঞানের দীপ জ্বালিবার অধিকার বোহুমনোর। সুতরাং বোহু-মনোকে জ্ঞানাধিষ্ঠাতা বলিয়া ধরিলে, অষকে ভক্তির অধিষ্ঠাতা বলা চলে। আর ক্ষথ্র হইলেন কর্ম্মাধিপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রটির মধ্যে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমুচ্চয় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় পাদে বলা হইয়াছে যে, দরিদ্রকে যিনি সাহায্য করেন, অহুরমজ্‌দের বীর্য্য তাঁহাকে বলান্বিত করে। দরিদ্র বলিতে শুধু অর্থহীন নহে। যীশু যাহাকে Poor (in spirit) বলিয়াছেন, এ সেইরূপ দরিদ্র। এ দরিদ্রের উন্নতির জন্য যে মহাপ্রাণ সর্ব্বদা চেষ্টিত, একাধারে জ্ঞান ও ঐশী শক্তি তিনি লাভ করেন।

ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম,—অচ্যুত, শঙ্কর, পদ্মযোনি,—অষ, বোহুমনো, ক্ষথ্র—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এ তিনের (Trinity) অপূর্ব্ব সমন্বয় এ মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিগুণের আধার, গুণাতীত অহুরমজ্‌দের বিধানের কথাও ইহাতে উল্লিখিত রহিয়াছে। দরিদ্রকে সাহায্য দান—অমরাভূমিতেও যে গুণের শতমুখে প্রশংসা—সেই স্বর্গীয় গুণের প্রশংসা ইহাতে বর্ত্তমান। বস্তুতঃ মহাপ্রাণ জরথুষ্ট্রের উপদেশের সারমর্ম্ম ইহাতেই নিহিত আছে। এখন বুঝুন, পাঠক, এই মন্ত্রের সকৃদুচ্চারণে সমগ্র অবেস্তা-পারায়ণের ফললাভ হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায়, হর্ষে বিমর্ষে সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ পারসীক আজিও এই মন্ত্রপাঠে অন্তরে অন্তরে শান্তির বিমল আনন্দ অনুভব করেন। বৈদেশিক পণ্ডিত-

মণ্ডলী ইহার সরল অথচ গভীর সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই মন্ত্রটিকে কদর্থিত করিতেছেন। এ মোহ হইতে পারসীকগণ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিলে তাঁহাদিগের অদৃষ্টে কি আছে কে বলিবে ?

একটি কথা! পারসীকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপর বর্ণ নাই। সুতরাং এ গায়ত্রী পাঠে পারসীক মাত্রেরই অধিকার। পারসীক গায়ত্রীর ইহাই বৈশিষ্ট্য।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

রক্তকরবী

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ

এই যে ফুল্ল-রক্ত-কুসুমের সম্ভার-সমন্বিত অপূর্ব্ব-সুন্দর সমৃদ্ধ রক্তকরবী বৃক্ষটী আমরা দেখিতেছি—ইহা একেবারে শূন্য আকাশ হইতে সম্ভব হয় নাই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুবিস্তীর্ণ উদার উদ্যানে সন্ধান করিলে নানা স্থানে ইহার বীজাঙ্কুর পাওয়া যাইবে। গ্রন্থের প্রারম্ভ-পৃষ্ঠার শিরোভাগেই দৃষ্ট হইতেছে—'এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণের আড়ালে বাস করে।'—পড়িলেই তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে রবিবাবুর 'রাজা' নাটক-খানির রাজার সেই প্রহেলিকাময় অন্ধকারের আবরণের আড়াল—তাঁহার সেই সঙ্গোপনে বাস—যাহাতে রাণী পর্য্যন্ত রাজার মূর্ত্তিখানি দর্শন করিতে পারেন না। * 'রাজা' ও 'রক্তকরবী'র সাদৃশ্য এইখানেই শেষ। এ রাজা একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার রাজা ; সে রাজা শুধু সনাতন সত্যের রাজা নয়—স্বয়ং সত্য-স্বরূপ। আবার এক হিসাবে বলিতে পারি—'অচলায়তন' নাটকখানির একটী বৃহত্তর, উন্নততর, গভীরতর এবং মার্জ্জিততর সংস্করণ এই 'রক্তকরবী'। সেখানকার অচলায়তন বড় হইয়া এখানকার যক্ষপুরী হইয়াছে। সেখানে ছিল রক্ষণশীল হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রস্তরীভূত কাঠামখানি—অবশ্য কবির কল্পনায় যেরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল—আর এখানে জড়-ধর্ম্মী মানব-সংসার, অর্থাৎ এই বিশাল পার্থিব প্রতিষ্ঠান। এই ক্ষুদ্র বৃহতের পার্থক্য বাদ দিলে, দুইখানি নাটকের বহিরঙ্গ-সংস্থান একই জল্পনা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

রবিবাবুর একটী গল্প আছে—তাহার নাম—'একটা আষাঢ়ে গল্প'। তাহাতে হিন্দু-সমাজকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কৃত্রিম অপরিবর্ত্তনীয় নির্দ্দিষ্ট বিধি-বিধানের যে জটিল জালের বর্ণনা আছে, এবং সেই জালের যে পরিণাম প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা, আর এই রক্তকরবীর জটিল জাল, একই কল্পনার সূতায় গাঁথা এবং সেই সূতাও একই উপাদানের। কবির একটী কবিতা আছে—নাম 'মন্দির'। মন্দিরটীর মধ্যে বায়ু ও আলো প্রবেশের পথ নাই বলিলেই হয়। ঘোর অন্ধকার। এক ব্যক্তি সেই মন্দিরে অন্ধকারে দেবারাধনা করে—কিন্তু দেবতার দেখা পায় না। একদিন বজ্রাঘাতে মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল। লোকটীর প্রাণ রক্ষা হইল। সে দেখিল, যাহার প্রতীক্ষা করিয়া সে বদ্ধ অন্ধকারে বসিয়া ছিল, সে আকাশে বাতাসে আলোকে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। ঐ মন্দির আর এই যক্ষপুরী অনেকটা এক প্রকারের ইট-পাথরেই নির্ম্মিত। আর একটী কবিতা আছে—নাম 'শীতে ও বসন্তে'। তাহাতে অতি সুন্দর রঙ্গ-ভরে বর্ণনা করা হইয়াছে—বসন্তের চঞ্চল মধুর হাওয়া আসিয়া কবির সারা বৎসরের সঞ্চয় উড়াইয়া লইয়া গেল ; এবং কবির চিত্তখানিও আকাশের মধ্যে ছড়াইয়া দিল। ফল কথা, যে সমস্ত কল্পনার রঙে রক্ত-করবী রঞ্জিত, তাহা কবির শিল্প-শালার সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—তবুও এই রক্ত-করবী নামক নাটকখানি এক অতি অ-পূর্ব্ব অভিনব মনোরম বস্তু। ইতিমধ্যে জ্ঞানিগণ, পণ্ডিতগণ, সাহিত্যের সমজদারগণ ইহার অনেক সমালোচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি খুব সাধারণ ও সহজ ভাবে বুঝিবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব। যদি ভুল বুঝি, তবে জ্ঞানিগণ কৃপা করিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন, এই ভরসা।

এই গ্রন্থখানি একখানি রূপক-নাটক। রূপকটা মুখ্য—নাটকটা গৌণ। কিন্তু গৌণ হইলেও নাটকই। কারণ ইহাতে অবস্থা পরিবেশের মধ্যে জীবনের ব্যাপার এবং প্রাণের ক্রিয়া এবং ইহাদের পারস্পরিক প্রভাব-পরিবর্ত্তনাদি সাক্ষাৎভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে। জীবনের ও প্রাণের যতখানি ইহাতে আসিয়াছে - তাহা সত্যই ; তত্ত্ব-বিশ্লেষণের শুষ্ক উদাহরণ মাত্র নহে। রূপকটী পরিত্যাগ করিয়া শুধু নাটকখানি বুঝিতে চেষ্টা করিলে পদে পদেই সম্মুখে একএকটী প্রহেলিকা বা ব্যাসকুট আসিয়া উপস্থিত হইবে—যাহা পাঠকের জ্ঞান-বিক্ষেপ ঘটাইবে এবং রসানুভবের বাধা উৎপাদন করিবে। কিন্তু

---

* 'রাজা' নাটকখানি পড়িলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হইবে—গ্রীক পুরাণের সেই Cupid and Psycheএর মনোহর উপাখ্যানটী।

রূপকের ভাব-সমন্বয়ে পড়িতে গেলে গ্রন্থখানি এক দিকে যেমন অপরিসীম আনন্দ দান করিবে, অন্য দিকে তেমনি চিত্তে অশেষ জ্ঞানও স্ফূরিত করিয়া তুলিবে। জীবনের গতি-বিধি ও ক্রিয়া-কলাপের আবরণে প্রত্যক্ষ ভাবে তত্ত্ব প্রকাশ করার নামই রূপক। যাহা আবরণ সুতরাং অপ্রধান—তাহাকেই প্রধান-রূপে বর্ণনা করা হয়। অথচ এমন ভাবে, যেন তাহাদের কথায় কথায় প্রতিপাদ্য যে তত্ত্ব, তাহার ইঙ্গিত অনিবার্য্য-রূপে আসিয়া পড়ে। রক্তকরবীর সর্ব্বত্রই এই প্রকার রচনার আদর্শ পরিলক্ষিত হইবে।

রক্ত-করবীতে দুইটী তত্ত্বের সংঘর্ষ এবং সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। একটী স্বর্ণ-বর্ণ, একটী রক্ত-বর্ণ। একটী সুবর্ণের রাশি, একটী রাগময়ী রক্তকরবী। কামিনী-কাঞ্চন কথাটীর কামিনী শব্দের প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থ ছাড়িয়া দিয়া, বৈষ্ণব-দর্শনের এবং মহাকবি গেটের অর্থটী গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব-দর্শনে কামিনী মানে ভগবৎ-প্রেমময়ী। কারণ 'প্রেমৈব গোপ-রামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং'। কাজেই প্রেমময়ী গোপ-রমণীরা সকলেই কৃষ্ণ-কামিনী। গেটে বলিয়াছেন—

> The eternal womanly
> Draws us above.* (Faust)

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে এক অনাদি কামিনী আছে, সে মানুষকে বৈকুণ্ঠের দিকে লইয়া যায়।

এই অর্থ—ইহাই প্রকৃত অর্থ—ধরিয়া বলিতে পারি, রক্তকরবীতে কাঞ্চনের সহিত কামিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই নাটকের রক্তকরবী এক প্রকার লাল রঙের ফুল, আর ইহা নন্দিনীর আদরের নাম। নন্দিনী এই নাটকের নায়িকা। এখানে রক্তকরবীকে একটী নিদর্শন রূপে—একটী অভিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। একটী Symbol—ইহা কিসের নিদর্শন? গ্রন্থে তাহা পরিষ্কার রূপেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। নন্দিনী বলিতেছে—'আমার রঞ্জনের ভালবাসার রং রাঙা, সেই রং গলায় পরেছি বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।' রক্তকরবী বুকের রঙের ফুল—প্রাণের ভালবাসা—অনুরাগ—প্রেম। লাল ফুল অনেকই আছে—রক্তজবা, রঙ্গন, অশোক, পলাশ, সন্ধ্যামণি, দুপুরচণ্ডী। রক্তকরবী নামটী বাছিয়া লইবার কারণ কি? রক্তকরবীতে অতি-পরিচয়ের মলিনতা নাই। যে সমস্ত লাল ফুলের নাম করিলাম, তাহাদের মধ্যে রক্তকরবীই সবচেয়ে সুদৃশ্য। তৃতীয় কারণ—রক্তকরবীর নামের মধ্যে ঐ অর্থপূর্ণ 'রক্ত' কথাটী রহিয়াছে। তবে রক্তজবা বলিলেই হইত। না, রক্তজবা অতি পরিচিত এবং উহার ভাবানুষঙ্গ—association কবির এখানকার উদ্দেশ্যের বিরোধী। সুতরাং রক্তকরবীই যোগ্যতম নাম হইয়াছে। শুধু এই নামটীতেই একটু কাল্পলৌকিকতা—একটু romance আসিয়া গিয়াছে। আরো একটী কথা। করবী(র) ফুলের একটি নাম হরিপ্রিয়—আবার লক্ষ্মীর নাম হরিপ্রিয়া। কাঞ্চন শব্দের মানে সোনা আর লক্ষণায় ধন—বিষয়-সম্পত্তি-সম্ভারবান্ অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা-সমাকুল সংসার। রাজা হইলেন এই সংসারের নায়ক।—ইহার শক্তি-রূপী—সংসারী। সংসার হয় বিষয় লইয়া। বিষয় পাঞ্চভৌতিক—জড়াত্মক। ইহা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য। বিষয়-ভোগে—বিষয়-অর্জ্জনে পরিতৃপ্তি নাই। ন জাতু কামঃ কাম্যানামুপভোগেন শাম্যতি। ভোগের নেশা কখনো কখনো শুধু অর্জ্জনের নেশায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই নাটকের রাজা যে বিষয়ের অধিপতি তাহা শুধু সাধারণ ধনার্জ্জন এবং স্বাভাবিক সম্ভোগাদি নহে। ইহা এক অসাধারণ অস্বাভাবিক উদগ্র উন্মত্ত সংকল্প—অপরিমিত বিত্তার্জ্জনের জন্য। এই রাজার কাহিনী পড়িতে পড়িতে পাশ্চাত্য পুরাণজ্ঞগণের মনে পড়িবে—ফ্রিজিয়ার রাজা মিডাসের কথা। অগণিত ধনরত্ন রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াও যখন তার ধন-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না, তখন সে দেবতার কাছে বর মাগিল—যেন তাহার স্পর্শমাত্র সমস্তই সোনা হইয়া যায়। দেবতা তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন। রাজা প্রথমতঃ খুব এক চোট কাঠ-পাথর ছাই-মাটী সমস্তই ছুঁইয়া ছুঁইয়া সোনা করিয়া লইল। পিপাসায় জল পান করিবে, ছুঁইতেই জলটা সোনা হইয়া গেল। মহা বিপদ। পিপাসায় প্রাণ যায়। একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা, তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্রই সে একখানি প্রাণহীন সুবর্ণ-প্রতিমায় পরিণত হইয়া গেল। তীব্র বেদনায়—নিদারুণ নিরাশায় রাজার চৈতন্য হইল। বুঝিল—এ যে আত্ম-ঘাতী লোভ! তখন সে দেবতার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া কহিল—দেবতা, তোমার এ সর্ব্বনেশে বর ফিরাইয়া লও। এই নাটকের রাজাও সেই রাজারই বংশধর। এবং ইহারও সেই প্রকার কিছু ব্যাপারেই চৈতন্য হইবে।

কবি যখন এই যক্ষরাজ এবং তাহার যক্ষপুরীর কল্পনা করিতেছিলেন, তখন খুব সম্ভবতঃ তিনি ভারতবর্ষের কথা ভাবিতেছিলেন না। ভাবিতেছিলেন ইয়োরোপ আর আমেরিকার কথা। বিষয়-সম্পদ অর্জ্জনের জন্য ঐ সমস্ত দেশেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা, বিপুল ব্যস্ততা, বিশাল কর্ম্ম-চঞ্চলতা। ইহাই আধুনিক সভ্যতা। সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র, সমস্তই এই ধনোন্মাদ। বর্ত্তমান সভ্যতা ধনোপার্জ্জনের জন্য অনন্তবিধ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে। শত শত রেলগাড়ী, সহস্র সহস্র জাহাজ, লক্ষ লক্ষ ফাক্টরি, মিল, মেসিন, কল-কারখানা—অন্ত নাই। বিদ্যুৎবেগে দেশ-দেশান্তে সংবাদ চলিয়া যায়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়লার খনি, লৌহ-খনি, স্বর্ণ-খনি, রৌপ্যের আকার, হীরকের আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে—এবং অহোরাত্র কর্ম্ম-ব্যাপৃত রহিয়াছে। শূন্যে জাহাজ চলিতেছে। ভূ-গর্ভে রেলগাড়ী চলিতেছে। বাণিজ্য সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। শত শত লক্ষেশ্বর ও কোটীশ্বরের উদ্ভব হইতেছে।

---

* অনুবাদ ঠিক কি না বুঝিবার জন্য মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, ইহা প্রায় অক্ষরানুবাদ। মূলে আছে—

> Das Ewig—weibliche
> Ziecht uns hinan.

Heard the heavens fill with shouting and there
rained a ghastly dew
From the nations' airy navies grappling in the
central blue.
—(Tennyson)

আকাশে অই প্রতিবিম্ব—শুধু প্রতিধ্বনি নয় এই বাণিজ্যের উন্মাদনার। ভোগবিলাসিতা একটা রাক্ষসী মূর্ত্তিতে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। সহস্র সহস্র বিমান-স্পর্শী বিরাট-কায় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছে। মহল্লার পর মহল্লা উঠিতেছে। মঞ্জিলার উপর মঞ্জিলা উঠিতেছে। বিজ্ঞান সেবা-দাসীর মত সহস্র প্রকারে অবিশ্রান্ত মানুষের আরামের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য বৃহৎ পাহাড় কাটিয়া আনা হইতেছে। কত মর্ম্মর—কত রি-ইন্‌ফোর্স্‌ট্ কংক্রীট্। স্তূপে স্তূপে লৌহ ভীষণ-দর্শন অগ্নি-কুণ্ডের মধ্যে বিগলিত হইয়া প্রথমতঃ জ্বলন্ত দ্রবময় স্রোতোময় রূপ ধারণ করিয়া পরে নানা আকারে নানা প্রকার গৃহ নির্ম্মাণের উপাদান সামগ্রীতে পরিণামিত হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র আকাশ ভেদ করিয়া ধ্বনি উঠিতেছে—অর্থ! অর্থ!—ভোগ চাই! কাম চাই! সে ত পরের কথা। না হয় না হবে। কিন্তু অর্থ চাই-ই—স্বর্ণ চাই-ই। সোনার ঘরে বাস করিব। সোনার খাটে শুইব। সোনা খাইব। সোনা পরিব।

Every door is barr'd with gold, and opens but
to Golden Keys—

ইহা ত তুচ্ছ কথা।

এই যে বিকট-বিষয়-লোভ-মত্ততা ইহা যাহার, যে ইহার আশ্রয়, সেই পাষাণ-চিত্ত বিত্ত-লোলুপ প্রেম-গন্ধ-হীন কামান্ধ মানবই এই নাটকের রাজা। ইহাই হইল এক তত্ত্ব এই নাটকের। এই তত্ত্ব এখানে কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে তাহা আমরা যথাসময়ে দেখিব। এই তত্ত্বকে নানা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে ইহা বিষয় এবং সংসার—বৈষয়িকতা ও সাংসারিকতা। পাঞ্চভৌতিক ভোগোপায় এবং ভোগোপাদান ইহার দেহ। আর কাম-ক্রোধাদি ষড়-রিপু ইহার আত্মা। বিষয়ী মানুষ ইহার আশ্রয়। অপর তত্ত্বটী কি, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে 'ভাব'-নামে অভিহিত করিতে পারি। ইহার ইংরাজী নাম Spirit—ব্যাপকার্থে। বিষয়—Matter; ভাব—Spirit। ইহার আর একটী বাংলা নাম (সংস্কৃত নহে) 'প্রাণ'। 'মনে ও প্রাণে' বলিতে প্রাণ-শব্দে আমরা এই ভাব-বৃত্তি বুঝি। যাহাকে Spirit বলিলাম তাহাকে বিশেষার্থে Feelingও বলিতে পারি। তখন ঐ ভাবকে বাংলায় বলিব 'রস'। শুদ্ধ যে Feeling, বিষয়-স্পর্শ-হীন, তাহাকে বলা হয় Sentiment। সকল রসের প্রাণ-স্বরূপ একটী মূল রস আছে। যে আদি-রস কথাটীর অর্থ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, ইহা সেই আগু আদি রস। ইহার প্রকাশ আনন্দে।" সাধারণতঃ ইহাকে 'প্রীতি' বলা হয়, ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের 'ভালবাসা'। ইহারি রূপ-ভেদ স্নেহ, আদর, সোহাগ। এই যে প্রীতি ইহা সৌন্দর্য্যের জননীও, আবার কন্যাও। যাহা সুন্দর তাহাই ভালবাসি। যাহা ভালবাসি, তাহাই সুন্দর হয়। এই প্রীতিই গুরুত্ব লাভ করিলে 'প্রেম' হয়, নর-নারী সম্পর্কে ইহার নাম 'অনুরাগ'। ভক্তের নির্ম্মল হৃদয়ে ইহা 'ভক্তি'। এই যে বস্তুটীর কথা বলিতেছি ইহাই কাব্যে এবং সাধারণ সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়া সাহিত্যকে নানা রূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। ইহা সঙ্গীতের সঞ্জীবনী-শক্তি। ইহাই সকল শিল্প-রচনার মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া মনোরম ললিত রূপ-গুলিকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। রস-স্বরূপ ভগবানের যে হ্লাদিনী শক্তি তাহাই এই সমস্তের মূলীভূত কারণ। এই হ্লাদিনী মূর্ত্তিমতী হইয়া গোলোকে ও গোকুলে শ্রীরাধা—ভাবময়ী—প্রেমময়ী—প্রীতিময়ী। হ্লাদিনী শব্দের মানে নন্দিনী বা আ-নন্দিনী। এই নন্দিনীই রক্তকরবী-নাটকের সর্ব্বময়ী নায়িকা। ইহার আদরের নাম রক্তকরবী। রক্ত মানে রাগযুক্ত। করবী মানে কুসুম। অর্থাৎ অনুরাগের কুসুম। সৌরভময়ী সৌন্দর্য্যময়ী অনুরাগ স্বরূপিনী আমাদের এই রক্তকরবী নাম্নী মানবী দেবীটী। এক রন্‌জ-ধাতু হইতেই রাগ, রক্ত ও রঞ্জন শব্দ তিনটী উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ এই 'রাগময়ী' 'রক্ত'-করবী নাম্নী রমণীটী 'রঞ্জন' হইতে ভিন্ন নহে,—'রঞ্জনেরই' আ-'নন্দিনী' শক্তি। কবি যাহাকে রঞ্জন বলিতেছেন, তাহাকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রেই 'নন্দ-নন্দন' নামে অভিহিত করা হয়। এই নন্দ-'নন্দনের' প্রেমময়ী প্রেয়সী যিনি তিনিই ত 'নন্দিনী'—অর্থাৎ আ-'নন্দিনী' রাধা।

গোবিন্দা নন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী।—চরিতামৃত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, নন্দিনী বলিতেছে—'আমার রঞ্জনের ভালবাসার রং রাঙা, সেই রং গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।' শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনায় বৈষ্ণব-শাস্ত্র বলিতেছেন—

কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রের কলেবর।

আর—কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।

রঞ্জনের নন্দিনী 'রক্ত-করবীর মধু দিয়ে ভরে' রাখে।' আর রাধারাণী—'কৃষ্ণকে করায় সোমরস-মধু পান।' 'ভক্তি রসামৃত-সিন্ধু' শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে ৫০টী গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একটী গুণ হইল—তিনি লোকানুরঞ্জন।—'রক্ত-লোকঃ। নন্দিনীর প্রিয়তম যিনি তাঁহার নাম রঞ্জন। ইনি সেই—'সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন।' 'বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দং'—এ সেই রঞ্জন। নন্দিনী বলিতেছে—'ছুটি কি করে' মধুতে ভরে' তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড় সুন্দর।' শ্রীভগবান্

আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন। (চরিতামৃত)

যাঁহার 'সুবিলাস হাসং' আননখানি

নিত্যোৎসবং ন তত্বপুর্দৃশিভিঃ গিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ। (ভাগবত)

নন্দিনীর প্রাণ রঞ্জনময়। সর্ব্বদাই নন্দিনীর মুখে রঞ্জনের কথা।

'রঞ্জনের কথা উঠ্‌লে নন্দিনীর মুখ আর থাম্‌তে চায় না।' সবাইকে সে জিজ্ঞাসা করে—'কই রঞ্জন ত এল না।' রঞ্জনের প্রতীক্ষায়—রঞ্জনের পথ পানে সর্ব্বদা সে চাহিয়া থাকে। রঞ্জনের চূড়ায় পরাইয়া দিবে বলিয়া সে নীল-কণ্ঠ পাখীর পালক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখে। রঞ্জনের জন্য তার রক্ত-করবীর মালা। সে বলে—'রঞ্জনের জয়-যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে।' রঞ্জনের গৌরবে সে নিজকে গৌরবান্বিতা মনে করে। এ দিকে পাইতেছি—

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।

নন্দিনী সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখিয়াছে—রক্তকরবীর মালা। রক্ত-করবী রঞ্জনের ভালবাসা। এ দিকে—

কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ-অবতংস কানে,
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে।

আবার, রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ সুগন্ধি উদ্‌বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ।

নন্দিনী রঞ্জনের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিতা। বৈষ্ণব কবি বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীমতী কৃষ্ণ-বিরহে পাগলিনী-প্রায় হইয়া যার তার পায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'তোমরা দেখেছ তারে?—বল না লো সই!'

আবার, 'যাও সহচরী, জানিয়া আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে!'

বিশ্বের সকল প্রেম-ব্যাপারের মুখ্য লক্ষ্য যিনি, যিনি সকল প্রীতি-ভালবাসার নিত্য সত্য বাস্তবিক বিষয়—তিনি রঞ্জন। সকল প্রীতি-প্রেমের প্রাণ-স্বরূপিনী যিনি তিনি নন্দিনী।—ভাবময়ী ও রাগময়ী! তাহা হইলে এই দ্বিতীয় তত্ত্ব হইল—ভগবৎ-ভক্তি বা ভগবৎ-প্রেম। রঞ্জন ও নন্দিনী—প্রেমের বিষয় এবং প্রেমের আশ্রয়। এই তত্ত্বকে সংক্ষেপে 'ভাব' বলিব। এই ভাবের অন্তর্গত সকল সৌন্দর্য্য ও সকল আনন্দ। সৌন্দর্য্য রঞ্জন, আনন্দ নন্দিনী। আনন্দ ও প্রেম পরস্পর ভাবান্তরিক। সৌন্দর্য্য ব্যতীত মানব মনোরঞ্জন জগতে আর কিছু নাই। তাহা হইলে রক্তকরবী-নাটকের প্রতিপাদ্য হইল—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত ভাবের প্রতিকূল ও অনুকূল নানা প্রকার সম্বন্ধ। এই বিষয়-তত্ত্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইল—রাজা, সর্দ্দারগণ, অধ্যাপক, পুরাণ-বাগীশ, কান্তলাল, গোকুল, চন্দ্রা প্রভৃতি। ইহাদের কেহ কেহ একটু আধটু ভাবের অনুকূল—অনেকেই প্রতিকূল। ভাব-তত্ত্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইল—নন্দিনী, রঞ্জন, বিশু, কিশোর। এইবার আমরা দেখিব এই তত্ত্ব দুইটী নাটকে কি ভাবে বিবৃত হইয়াছে এবং কি ভাবে মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

নাটকের দৃশ্য-সংস্থান হইয়াছে যক্ষপুরী নামক নগরে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে ব্যাপ্রিয়মান সংসার এখানে যক্ষপুরীরূপে কল্পিত হইয়াছে। যক্ষ-পুরীর রাজ-প্রাসাদ জটিল জালাবরণে আচ্ছাদিত। রাজা সেই আবরণের অন্তরালে বাস করেন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিতে মানুষের অন্তরাত্মাটীকে পাঁচটী আবরণের ভিতরে গোপন করিয়া রাখিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রে ইহাদিগকে বলে পঞ্চ কোষ—দেহ—প্রাণ—মন—জ্ঞান—আনন্দ। মানুষ আবার এই পঞ্চাবরণময় মানুষটীকে অন্ততঃ পঞ্চ শত কৃত্রিম জালে জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অভ্যাসের জাল, অবস্থার জাল, আচারের জাল ব্যবহারের জাল, নীতির জাল, রীতির জাল, প্রথা-পদ্ধতির জাল, পোষাক-পরিচ্ছদের জাল—জালে জালে মানুষটী একেবারে শত পাকে জড়ান'—মাকড়সার জালে মাছিটীর চেয়েও শত গুণে বেশী। এ ত সব গেল ব্যক্তিগত জাল। ইহা ছাড়া জাতি-গত, সমাজ-গত, ধর্ম্ম-গত, ব্যবসা-বাণিজ্য-গত কত শত জাল আছে—মানুষের একেবারে গায়ে-লাগা না হইলেও চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে—চিড়িয়াখানার পাখীর চারিদিকে—অথবা বেড়-জালের মাছের চারিদিকে যেমন থাকে। মানুটীকে আর চিনিবার যো নাই। সে যে কোন্ গহনে—কোন্ গহ্বরে থাকে—তার আর সন্ধান পাবার উপায় নাই।

রাজা হইতেছেন এই সংসারী বিষয়ী শত-জাল-জড়িত মানুষের একান্ত প্রতিনিধি। কাজেই তিনি জালাবরণের অন্তরালে বাস করেন। এই জালাবরণ হইতে বাহির হইবার ব্যাকুলতায় নিরাশ-ভাবে কবি ম্যাথু-আর্নল্‌ড্ বলিয়াছেন,—

Nor will that day dawn at a human nod,
When, fursting through the *net-work* superposed
By selfish occupation, plot and plan,
Lust, avarice, envy—liberated man,
Shall be left standing face to face with God.

মানুষের ইচ্ছা মাত্রেই এই জটিল জাল ছিন্ন হইয়া মানুষের মুক্তি হইবে না, ইহা সত্য; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা মাত্রে ইহা সংসাধিত হইতে পারে। রক্তকরবী নাটকে এই জালাচ্ছাদন হইতে মানুষের মুক্তি সংসাধন প্রদর্শন করা হইয়াছে।

মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা আরম্ভ হয় তখনি, যখনি সে স্বভাবের ও প্রকৃতির পথ পরিত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ পথে চলিতে আরম্ভ করে। যক্ষ-পুরীর 'শ্রমিকদল মাটীর তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত।' জল বায়ু, জীব জন্তু, শস্য, ফল, মূল, পুষ্প, পত্র প্রকৃতি মানুষকে কতই দান করিয়াছে ও করিতেছে—মুক্তহস্তে—অজস্র। কিন্তু সে যাহা পৃথিবীর গহন গহ্বরে অন্ধকার গর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছে—মানুষ প্রকৃতির স্নেহের দান ফেলিয়া দিয়া পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সেই গুপ্ত ধন আত্মসাৎ করিতে চায়। জীবন-ধারণের জন্য এবং সুখ-সম্ভোগের জন্যও যাহা যথেষ্ট, তাহা লইয়াই তাহার নিবৃত্তি নাই। সে মত্ত হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া আছে অবিশ্রান্ত সঞ্চয়ের জন্য। এক হাজার টাকা হয় ত তাহার সুখ-সম্ভোগের জন্য যথেষ্ট; কিন্তু সে দশ হাজার—লক্ষ—কোটি এবং তাহারো অধিকের জন্য উন্মত্ত ভাবে প্রয়াস করিতেছে। সংগ্রহেই উৎকট আনন্দ; ভোগেরও সময় নাই। ইহা জগতে সর্ব্বত্র। যক্ষপুরী সেই জগতের একটী আদর্শ

দৃশ্য। এখানকার শ্রমিকদলের মত মানুষ-মাত্রই সুড়ঙ্গ খুঁদিয়া সোনা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। নন্দিনীর বিচারে এই সোনা 'অনেক যুগের মরা ধন।' অধ্যাপক বলিতেছে—'আমরা সেই মরা ধনের শব-সাধনা করি।' ধনের সাধনা মৃত্যুর সাধনা। কারণ ধন মানুষকে অমৃতের পথ হইতে মৃত্যুর পথে ভুলাইয়া লইয়া যায়। অমৃতাৎ মৃত্যুং গময়তি। জড়-সম্পদের চিন্তা করিতে করিতে মানুষের চিত্ত জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। জড়ত্ব মানেই মৃত্যু। তান্ত্রিক শব-সাধনা করিয়া অমৃতময়ী ভগবতীর সাক্ষাৎ লাভ করে অথবা অলৌকিক শক্তি লাভ করে। সংসারী সম্পদ্-শবের সাধনা করিয়া তমোময় অনাত্মত্বরূপে মৃত্যুলাভ ক'র। এই যক্ষপুরীর প্রকৃতি সম্বন্ধে এই নাটকের নানা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহার সমস্তই আমাদের এই বিষয় সংসার-সম্পর্কে কেমন করিয়া খাটিবে তাহাই আগে দেখিয়া লইব। বিষয়তত্ত্বটীই আরো একটু বিশেষভাবে বোঝা থাক্। এক একটা করিয়া কথা ধরিয়া আমরা তাহার প্রয়োগ দেখিব।

১। 'সব জিনিষকে টুক্‌রো করে' আনাই এদের পদ্ধতি।'

সংসারে কোথাও সমগ্রতা নাই—কোথাও অখণ্ডতা নাই। সর্ব্বত্রই ব্যষ্টি, দ্বন্দ্ব, খণ্ড, ভাগ, ভগ্নাংশ। সমষ্টি কোথাও নাই। দার্শনিক বলিবেন—কারণ, অজ্ঞানাত্মক যে মায়া তাহার সমষ্টি হইল ঈশ্বরের উপাধি। আর তাহার ব্যষ্টিভাব-সমূহ হইল জীবের উপাধি। প্রথমেই ত জ্ঞেয় হইতে নিজেকে ভিন্ন করিয়া না লইলে জ্ঞানেরই ক্রিয়া আরম্ভ হয় না। তার পর কোনো পদার্থকে জানা মানেই অন্য পদার্থসমূহ হইতে তাহাকে ভিন্ন করিয়া দেখা তুলনার ভূমি হইতে। এ সব কথা দূরের। সাধারণ-ভাবে মানুষের জীবনের সবই খণ্ডশঃ—ক্রমশঃ। একটী মানুষ যখন আর একটী মানুষকে বুঝিতে চায়, তখন সে তাহার একটী দুটী গুণ বা দোষের হিসাব করিয়াই ক্ষান্ত হয়। সমস্ত মানুষটীকে বুঝিবার তার সময়ও থাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। আবার আমরা মানুষ চিনি না—ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী, গৌর-বর্ণ শ্যাম-বর্ণ, ইত্যাদি চিনি। আমার চাকরটী যখন সুস্থ, তখন তাহাকে চাই। যখন রুগ্ন, তখন তাহাকে চাই না। অন্য দিকে ফুলটী যখন দেখি, তখন গাছটীর কথা ভাবি না। গাছটী যখন দেখি, তখন শিকড়টীর কথা ভুলিয়া যাই। হল্‌দে পাখাটীর সুন্দর রংটী যখন দেখি, তখন তার মধুর স্বরটী শুনি না। আবার স্বরটীতে যখন কান দিই—বর্ণটী তখন দেখি না। মুখখানা যখন দেখি, তখন আর কোনো অঙ্গের কথা মনে আসে না। মনে যখন থাকি তখন প্রাণ চিনি না। প্রাণে যখন থাকি তখন মন চাহি না। ইহাই 'টুক্‌রো করে' আনা। ইহাই খণ্ড করিয়া দেখা।

(২) 'আমরা নিরবকাশ গর্ত্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি।' সংসারে কাজের অন্ত নাই। অবকাশ কোথায়? প্রাণ-ধারণের জন্য আবশ্যক নিদ্রা। শুধু সেইটুকুই অবকাশ। তাও সকলের নাই। জনাকীর্ণ কোনো মহা-নগরীর রাজ-পথে প্রহর দুই তিন দাঁড়াইয়া থাকিলেই বোঝা যায় মানুষের অবকাশ কত। রাত্রি চারিটা হইতে সমস্ত দিন, এবং রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত খাটিতেছে। নিশ্বাস ফেলিবারও সময় নাই। পল্লীগ্রাম হইতে প্রথম যে কলিকাতায় আসে, রাস্তায় দাঁড়াইলে তাহার মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে—মানুষগুলি এমন করিয়া পাগলের মত ছুটিতেছে কেন? কি হইয়াছে? জ্ঞানীর উত্তর—কি হইয়াছে জান না?—ঘরে আগুন লাগিয়াছে! তিনটী শিখা তিন দিক্ থেকে মানুষের নয়-দুয়ারের ঘর পোড়াইতেছে। তাই নিভাইবার জন্য সকলেই অমন করিয়া ছুটিতেছে। যে জলে নিভিবে—সে জল কোথায় পাওয়া যায় তাহা কেহই জানে না। ইহাই আধুনিক জীবন।

Modern life
With its sick hurry, its divided aims,
Its heads overtax'd, its palsied hearts.
এখানে আমরা— Glance, and nod and bustle by
And never once possess our soul,
Before we die. —M. Arnold.

কাজেই আমরা অবকাশের আকাশখানা—এই Soulটী হারাইয়া ফেলি। রাজার নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। নন্দিনী অধ্যাপককে বলিতেছে—'আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন?' সে 'পুঁথির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়েই চলেছে।'

(৩) 'যক্ষপুরী গ্রহণ-লাগা' পুরী।'

সংসারে আনন্দের—হর্ষের—উল্লাসের নির্ম্মল সূর্য্যালোক কোথাও পাওয়া যায় না। অশান্তির ছায়া সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এখানে—

But to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs. (Keats)

(৪) 'সহজ কথাটাই আমার কাছে শক্ত।'

সরলতা ও স্বাভাবিকতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমরা সহস্র প্রকার কৃত্রিমতা সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের হাসি কান্না, চলা, বলা, খাওয়া, পরা—সবই ত প্রচলিত রীতি—রেওয়াজ—ফ্যাসান অনুসারে। কাজেই আমাদের রাজার কাছে সহজটা শক্ত—কারণ বহুকাল হইতে পরিত্যক্ত। আমাদের পদে পদে চিন্তা—'পাছে লোকে কিছু বলে।' ফলে আমরা সরল সহজটীকে ভুলিয়াই গিয়াছি।

(৫) 'অদ্ভুত তোমার শক্তি।' 'প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ছে।'

বিশেষতঃ বিজ্ঞানের সাহায্যে একগুণ শক্তি সহস্রগুণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই যুগেও বাবিলেন, নিনেভে, মেম্ফিসের মত বিশাল-শরীরা নগরী, পিরামিডের মত প্রকাণ্ড অক্ষয় সমাধি-মন্দির প্রভৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল যে শক্তি, এ যুগে নিউ-ইয়র্ক, প্যারী, লণ্ডনের মত শত শত রাক্ষসী নগরী, দুর্গম মরু-প্রান্তর পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়া সহস্র-যোজন ব্যাপী রেল-পথ, অগাধ-সলিলা, ভীষণ-কায়া উচ্ছল-তরঙ্গময়ী স্রোতস্বিনীসমূহের উপর দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুদৃশ্য সেতু নির্ম্মাণ করিতেছে যে শক্তি, সগর্ব্বে অভ্রভেদী গিরি-শৃঙ্গ আরোহণ

করিতেছে, চির-তুষারাচ্ছাদিত মেরু-প্রদেশের সকল রহস্য আবিষ্কার করিতেছে যে শক্তি, জলে স্থলে আকাশে বাতাসে অনায়াসে অবাধে গমনাগমন করিতেছে, আবশ্যক হইলে দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া অরণ্য করিতেছে, আবার অরণ্য-কান্তার দেখিতে দেখিতে মানবের বাস-ভূমিতে পরিণত করিতেছে যে শক্তি, তাহা অদ্ভুত নিশ্চয়ই। হানিবল, আলেক্‌জাণ্ডার, নেপোলিয়ন যে শক্তির সন্তান, সে শক্তি অদ্ভুত নিশ্চয়ই।

(৬) 'কাণা রাক্ষসের অভিসম্পাত। খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।' সংসারে সর্ব্বত্র প্রাণধারণের জন্য প্রাণপণ প্রয়াস চলিতেছে অহর্নিশ। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একজন আর একজনের গলায় ছুরি দিতেছে। একজন আর একজনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। এই যে hard struggle for existence এবং cut-throat competition, এই যে জোরের সহিত জোরের জড়াজড়ি লড়াই, এই যে বুদ্ধির সহিত বুদ্ধির কখনো বা মল্ল-যুদ্ধ কখনো বা লুকোচুরি ছল-প্রবঞ্চনা—ইহাই সংসারের নিয়ম। অন্ধ-ধন-লিপ্সা নামক কাণা রাক্ষসের উপাসনায় এই অভিসম্পাত লাভ হয়। দেবতার আদেশ—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনং।' ইহার বিরুদ্ধাচরণ যেখানে সেইখানেই এ অভিসম্পাত।

(৭) 'আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে' আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে ত পরশমণি হয় না? শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌছিল না।'

মানুষের সম্পদ্ যতই বাড়ে, ততই উহা তাহার চিত্তের উপর পাথরের মত চাপিয়া বসে এবং ধীরে ধীরে তাহাকে নিষ্পেষিত করিতে থাকে। আনন্দ ক্রমশই দুর্লভ হয়। হর্ষ-হাসি অসম্ভব হয়। আনন্দ উল্লাস প্রীতি ইহাই যৌবন। ধন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই যৌবনের ক্ষয় হইতে থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদর্জ্জনের জন্য সমস্ত মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছে তাহার হৃদয় কঠোর হইয়া যায়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সরসতা ও তরুণতা থাকে না। ধনের অর্জ্জনে অশান্তি, রক্ষণে অশান্তি, ব্যয়ে অশান্তি। ধন যেখানে তার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত মনস্তাপ, মনোমালিন্য, অসন্তোষ।

ধনং তাবদসুলভং লব্ধং কৃচ্ছ্রেণ রক্ষ্যতে।
লব্ধ-নাশো যথা মৃত্যু স্তস্মাদেতন্ন চিন্তয়েৎ।

সুতরাং 'সোনা' উথলে আনন্দ-আহ্লাদ প্রীতি প্রেম হর্ষ-হাসি ভরা যৌবনে পৌছিতে পারে না।

(৮) 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি * * * তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়্‌ছে।'

মানুষের সুখ-শান্তি, রূপ-মাধুর্য্য, জ্ঞান-বুদ্ধি সব দগ্ধ হইয়া যায় এই—'কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।' ইহা যে—'মহাশনো মহা-ক্রান্ত।' কাজেই ইহাকে যে আশ্রয় করিয়াছে সে 'তপ্ত' 'রিক্ত' 'ক্লান্ত'। কাজেই—'তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে' নিয়েছে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়ছে।' কারণ—'মূঢ় গ্রাহেনাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ' তাহার জীবন যে মরুভূমি হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা তামসী তপস্যা।

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান বিদ্ধাসুরনিশ্চয়ান্।

রাজা এই অসুর-জ্ঞান-যুক্ত। কাজেই তপ্ত রিক্ত। একটী 'ছোট্ট ঘাসের' আশাও তার নাই। ঠিক এই ভাব হইতেই শেলী সংসারের বর্ণনা করিয়াছেন—

How stern
And desolate a tract is this wide world!
How withered all the buds of natural good!
No shade, no shelter, from the sweeping storms
Of pitiless power.

এবং ইহার— Influence darts
Like subtle poison through the bloodless veins
Of desolate Society.

কার্লাইল্ বলিয়াছেন—'O, the vast, gloomy, solitary
Golgotha and Mill of Death!'

(৯) 'সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটীর নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে' নিজেকে পিষে ফেলে।'

ফরাসী বিদ্রোহের মত ভয়ঙ্কর বিশাল ধ্বংসময় ব্যাপার পৃথিবীতে যত সংঘটিত হইয়াছে, সমস্ত এই শক্তির নিজের ভারে নিজের পিষে যাওয়া। প্রকৃতির প্রতিশোধ। আভিজাত্য-শক্তি মদ-মত্ত হইয়া প্রজা-সাধারণের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া যে হৃদয়হীন অত্যাচার করিল, সেই অত্যাচারই প্রতিক্রিয়া বশে ফিরিয়া আসিয়া সে শক্তিকে চূর্ণ করিল। নেপোলিয়ান রুশের বিরুদ্ধে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে লক্ষ লক্ষ সৈন্য-সহকৃত সমরাভিযান লইয়া যাইয়া প্রায় সমস্ত সৈন্য * অনর্থ ধ্বংস করিয়া লইয়া যে ভাবে ফিরিয়া আসিল—তাহাতেও শক্তির নিজের ভারে নিজে পিষিয়া যাওয়া। বরদিনোর যুদ্ধে বিজয় লাভও পরাজয়ের চেয়েও সাংঘাতিক ভাবে তাহার পতনের পথ পরিষ্কার করিল। ম্যাক্‌বেথ্-নাটকেও ম্যাক্‌বেথ যে শোণিত-সাগরে সাঁতার দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং যে ভাবে অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, তাহাতেও এই তত্ত্বই দেখানো হইয়াছে। কার্লাইল বলিয়াছেন—

Mountains of encumbrance had been heaped over the spirit * * * it struggled and wrestled to be free * * * its prison mountains heaved and swayed

* চার লক্ষ সৈন্যের মধ্যে বিশ হাজার ফিরিয়াছিল। কতক মরিয়াছিল অনাহারে, কতক নিদারুণ শীতে বাতে তুষারে। কতক পথে স্থানে স্থানে রুষ-সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণে

tumultuously as the giant-spirit shook them to this hand and that and emerged into the light of heaven!

(Sartor Resartus)

ইহা এই একই সত্যের উপরকার দিক্—মুক্তি-পরিণামের দিক্। রাজা শুধু নিষ্পেষণেই ভুগিতেছে—emergence into the light of heaven এর 'সুসমাচার' এখনো তাহার কাছে আসে নাই।

(১০) 'তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে' রেখে বঞ্চিত করেছ।' প্রাণ যখন নিজেকে বিলাইয়া দেয় তখনি তার চরিতার্থতা লাভ হয়। এই বিলানোতেই তার তৃপ্তি ইহাতেই তার আনন্দ। সংসারের স্বার্থলিপ্ততাই তাহার সকল দুঃখের কারণ। সে দিতে চায় না, কেবলি পাইতে চায়—কাড়িতে চায়। স্বার্থের অন্বেষণে সে নিজের সুখ নিজে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া দুঃখ বরণ করিয়া লইতেছে। তন্নষ্ট যন্ন দীয়তে। ফুলের যাহা যায় তাহাই গন্ধ। যাহা সে দেয় না তাহা গন্ধ নয়—তাহা ব্যর্থ। মানুষ যাহা দেয় তাহাতেই তাহার সুখ; যাহা ধরে তাহাতেই তাহার দুঃখ।

(১১) 'দরকার বলে' পদার্থের শেষ আছে। * * * নেশার দরকার নাই। তার শেষও নাই।'

জীবনে যাহা দরকার—ভোগ-বিলাসটা ধরিয়া লইয়াও যাহা দরকার, তাহাই লাভ করিয়াই যদি মানুষ ক্ষান্ত থাকিত, তবে সংসারের এক হাজারের ৯৯৯ ভাগ অশান্তি কমিয়া যাইত। দরকারটা সংসারের একটা মিথ্যা অজুহাত। মূলে সংসার চলিতেছে নেশায়—অর্থাৎ নিরুদ্দেশ্য তৃষ্ণায়, কিছুতেই যাহার তৃপ্তি নাই।

'We pine for what is not.'

(১২) 'সেই নীল চাঁদোয়ার নীচে খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই ত এই কয়েদখানার চোরাই মদের উপর এমন ভয়ঙ্কর টান।'

মানুষের জন্য অফুরন্ত আনন্দ সাজানো রহিয়াছে প্রকৃতিময়—সর্ব্বত্র—দক্ষিণে বামে—ঊর্দ্ধে অধে। Joys in the widest commonalty spread। এই আনন্দ সুরা—ইহা সুধা। ইহাতে প্রাণের পুষ্টি হয়—হৃদয় সঞ্জীবিত হয়।

The rainbow comes and goes
And lovely is the rose.
The moon doth with delight
Look around her when the heavens are bare;
Waters on a starry night
Are beautiful and fair,
The sunshine is a glorious birth (Wordsworth)

এই যে পবিত্র প্রাণপ্রদ মদ ইহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—অন্ততঃ ভুলিয়া থাকি। কিন্তু জীবনে মদের অর্থাৎ আনন্দের একান্ত আবশ্যক। কাজেই আমরা সর্ব্বনেশে মদের আশার নেশাতেই মাতামাতি করি। ধন-লোভ এই মদ। ইহা অনন্ত অশান্তির প্রস্রবণ। কিন্তু প্রকৃতির আদরের দান যে মদ তাহা খাইলে চিত্ত-ভাবটী হয়—

No wish profaned my overwhelmed heart
Blest hour! It was a luxury to be! (Coleridge)

হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাইনা—কিছুর স্বর্গ শেষে
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা। (রবীন্দ্রনাথ)

প্রকৃতির ভাণ্ডারের মদ খাইলে এই প্রকার হয়। কিন্তু সংসারী এই সহজ-সুলভ অসীম আনন্দ-মদিরা ভুলিয়া থাকে। সহস্র প্রকারে আনন্দের কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য দিবা রাত্রি ব্যর্থ চেষ্টা করে।

(১৩) 'একটা মরা ব্যাঙ্। এই ব্যাঙ্ এক দিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে।' মানুষের অন্তরাত্মা যতদিন না জাগিয়া উঠিয়া আকাশের আলোকের জন্য আকুল হইয়া উঠে, ততদিন মানুষ মাত্রই সাংসারিক অবস্থা নামক এই যে 'পাথরের কোটর' ইহার মধ্যে প্রাণহীন প্রাণী যে শীতের ভেক—ঠিক তাহারি মত। ইহা টিঁকে থাকা—বেঁচে থাকা নয়।

(১৪) 'আমি যে কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর।'

বিষয়-মদ-মত্ত যারা তাহাদের নিষ্ঠুরতার ত অন্ত নাই। সংসারী হৃদয় জিনিষটাকে ঘৃণা করে। হৃদয় যেখানে অবজ্ঞাত পদ-দলিত, সেখানে নৃশংসতা অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থসিদ্ধির রথ, সম্মুখে যাহা পড়ে, সমস্ত চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অন্ধ স্বার্থ অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে মানুষের বুকে শেল বিদ্ধ করিয়া দেয়। শত শত ছিন্ন মুণ্ডের আস্তরণের উপর লোকে সিংহাসন স্থাপন করে। যক্ষপুরীর রাজা ত নিষ্ঠুর হইবেই।

(১৫) 'জগতে যা কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করিতে চায়।'

মানুষের জানিবার যাহা শক্তি, জগতে যাহা জানিবার আছে, তাহার তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ, নগণ্য। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া জানিলেও জানা শেষ হইবে না। একটা ঘাসের পাতার মধ্যে যাহা জানিবার আছে, তাহাই জানিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আর জানা দ্বারা পাওয়া যায় না। পাওয়ার একমাত্র উপায় ভালবাসা। প্রাণে পাওয়া যায়—সত্যকার পাওয়া। জ্ঞানে পৃথক করে—দূরে রাখে। স্বার্থ যেখানে প্রবল—সেখানে প্রাণের গতি বন্ধ। কাজেই রাজা জানে না—'প্রাণ-পুরুষের অন্দরমহল কোথায়।'

(১৬) 'ধ্বজা-পূজা।'

বিষয়ী মানুষের যা ধর্ম্ম-কর্ম্ম তা শুধুই ধ্বজা-পূজা। বহি-র্নিদর্শনের,—বাহ্য প্রতীকের মিথ্যা অর্চ্চনা মাত্র হয়। যাঁহার নিদর্শন তাঁহার কোনো খোঁজখবর থাকে না। হাতে যখন ষোড়শোপচার অর্পণ করে, প্রাণ তখন ধনের ধ্যানে মগ্ন থাকে। ক্রুশের ধ্বজা তুলিয়া যীশু-

ব্যথা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION

ভক্ত নির্দ্দোষীর গলা কাটিতে যায়। হরিনামের মালা লইয়া হরি-ভক্ত পর-ধন হরণ করে।

এইখানে বিষয় মাহাত্ম্য শেষ করা যাক্। ষোলো কলা পূর্ণ হইল। এইবার ভাবের সন্ধান করিব। রাজার চরিত্রের কিছু কিছু বোঝা গেল। এইবার বিষয়ের বিচার ছাড়িয়া ভাবের অনুভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। একবার নন্দিনীর মুখের পানে তাকানো যাক্। আর নন্দিনীর সম্পর্কে রাজার আরো কোনো তত্ত্ব পাওয়া যায় কিনা তাহাও দেখা যাক্। বারান্তরে তাহাই করিবার বাসনা রহিল।

জিনগণ্ড

শ্রীশশধর রায় এম-এ, বি-এল্

গত চৈত্রে কণ্ঠগণ্ডের বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য আর একটী গণ্ডের কথা ঐরূপেই আলোচনা করিব। এই গণ্ড নাসিকা মূলের কিছু পশ্চাতে এবং মস্তিষ্ক পদার্থের নিম্নে অবস্থিত। ইহা একটী মটর পিমৃড়ির ন্যায়; ইহার বর্ণ শাদা ও পীত মিশ্রিত। ইহা প্রকৃত পক্ষে সংযুক্ত গণ্ড, অর্থাৎ দুইটি গণ্ড পরস্পর সংযুক্ত; একটি সম্মুখে ও অপরটি পশ্চাতে,—অশ্ব পৃষ্ঠের জীনের (Saddle) ন্যায় ইহার আকৃতি। এই নিমিত্ত ইহাকে জিনগণ্ড বলিব। ইংরাজিতে ইহাকে Pituitary gland বলে।

মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট সকল প্রাণীরই জিনগণ্ড আছে। এই গণ্ডের পূর্ব্বাভাস কীট প্রভৃতি নিম্নতম প্রাণিগণেরও দেখা যায়। সুতরাং ইহা সকল প্রাণীরই আছে। এই হেতু বশতঃ ইহাকে প্রাণিগণের চিরসঙ্গী বলা যাইতে পারে।

যে সকল কোষ দ্বারা এই গণ্ড গঠিত হইয়াছে, তাহারা নিরেট (solid)। এই সকল কোষ পাশাপাশি সজ্জিত। ইহাদিগের চারিদিকে রক্তবাহী কোষ সকল রহিয়াছে। এই কোষ সকলের রস ঐ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র যাতায়াত করে। ইহাদিগের রস তরল কিন্তু আঠার ন্যায় অথচ স্বচ্ছ। মস্তিষ্কের নিম্নভাগে কোরয়েড্ গণ্ড নামক আর একটি গণ্ড আছে। এই কোরয়েড্ গণ্ডের রস দ্বারা স্নায়ু মণ্ডল আর্দ্র থাকে। জিনগণ্ডের রসও ঐ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলকে বিশেষ ভাবে সিক্ত করে।

জিনগণ্ডের রস অস্থিসকলকে বর্দ্ধিত করে; এবং দেহের সংযোগ স্থানগুলির দোষ সকলকেও উত্তেজিত করে। এই রস হইতে রাসায়নিকগণ পিটুট্রিন্ (Pituitrin) নামক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পদার্থ পেশী সকলের ক্রিয়া নিয়মিত করে, এবং মলনালীর, মূত্র-কোষের ও গর্ভাশয়ের পেশী (Fibres) তন্তুগুলির উপরেও ক্রিয়া করে। জিনগণ্ডের রস দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, প্রস্রাব অধিক হয় এবং দুগ্ধক্ষরণও বৃদ্ধি পায়। সমুদ্র জলে যে মাত্রায় লবণ আছে. জন্তু দেহের রক্তমধ্যে সেই মাত্রায় লবণ স্থির রাখিবার প্রধান সহায়ক জিনগণ্ডের রস। কণ্ঠগণ্ডের রস যেমন রক্ত মধ্যে আইওডিনের মাত্রা সমুদ্র জলের ন্যায় ঠিক রাখে, জিনগণ্ডের রসও তদ্রূপ লবণের মাত্রা ঠিক রাখে। বহুকোষ জন্তুগণের আদি বাসস্থান সমুদ্র; এ কথা রক্তের লবণাংশ ও এবং আইওডিনাংশ বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে।

জিনগণ্ড দেহ হইতে বাহির করিয়া লইলে জন্তুগণ অলস হয়; তাহাদিগের ক্ষুধা থাকে না; তাহারা শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাদিগের দেহ শীতল হইয়া থাকে। এইরূপে দুই তিন দিন মধ্যেই তাহারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

জিনগণ্ডের সম্মুখের অংশ হইতে কিয়দংশ কাটিয়া লইলে জন্তুগণ এত মোটা হয় যে, তাহাতে দেহ নষ্ট হইবার মত হইয়া থাকে। যদি দেহ নষ্ট না হয় কিন্তু কেবল অধিক মাত্রায় স্থূল হয়, তবে অনেক সময় জন্তুগণের লিঙ্গ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়; অর্থাৎ স্ত্রী জাতীয় জন্তু পুং জাতীয় হয়, পুং জাতীয় জন্তু স্ত্রী জাতিতে পরিণত হয়। ইহা ব্যতীত জিনগণ্ডের ঐ অংশ কাটিয়া লইবার ফলে জন্তুগণের দেহের চর্ম্ম শুষ্ক হয়. নিদ্রা থাকে না, কেশ উঠিয়া যায়; তাহাদিগের বুদ্ধি জড়বৎ হয় এবং অনেক সময় তাহারা মৃগী রোগাক্রান্ত হয়। যদি জন্তুগণের শিশুকালে এই গণ্ডের সম্মুখ ভাগ কাটিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে উহাদিগের অস্থি বাড়ে না; সেই হেতু উহারা খর্ব্বাকৃতি হয়। জিনগণ্ডের সম্মুখ ভাগের অপূর্ণতা বশতঃ বামন আকার উৎপন্ন হইতে পারে। এই গণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিতরূপে একবার হ্রাস, একবার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এই হ্রাস-বৃদ্ধি কোন কোন জীবদেহে ঋতু-ভেদে হইয়া থাকে; স্তন্যপায়ী জীব-দেহে মাসিক হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখা যায়। এই নিমিত্ত এই শ্রেণীর জীবের স্ত্রীগণের মাসিক রজঃস্রাব হইয়া থাকে। যে সকল জীব শীত ঋতুতে ঘুমাইয়া পড়ে এবং নিদ্রিত অবস্থাতেই সমস্ত শীত ঋতু কাটাইয়া দিয়া বসন্তে জাগরিত হয়, তাহাদিগের জিনগণ্ডের রস-ক্ষরণ শীতকালে হ্রাস হইয়া যায়; তাহাতেই ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে ভেক সর্প প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বহু প্রাণী শীতকালে নিদ্রিত হয়। এই দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রাকে হিম-নিদ্রা বলে। ফলতঃ জিনগণ্ডের রসক্ষরণ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মত এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে কমি বেশি হওয়াতে প্রাণিদেহের অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দৈনিক নিদ্রা, হিম নিদ্রা এবং যোগ নিদ্রা যে প্রকৃত পক্ষে একই অবস্থার ক্রম-বিকাশ তাহা আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি।* সুতরাং দৈনিক নিদ্রাও সম্ভবতঃ জিনগণ্ডের রসক্ষরণের অল্পতা হেতুই হইয়া থাকে এরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। এই হেতু জন্তুগণের কখন কখন ধ্বজভঙ্গ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে পুরুষদিগের শুক্রে কীট থাকে না এবং স্ত্রীগণের ডিম্বাধারে ডিম্ব থাকে না। কাহারও বা স্বভাবতঃই এই গণ্ড কিছু কম মাত্রায় রস ক্ষরণ করে। যাহাদিগের এইরূপ হয়, তাহারা সর্ব্বদাই অলস এবং নিদ্রালু হইয়া থাকে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে এই গণ্ডের রস ক্ষরণের আধিক্য হইলে জন্তুগণ শীর্ণ-

---

* নব্য ভারত ১৩২৪ ভাদ্র। মানসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ।

দেহ হয়, তাহাদিগের অস্থি দীর্ঘ হয় এবং কখন কখন মস্তিষ্কের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে এই গণ্ড অধিক মাত্রায় রস ক্ষরণ করিলে অস্থি দীর্ঘ হয় না, কেবল হস্ত ও পদ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইয়া উঠে; নাসিকা, কর্ণ, ওষ্ঠাধর এবং চক্ষু বড় হয়, ভ্রূযুগল লোমশ হয়, এবং ব্যবহার উদ্ধত ও কলহপ্রিয় হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের এইরূপের আধিক্য হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে তাহাদিগের কষ্টদায়ক শিরঃপীড়া হয়, সকল কার্য্যেই নিরুদ্যম ও নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হয়, ধর্ম্ম-বিশ্বাস শিথিল হয়; এমন কি এই কারণে স্ত্রীগণ অনেক সময় আত্মহত্যাও করিয়া থাকে।

বলিয়াছি, জিনগণ্ডের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ দুইটি গণ্ডের মত কার্য্য করে। তাহা হইলেও উহাদিগের সংযুক্তাবস্থা একটী গোটা গণ্ডের ন্যায় ব্যবহার করে। এই গণ্ডের দুই অংশ পরস্পরের ক্রিয়া নিয়মিত করিয়া থাকে।

এই গণ্ডের উভয় অংশ পূর্ণাবয়ব থাকিলে এবং উহার রসক্ষরণ অধিকও-না অল্পও-না অর্থাৎ ঠিক পরিমাণ মত থাকিলে, জন্তুগণ শীর্ণদেহ ও দীর্ঘায়তন হইয়া থাকে, উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি অধিক হয়, বুদ্ধি, উদ্যম ও সহিষ্ণুতা উত্তম দেখা যায়। কিন্তু রস ক্ষরণ অল্প মাত্রায় হইলে জন্তুগণ মোটা, খর্ব্বাকার, বিশ্রী হইয়া থাকে। উহাদিগের বুদ্ধি অনেক কম, নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান নিকৃষ্ট হয়। ইহারা মিথ্যাবাদী ও অসংযমী হয় এবং ইহাদিগের বিবেক অপরিস্ফুট থাকিয়া যায়।

কণ্ঠগণ্ডের (Thyroid gland) রস যেমন দেহের বহির্ভাগের ও ভিতরের আবরণগুলির উপরেই মুখ্য ভাবে কর্ম্ম করে, জিনগণ্ডের রস সেইরূপ প্রধানতঃ অস্থি ও স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। কণ্ঠগণ্ডের রসও গৌণ ভাবে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুর উপর কর্ম্ম করে; কিন্তু জিনগণ্ডের রস সাক্ষাৎ স্বরূপেই এই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। কণ্ঠগণ্ডের রস শক্তি উৎপন্ন করিবার সহায়তা করে; কিন্তু জিনগণ্ডের রস ঐ শক্তিকে প্রয়োগ স্থান ভেদে যথাযোগ্য ভাবে কর্ম্মে পরিণত করে। শক্তিকে দীর্ঘকাল অবিচলিত ভাবে কর্ম্মে ব্যক্ত করা জিনগণ্ডের রসের ক্রিয়া। শক্তি উৎপন্ন করা কণ্ঠগণ্ডের কর্ম্ম হইলেও জিনগণ্ড রসের সহায়তা না পাইলে ঐ শক্তি অল্প কাল মধ্যে ক্ষয় হইয়া যায়; উহা হইতে কালব্যাপী চেষ্টা ও কর্ম্ম হইতে পারে না। আমরা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বিবিধ ভাবে উত্তেজিত হইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত নানাপ্রকারে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দীর্ঘকাল কর্ম্মে পরিণত করিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমাদিগের ভাবে শক্তি আছে; কিন্তু আমরা শক্তিকে স্থির রাখিয়া দীর্ঘকাল কার্য্যে পরিণত করতঃ সফলতা লাভ করিতে পারি না। অল্প সময় মধ্যে আমাদিগের শক্তি নিরস্ত হয়, উদ্যম ও চেষ্টা থামিয়া যায়। সুতরাং আমরা কিছুতেই সফলতা লাভ করিতে পারিতেছি না। এ দুর্দ্দশার বহু কারণ আছে সত্য; কিন্তু জিনগণ্ডের রস ক্ষরণের অল্পতাও এই অবস্থার একটি প্রধান হেতু মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। আমাদিগের ধাতুতে পিটুট্রিন্ বোধ হয় অপেক্ষাকৃত কম। এই অবস্থার উন্নতি করা অতীব আবশ্যক। শারীরতত্ত্ববিদ্গণ এবং জৈব রসায়নবিদ্গণ এই বিষয়ে যত শীঘ্র মনোযোগ দেন ততই মঙ্গল। কিন্তু আমরা বঙ্গীয়গণ এসকল কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার সময় পাইব কি?

সীতারামের শিলালিপি

শ্রীবিজয়নাথ সরকার বি-এ, সি-ই

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতবর্ষে' সীতারাম-প্রশস্তি নাম দিয়া রাজশাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গৃহে রক্ষিত রাজা সীতারাম রায়ের একখানি শিলালিপির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ছয় মাস পূর্ব্বে এই লিপিখানি সমিতির হস্তগত হয়, এবং তখনই ইহার পাঠ সমিতির ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় করিয়া দেন। আবার গত বৈশাখ মাসের প্রথমেই (১৩ই এপ্রিল তারিখে), প্রকাশিত সমিতির রিপোর্টে মজুমদার মহাশয়ের লিখিত এই লিপির পাঠ ও বিবরণ নিম্নলিখিত রূপ দেওয়া আছে—

V. The following was presented by Babu Sarat Kumar Sarkar and his brothers (Rajshahi):

(29) A stone inscription of the reign of Sitarama Raya (No. 679; diameter 10″; Muhammadpur, Dist. Jessore).

The inscription was published by James Westland in 1871 in his *Report on the District of Jessore*, pp. 45-46. It appears to have originally belonged to the temple of Krishna at Muhammadpur, where it was put up 'on the top of the lowest arch of the tower,' and 'let into the face of the brickwork' (p. 45).

The text of the inscription, which is in Bengali characters, reads as follows :—

Line 1. বাণদ্বন্দা (ন্দ্বা) ঙ্গচন্দ্রৈঃ
Line 2. পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষা-
Line 3. ভিলাসঃ (ষঃ) শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসো-
Line 4. দ্ভবকুলকমলোদ্ভাসকো ভানু-
Line. 5. তুল্যঃ। ভ্রাজছি (চ্ছি) ল্পৌঘযুক্তং রুচিররু-
Line 6. চিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং শ্রীসীতা-
Line 7. রামরায়ো যদুপতিনগরে
Line 8. ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ (॥)

It records the erection of a temple of Krishna by Sitarama Ray who belonged to 'the illustrious family of Visvasakhasa', at Yadupatinagara, in the Saka year 1625, i. e., 1703 A. D. It will be seen that

Westland was successful in reading and interpreting the whole of the record correctly excepting that in line I. he read চন্দ্রে for চন্দ্রৈঃ, in II. 2-3, তোষাভিলাষী for তোষাভিলাসঃ, in II. 3-4, ভাসোদ্ভব for খাসোদ্ভব and in l. 5 অজস্রং সৌদযুক্তে for ভ্রাজচ্ছিল্পৌঘযুক্তং.

N. G. MAJUMDAR.

Curator, Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi."

৬ই বৈশাখ তারিখের 'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রে সমিতির 'জনৈক সভ্য' কর্তৃক এই পাঠ আলোচিতও হইয়াছে। এই সকল তথ্য প্রবন্ধ-লেখক ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় বিদিত আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি স্বীয় প্রবন্ধে তাহার উল্লেখমাত্র করেন নাই।

"পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-কাহিনী" হইতে বোধ হয় যে প্রবন্ধে প্রকাশিত পাঠ অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত অক্ষয়বাবুর এই লিপির পাঠে অশুদ্ধতার কৈফিয়ৎ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে: "অক্ষয়কুমার মৈত্র সি-আই-ই মহাশয়ও এই ফলকখানি এতদিন স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হওয়ায়, সম্ভবতঃ লোকপরম্পরায় শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া ও ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া তদীয় 'সীতারাম' নামক সাহিত্যে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে কয়েক স্থানে অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।"

'সাহিত্য,' ১৩০২ সাল, ৮১৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অক্ষয়বাবুর নিজের উক্তি কিন্তু অন্যরূপ। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"এই মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত কবিতার যে ফলকলিপি নিহিত আছে, তাহা সহজে পাঠ করা যায় না। তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। * * * মন্দির ফলকে অবিকল এইরূপ লিখিত আছে:—"। ওয়েষ্টল্যাণ্ডের বই ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়, সুতরাং অক্ষয়বাবুর উক্ত লেখা তাহার প্রায় ২৫ বৎসর পরে।

সে যাহা হউক, প্রবন্ধে যে পাঠ দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও একটী গুরুতর অশুদ্ধি আছে। 'রুচিররুচি হরেকৃষ্ণগেহং' এর স্থলে "রুচিররুচি-হরে বৃষ্ণগেহং" হইবে। "রুচিররুচিহরে" পদটি 'যশোহর' পদের মত নিষ্পন্ন এবং 'যদুপতি নগরের' বিশেষণ। 'কৃষ্ণগেহং' সম্বন্ধে ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাঁহার বইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

"Apparently a Curious error has arisen among some of the dwellers in the place, for they talk of the temple of Krishna as the temple of Harkrishna. By that name I heard it almost always called, but the inscription plainly shews it is a temple of Krishna. I think it possible the mistake may be derived from an ignorant reading of one part of the inscription 'রুচির রুচিহরে কৃষ্ণ'. Some have read 'রুচির রুচি' as a sort of reduplication of the same word and left the 'হরে' to be tacked on to 'কৃষ্ণ', certainly the man who read it to me made that mistake. An adjacent village is called Harkrishnapur: no doubt from this mistake."

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় ওয়েষ্টল্যাণ্ডের বইয়ের উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি কি তাহাতে এই কথা দেখেন নাই, না, যে ব্যাকরণ অনুসারে একাধিকবার 'অঙ্কেষু বামাগতি' গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যাকরণ অনুসারেই বাঙ্গলা 'হরেকৃষ্ণ' সংস্কৃত-শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন?

আর এক দিক দিয়াও 'হরেকৃষ্ণ গেহং' পাঠের অসঙ্গতি দেখা যায়। এই মন্দিরে যে বিগ্রহ ছিল, এখন তাহা দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীতে 'কৃষ্ণজী' নামে বিরাজ করিতেছে। অক্ষয়বাবু নিজেই এ কথা লিখিয়াছেন:—

"সীতারাম নাই, কিন্তু কানাই নগরে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীতে কৃষ্ণজী বিগ্রহ এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে" (সাহিত্য ১৩০২ সাল ৮১৫ পৃষ্ঠা)

"Dayaram retained only the image of God Krishaji (Sitaram's family idol) for himself."

(Dighapatiya Raj Family p. 1)

অতএব, বিগ্রহের নাম 'কৃষ্ণই' ছিল 'হরেকৃষ্ণ' নহে। 'ঐতিহাসিক তথ্য' আলোচনা করিতে গিয়া প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন— "বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বদন্তী ও কল্পনার সাহায্যে সীতারামের উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার স্বাধীন ভাবে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য স্বদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের যশ কাহারও 'প্রশস্তি'র অপেক্ষা করে না। বলিতে কি, তাঁহার লিখিত উপন্যাস প্রকাশিত না হইলে বোধ হয় কেহই সীতারামের ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেন না। তাই সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ইতিহাসের সমালোচনায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"Next in importance to Pratap but at a great distance from him is another heroic son of Jessore... Raja Sitaram Rai (Circa 1660-1714) who played a humbler part in history but whom the genius of Bankim Chandra has invested with a halo of idealism and romance." (Modern Review, March. 1923. p. 317)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে 'সীতারাম' উপন্যাসের মূল সত্য এই:—

ধ্যায়তো বিষয়ান্‌পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গীতা, ২।৬২ ও ৬৩

আমাদের মনে হয়, এইরূপ উপদেশের প্রচার, অথবা বৈতরণী নদীতটে স্থিত সপ্তমাতৃকার মণ্ডপ, বিরূপা নদী তটে স্থিত উদয়গিরি ও ললিতগিরির উপরের ভারতীয় কীর্ত্তির ধ্বংসাবিশেষ বর্ণনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল উন্নত ভাব তাঁহার সীতারামে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে তাহার মূল্য কোনও ঐতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা কম নহে।

অক্ষয়ানন্দের পারাভস্ম

শ্রীআদীশ্বর ঘটক

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, কালীঘাট অঞ্চলে অক্ষয়ানন্দ নামক এক অবধূত সন্ন্যাসী আসেন। সন্ন্যাসী বড় রূপবান ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জটা, গৌর বর্ণ, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে বাঘছাল, এবং সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম গুণ্ঠিত। চেহারা দেখিলে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর বোধ হইত। তাঁহার চিমটা এবং অবধূতের ঝুলি ছিল। এই সন্ন্যাসী বাঙ্গালী। শুনিয়াছি, ইঁহার জন্মস্থান গোবরডাঙ্গা।

অক্ষয়ানন্দ অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহীশূর অঞ্চলে সমুদ্র-তীর হইতে তিনি একটী ছোট দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পাইয়াছিলেন। সেই শঙ্খ দেখাইয়া সকলকে বলিতেন, "এই আমার লক্ষ্মী"। এই শঙ্খ পাওয়া অবধি তাঁহার কোনও অভাব ছিল না। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দেখিয়া বৈষ্ণবগণ প্রণাম করেন, এবং সামর্থ্য থাকিলে, কিছু প্রণামীও দিতে হয়। সন্ন্যাসী এই শঙ্খ দেখাইয়া পূজার জন্য ভক্তদের নিকট যাহা চাহিতেন, তাহা পাইতেন। অক্ষয়ানন্দ তন্ত্র মতে চলিতেন ; সুতরাং "ম" পঞ্চক তাঁহার প্রয়োজন হইত। এমন কি, দিনের বেলায়ও সুরার বোতল ও পানপাত্র লইয়া প্রকাশ্য পথে টলিতে টলিতে যাইতেন।

এই সময়ে কালীঘাটে "পূর্ণবাবু" নামক এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মাথায় কেশাদি ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারীর মত আচরণ করিতেন। তাঁহার একটি পুস্তকের দোকান ছিল। সেই দোকানের পশ্চিমভাগে তিনি আসন করিয়াছিলেন। এই আসনে কুড়ি পঁচিশ জনের বসিবার স্থান হইত ; এবং প্রাতঃকালাবধি প্রায় শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত গঞ্জিকার ধূম উড়িত। নানাপ্রকার সাধু, অবধূত, যোগী, এবং ভৈরবীগণের এই স্থানে আগমন হইত, এবং পূর্ণবাবু সকলকেই যত্নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিতেন। অক্ষয়ানন্দ কালীঘাট ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এই পূর্ণবাবুর আসন (অর্থাৎ আড্ডা) আশ্রয় করিলেন।

অক্ষয়ানন্দ এই স্থানে নিজের ধর্ম্মমতে সাধনা করিতে থাকিলেন। কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, অপর একটী লোক এই আসনে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহস্থ, এবং ইংরাজি এবং সংস্কৃত জানিতেন। এই লোকটী পূর্ণ বাবুর পরিচিত, এবং কালীভক্ত বলিয়া সকলে ইঁহাকে আদর করিত। ইনি প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে কালীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দেবী দর্শন করিতেন। ঝড় হউক, জল হউক, এই ভদ্রলোক প্রতি দিন কালীঘাটে আসিতেন। বাটী ফিরিবার সময় পূর্ণবাবু ইঁহাকে ডাকিয়া আসনে বসাইতেন।

যে সময়ে অক্ষয়ানন্দ ঐ স্থানে ছিলেন, একদিন বড় ঝড়-বৃষ্টি হইতে-ছিল। কথিত ভদ্রলোকটি পূর্ণবাবু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঐ আসনে গিয়া দেখিলেন, আসনের উত্তর দিকে অক্ষয়ানন্দ বাঘছাল ইত্যাদিতে শোভিত হইয়া তন্ত্র এবং তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। অনেকগুলি শ্রোতা উপস্থিত ছিল, গঞ্জিকা এবং পান পাত্র পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। ভদ্রলোকটি এই সকল দেখিয়া প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে-ছিলেন ; কারণ, তিনি কালীভক্ত হইয়াও বামাচারী ছিলেন না, গঞ্জিকার ধূম, অথবা সুরা পান করিতেন না। কিন্তু পূর্ণবাবুর অনুরোধে বৃষ্টির অবসান পর্য্যন্ত বসিতে স্বীকার করিলেন। এই সময়ে অক্ষয়ানন্দ উৎফুল্ল নেত্রে বলিয়া উঠিলেন,

"——আগ্‌মে পারা,
যো রাখে সো গুরু হামারা।"

সাধারণ পাঠক-পাঠিকাগণের এ কথা বুঝিবার অসুবিধা হইবে ; এজন্য ইহা বিশদ ভাবে লিখিলাম। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, পারা ভস্ম করিতে পারিলে, তাহা দ্বারা তাম্র ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া সুবর্ণ হয়। এই জন্য সন্ন্যাসীরা পারা ভস্ম করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারদ ধাতু বহ্নি সহযোগে ভস্ম না হইয়া জলের মত উবিয়া যায়। যিনি এই বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই ইহা জ্ঞাত আছেন।

পারদ ধাতু অগ্নিতে থাকিবে, আর উহার ওজন কম হইবে না, এই প্রকার করিতে পারিলে উহা ভস্ম হইবে ; সেই ভস্মই স্পর্শমণির (পরশ পাথর) গুণ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এই কর্ম্ম বড় কঠিন। ইহা যিনি করিতে পারেন, তিনি গুরু নামের উপযুক্ত ব্যক্তি।

পূর্ণবাবু অক্ষয়ানন্দকে বলিলেন, "এই ভদ্রলোক পারা আগুনে রাখিতে পারেন।" অক্ষয়ানন্দ লোকটির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি ঠাকুর, তুমি না কি পারা ভস্ম করেছ?"

ভদ্রলোক। "আমি ঠাকুর নই। রাজপুতদিগকেই ঠাকুর বলে। আমি ব্রাহ্মণ।"

অক্ষয়ানন্দ। "ভাল, ঠাকুর নাই বলিলাম,—তুমি বল দেখি, কি প্রকারে অগ্নিতে পারা রাখিতে পারা যায়?"

ভদ্রলোক। "পারদ ধাতুর অষ্ট কঞ্চুক আছে। শাস্ত্রে বলে,—

নাগবঙ্গোমলোবহ্নিঃ চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরি।
অসহ্যাগ্নির্মহাদোষাঃ নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ ॥

নাগ অর্থে সীস ধাতু, বঙ্গ রাঙ্গ, মল, বহ্নি (latent heat) চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি, এবং অসহ্যাগ্নি, এই আট দোষ পারদে থাকে। এক একটি করিয়া ঐ দোষ নষ্ট করিতে হয়। ঐ অষ্ট দোষ নষ্ট হইলে পারদ মূর্চ্ছিত (অর্থাৎ গুঁড়া) হইয়া যায়। তার পরে উহা অগ্নিতে রাখিলে, আর উবিয়া যায় না, ভস্ম হয়।"

অক্ষয়ানন্দ। "কত দিনে তোমার এই অষ্ট দোষ নষ্ট হয়?"

ভদ্রলোক। "এক একটি দোষ নষ্ট করিতে সাত দিন, মোট ছাপ্পান্ন দিনে পারদ দোষমুক্ত হয়।"

অক্ষয়ানন্দ। "সে তো বড় বিষম কথা। আচ্ছা আর কোনও উপায় তোমার জানা আছে?"

ভদ্রলোক। "আপনি কি চাহেন? পারাভস্ম?—না কেবল পারা অগ্নিতে রাখিতে চাহেন?"

অক্ষয়ানন্দ। "মারে ডাণ্ডা, ছাড়ে ভূত, তার নাম অবধূত! আমি অবধূত, আমি অত খাটা খাটুনির ধার ধারি না। আমি চাই, জোর করিয়া আগুনে পারা রাখিব। তুমি এমন কোনও উপায় জান কি না?"

ভদ্রলোক। "তাহাও হইতে পারে। একটা লৌহের গোলা ঢালাই করিয়া তাহার মধ্যে অল্প পারা রাখিয়া, লৌহময় ইস্ক্রু দ্বারা আঁটিয়া, সেই গোলার মধ্যগত করিয়া পারদে অগ্নি দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে কিন্তু পারা ভস্ম হয় না, যেমন পারা তেমনি থাকিবে। এই ক্রিয়া বিপজ্জনক।"

অক্ষয়ানন্দ। "কি বিপদ?"

ভদ্রলোক। "লৌহ গোলার যেটুকু সামর্থ্য, সেই পরিমাণ পারদ উহাতে থাকিতে পারে। অধিক পারদ হইলে, ঐ গোলা ফাটিয়া পারদ নির্গত হইবে। এই কার্য্য খুব নির্জ্জন স্থানে করিতে হয়।"

অক্ষয়ানন্দ চুপ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে বৃষ্টি থামিয়াছিল, সুতরাং ভদ্রলোকটি বিদায় হইলেন।

হায়! এই পারাভস্মের জন্য কত লোক কত প্রকার চেষ্টাই না করিয়াছেন! কত লোক পারা ভস্ম করিতে গিয়া, নিশ্বাস-পথে পারদের বাষ্প টানিয়া জন্মের মত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন! অক্ষয়ানন্দের মত স্বল্পবুদ্ধি মদ্যপের দ্বারা কি এই কার্য্য সম্ভব? কখনই না। কিন্তু মদিরা অপেক্ষা ধনলালসা মানুষকে অধিকতর উন্মত্ত করিয়া থাকে। অক্ষয়ানন্দ এই কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কোনও লৌহ-ঢালাই কারখানা হইতে লোহার নিরেট গোলা ঢালাই করানো হইলে, ইস্ক্রু-কাটা লেদ্ যন্ত্রে তাহার মধ্যে ইস্ক্রু যুক্ত গর্ত্ত এবং তাহার ইস্ক্রু যুক্ত ছিপিও প্রস্তুত হইল। তাহার মধ্যে সাধারণ পারদ ভরিয়া ছিপি কাচের গুঁড়া দিয়া বন্ধ করা হইল।

যে কয় দিন এই সকল যোগাড়যন্ত্র হইতেছিল, সেই কয় দিন পূর্ণবাবুর আড্ডায় "ম" পঞ্চক খুব আড়ম্বরে চলিয়াছিল। পূর্ণবাবুর আড্ডা খুব জাঁকিয়া উঠিল। এক বাবাজী আসিয়াছেন, লোহার গোলা করিয়া পারাভস্ম হইবে। সেই ভস্ম এক রতি ও তামা ৫২ ভরি একত্র করিলে, ৫২ ভরি পাকাসোণা প্রস্তুত হইবে, এই সকল কথার জল্পনা হইতে লাগিল।

যে লোকটির নিকট অক্ষয়ানন্দ লৌহগোলকের কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি প্রতিদিন কালীঘাটে আসিলেও, এই ব্যাপার তাঁহার নিকট গোপন করা হইল। সত্য সত্যই যে অক্ষয়ানন্দ লৌহগোলকের মধ্যগত করিয়া পারদ ধাতু অগ্নিতে রাখিবেন, এ কথা অক্ষয়ানন্দ তাঁহাকে জানাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কোথায় ভস্ম করা হইবে? এই বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির হইল যে, টালিগঞ্জ পুলের দক্ষিণে তর্পণঘাটা নামে এক নির্জ্জন শ্মশান আছে,—সেই স্থানেই এ কার্য্য করিতে হইবে। সেই স্থানে "গোপাল গির্" নামক এক বৃদ্ধ অবধূত একটি ছোট আশ্রম করিয়া, কিছু দিন সেই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। গোপাল গির্ সেস্থান হইতে চলিয়া গেলে, আশ্রম শূন্য পড়িয়া ছিল। অক্ষয়ানন্দ এবং তাঁহার বন্ধুগণ সেই স্থানেই সেই পারদপূর্ণ লৌহগোলকে অগ্নি দিবার সংকল্প করিলেন।

এই স্থলে পাঠকগণকে "পারদ ভস্ম" সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব। আমাদের কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে ইহা বিশদ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, পারদের ভস্ম দ্বারা তাম্রধাতুকে সুবর্ণ করা যায়। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই বিদ্যা এখনও দেখা যাইতেছে। ইয়োরোপ মহাদেশেও এই বিদ্যা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাঁহারা বর্ত্তমান কালে র‍্যাডিয়ম্ তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা বলেন, র‍্যাডিয়মের নিকট কোনও ধাতু রাখিয়া দিলে, তাহা নিকৃষ্ট ধাতু হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ এই যে, সোণা রাখিলে রৌপ্য হইয়া যায়। তাম্র ধাতু রাখিলে তাহা সীস ধাতু হয়। এ অবস্থায় আমরা কি বুঝিব?—বাধ্য হইয়াই আমাদের বলিতে হইতেছে যে, শতাধিক বৎসরের পুরাতন Atomic Theory একেবারে নির্ভুল নহে। কোন অজ্ঞাত শক্তি এমন থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা ধাতু সকলের উন্নতিও হয়। পারদ ভস্মের সেই শক্তি আছে, ইহা সন্ন্যাসীরা বলেন। 'রসেশ্বর দর্শন' নামে এক শাস্ত্র আছে, তাহা কেবল এই পারদ লইয়া সাধন-পদ্ধতি। ইহা ছাড়া আমাদের তন্ত্র-শাস্ত্রেও পারাভস্ম করিবার বহু পদ্ধতি রহিয়াছে।

এতদ্দেশে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন, গহনানন্দনাথ, গোরক্ষনাথ, পরশ্‌নাথ প্রভৃতি যোগিরাজগণ এই বিষয়ে বহু শ্রম করিয়াছেন। কথিত আছে, উপরিউক্ত মহাপুরুষগণ সকলেই ইচ্ছামত সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

এই সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কিম্বদন্তিও আছে।—

(১) "তেরি গন্ধক মেরি পারা
নাগ্নাগিনীসে কর সঞ্চারা,
নাগ রসসে নাগিনী রস দেনা,
ঝট্‌পট্ কাঞ্চন কর্‌লেনা।

(২) "মুসাকাণি ছট্‌ফটিকা দূর্ব্বাতলে বাসা,
রস নিঙ্গাড়্‌কে বঙ্গ্‌মে দিয়ে চাঁদি হোয়ে খাসা"

(৩) কহনা কেমনে সখি, রামকৃষ্ণ এক দেখি
রামকৃষ্ণ একতনু, এই তো শুনিয়াছিনু,
সুনীল মেঘের বর্ণ হবে দূর্ব্বাদল শ্যাম,
শ্রীরামের বামে সীতা লক্ষ্মীদেবী অনুপাম্।"

প্রথম কবিতার ব্যাখ্যা আমি করিতে পারি না। নাগ অর্থে সীসা, নাগিনীরস সর্পবিষ (?) অথবা কোন ধাতু হইতে পারে, সুতরাং ঐ কয়টি কথা গুরুমুখগম্য। দ্বিতীয় কবিতার অর্থ এই—মুসাকাণি এবং

ছট্‌ফটিকা নামে ছোট ছোট গাছ, যাহা দূর্ব্বা ঘাসের নীচে জন্মে, তাহার রস রাঙ্গ অথবা কাংসে দিলে, চমৎকার রৌপ্য হইয়া থাকে।

ঐ সকল কথার বিস্তার এ প্রবন্ধে করিব না, এক্ষণে অক্ষয়ানন্দের কথাই বলা আবশ্যক।

যে দিন অপরাহ্নে অক্ষয়ানন্দ দলবল লইয়া তর্পণঘাটা নামক শ্মশানে গিয়াছিলেন। সেই দিন ঐ ক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া "পঞ্চমকার" * সংগ্রহ করা হইয়াছিল। অক্ষয়ানন্দের পূজার কালে ঐ "পঞ্চমকার" আবশ্যক হইবে, সুতরাং পারাভস্ম করিতে উহার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল।

হায়, শাস্ত্র-কথা সকলের কুব্যাখ্যার ফলে, তন্ত্রানুষ্ঠান সকল এক্ষণে অতি জঘন্য ভাব ধারণ করিয়াছে। অক্ষয়ানন্দের ন্যায় মূর্খেরা মনে করে, দেবতাকে মদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলে কলিকালে তন্ত্রাদির উল্লিখিত অনুষ্ঠান আশু সিদ্ধি প্রদান করে। দেবতারা যেন মদ্য মাংসাদির জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন।

সেই নির্জ্জন শ্মশানের এক পার্শ্বে গজপুট † প্রস্তুত করিয়া, তাহার নীচে কাঠ-কয়লার অগ্নি রাখিয়া পুটের অর্দ্ধেক ঘুঁটিয়া দ্বারা পূর্ণ করা হইল; তাহার উপরে পারদ পূর্ণ লৌহ গোলক রাখিয়া তদুপরি আরও ঘুঁটিয়া দিয়া পুট পূর্ণ করা হইল। ক্রমশঃ ধোঁয়া হইয়া এক-ঘণ্টার মধ্যেই উপরিস্থিত ঘুঁটে ধরিয়া অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

অক্ষয়ানন্দ সেই সময়ে পঞ্চমকার সহকারে জপ করিতেছিলেন। এই সময়ে একজন সেই প্রজ্বলিত গজপুটের নিকট গিয়া দেখিল যে, লৌহ-গোলক অগ্নিবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে ব্যক্তি সেই কথা অক্ষয়ানন্দকে জানাইল—

"বাবাজী, গোলা লাল হইয়াছে।"

সেই কথা শুনিবামাত্র অক্ষয়ানন্দ চিম্‌টা লইয়া উঠিল। তখন মদের নেশায় তাহার পা টলিতেছিল। এই সময়ে সকলেই তাহাকে বলিল, ঐ অগ্নিবর্ণ গোলা উঠাইবার প্রয়োজন নাই। উহা শীতল হইলে, উহা হইতে ভস্ম লইবেন। কিন্তু মৃত্যু উপস্থিত হইলে, লোকে ভাল কথায় কর্ণপাত করে না, অক্ষয়ানন্দও করে নাই। চিম্‌টা ফাঁক করিয়া সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে গোলা উঠাইয়া তাহা নিকটে রাখিল। সেই অন্ধকার রাত্রিতে অগ্নিবর্ণ গোলার মূর্ত্তি দেখিয়া, এবং মাতাল সন্ন্যাসী তাহার উপর চিম্‌টার আঘাত করিবে, ইহা ভাবিয়া, সকলেই দূরে পলাইয়াছিল। নিকটেই একটা গভীর পয়নালা ছিল। অনেকেই তাহার নীচে নামিয়া বসিয়া ছিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই কামানের মত একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, এবং সেই স্থানে একটা শ্বেতবর্ণের ধূম দ্বারা সকল বস্তুই আচ্ছন্ন হওয়ায় প্রথমতঃ কিছু বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, সন্ন্যাসী গড়াইতে গড়াইতে গঙ্গার জলে গিয়া পড়িল। গঙ্গায় জল অল্প ছিল, হাঁটু ডুবে না। অক্ষয়ানন্দ জলের উপরেও পাক খাইতে খাইতে পূর্ব্বপারে একটা ছোট খড়ের গাদার উপর গিয়া পড়ে। সেইখানে কিছুকাল (২ মিনিট) হাত পা আছড়াইয়া স্থির হয়।

গঙ্গার পশ্চিম পারে যাহারা ছিল, সকলেই পলাইল। কেহ করুণাময়ীর মন্দিরাভিমুখে, কেহ কেহ কালীঘাটে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পর দিবস পুলিস প্রমুখ কতিপয় লোক যাইয়া এই অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর পেটে বিপুল ক্ষত, এবং পেটের মধ্যে সেই লৌহ গোলকের খণ্ড সকল দেখিতে পাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী পারা ভস্ম করিতে গিয়া মরিয়াছে, এই বুঝিয়া তাহার দেহের অগ্নিসংকার করা হইয়াছিল।

হায় অক্ষয়ানন্দ! তুমি এত দিনে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসরের হইয়াছ। এ জন্মেও কি আবার ঐ বুদ্ধি মাথায় প্রবিষ্ট হইয়াছে? আবার কি পারা লইয়া ঘষা-মাজা চলিতেছে? আশা করি, এবার পারদ ধাতুকে দণ্ড দ্বারা মারিয়া বাধ্য করিবে না; এবার উহাকে শিবরূপে পূজা করিয়া দেখ, রসায়ন কল্প সুসিদ্ধ হয় কি না!

* পঞ্চমকার কি, তাহা তন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

† এক হস্ত ব্যাস এবং দুই হস্ত প্রমাণ গভীর গর্ত্তকে গজপুট বলে।

আমিনা বিবির আত্ম-কথা

রায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর

একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একখানা বাড়ী, তাহার চারিদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। বাড়ীতে চারি ভিটায় চারিখানি খড়ের ঘর ও মধ্যে উঠান। ইহা একজন মুসলমান কৃষকের বাড়ী হইলেও, সাধারণ কৃষকের বাড়ী অপেক্ষা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চাল-ঘরের মাটীর দাওয়াগুলি উত্তম-রূপে নিকান। উঠানটিতে একটুও আবর্জ্জনা নাই, যেন ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

আমি এক দিন কার্য্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে গিয়াছিলাম। বেলা অনুমান ৩টার সময় নদী পার হইয়া ঘাটের নিকটে একটা বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিলাম। সেই ঘাটের পশ্চিমেই ঐ কৃষকের বাড়ী। দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক কলসী কাঁখে করিয়া নদীতে জল আনিতে যাইতেছে। আমি দেখিয়া অবাক্ হইলাম, এরূপ তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা রমণী ঐ গরিব মুসলমান কৃষকের গৃহে কোথা হইতে আসিল? তাহার চেহারা দেখিয়া তাহাকে ভদ্রঘরের হিন্দু-রমণী বলিয়া বোধ হইল। বয়স প্রায় ৩০ হইবে, বেশী লজ্জা-সরমের ধার ধারে না। সে জল লইয়া ফিরিবার সময় আমার ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি তাহার প্রতি নিবদ্ধ আছে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল,—

"আপনি কোথায় যাবেন? আপনার নাম কি?" আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলাম,—"আমার নাম রসিকলাল সেন, আমার বাড়ী নিশ্চিন্তপুর, আমি ঐ সদরপুর গিয়াছিলাম, এখন বাড়ী ফিরিতেছি। ও বাড়ী কার?" "ও বাড়ী তোরাপ ফকিরের। ফকির মারা গিয়াছে। আমি এখন দুইটি ছেলে নিয়ে ওখানে থাকি। আপনি তামাক খাবেন? আসুন, ঐ বাহিরের ঘরে বসিবেন।"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বাহিরের ঘরে একটা মোড়া ছিল ও তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম—হুঁকা, কল্‌কে প্রভৃতি ছিল। স্ত্রীলোকটি আমাকে সেখানে বসিতে বলিয়া জলের কলসী রাখিতে অন্দরে গেল, এবং একটা মালসায় আগুন লইয়া আসিয়া আমাকে তামাক সাজিয়া খাইতে বলিল।

আমি তামাক সাজিতে বসিয়া গেলাম। সে বলিল—"আমার ছেলে দুইটি স্কুলে গিয়াছে, বড়টির বয়স দশ বৎসর, ছোটটির বয়স সাত বৎসর। এ বাড়ীতে আমার এক বুড়া সতীন আছে, তার বড় ব্যারাম, ঐ ঘরে শোওয়া।"

আমি তামাক খাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলাম,—"তোমার চেহারা দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তোমাকে হিন্দুর মেয়ে বলিয়া বোধ হইতেছে। তোরাপ ফকিরের সঙ্গে তোমার কিরূপে বিয়ে হ'লো? যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বল।"

সে কিছু দূরে অন্দরের দিকের দরজায় বসিয়া বলিল,—

"আমার সেই দুঃখের কথা যখন আপনি শুনিতে চাহিতেছেন, তবে আমার বলবার কোন বাধা নাই। দেশশুদ্ধ লোক যাহা শুনিয়াছিল, যাহা লইয়া এক সময়ে মস্ত একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল, সে কথা আপনাকে বলিব না কেন? আমি যথার্থই হিন্দুর মেয়ে, এক সময়ে হিন্দুর বৌ ছিলাম। হিন্দুর রক্ত এখনও আমার শরীরের মধ্যে আছে, তাই কোন হিন্দু ভদ্রলোক দেখিলে যাচিয়া কথা কহিতে ইচ্ছা করে। আপনার কলিকার আগুনটা ধরিল না বুঝি—দেন কলিকাটা আমার হাতে, আমি ফুঁ দিয়া দিই।"

আমি বলিলাম—"না—এই আগুন ধরেছে—কলিকায় তামাক খাওয়া ত আমার অভ্যাস নাই—"

"কি করিব—এখানে যে হুঁকা আছে তা' আপনাকে দিতে পারিব না। আচ্ছা, একটু কলার পাতা আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া সে উঠিয়া একটুকরা কলার পাতা আনিয়া একটা ঠোঙ্গা করিয়া দিল। আমি তাহার মধ্যে কলিকা

বসাইয়া তামাক খাইতে লাগিলাম। তখন সে আবার বলিতে লাগিল—

"আমার বাপের বাড়ী ছিল লক্ষ্মীকান্তিপুর গ্রামে, আমার বিবাহ হইয়াছিল সনাতনপুর ঘোষেদের বাড়ী। আমার নাম ছিল মৃন্ময়ী, ডাক নাম মিনী,—তাহা হইতে হইয়াছে আমিনী। আমার বয়স যখন এগার বৎসর, তখন আমার বাবা মারা যান,—আমার মা আগেই স্বর্গে গিয়াছিলেন। তখন আমার কাকা হইলেন আমার অভিভাবক। সংসারে এক কাকীমা ভিন্ন আর স্ত্রীলোক ছিল না। তাঁহার দুইটি ছোট ছেলে ছিল। আমার একটি সহোদর ভাই ছিল, সে আমার ৩।৪ বৎসরের বড়। সে গ্রামের স্কুলে লেড়াপড়া করিত। আমার কাকার সব গুণ ছিল,—আমাকে আপন সন্তানের মত দেখিতেন; কিন্তু তাঁহার এক প্রধান দোষ ছিল, তিনি বড় মদ খাইতেন।

"আমার বিবাহের বয়স হইয়াছে দেখিয়া কাকা পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন। সনাতনপুরের অমুক ঘোষ (এখনও তাহার নাম মুখে আনিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, সেজন্য নাম করিলাম না)—সে ছিল আমার কাকার মদের এয়ার। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা থানা ছিল, সে সেই থানায় কাজ করিত এবং প্রায়ই সন্ধ্যার পরে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাকার সঙ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া মদ খাইত। নিজের রূপ-গুণের কথা নিজের মুখে বলা মহাপাপ। এখন যেটুকু দেখিতেছেন, তাহা হইতে অবশ্য বুঝিতে পারেন, সেই উঠন্ত বয়সে আমার রূপ ছিল,—তাহাই আমার কাল হইল। সেই ঘোষও দেখিতে বেশ সুপুরুষ ছিল; কিন্তু তাহার বয়স তখন ত্রিশের উপরে। আর তাহার প্রথম পক্ষের এক স্ত্রী ছিল; কিন্তু সে না কি দেখিতে কুৎসিত বলিয়া সে তাহাকে লইয়া ঘর করিত না। সে নিজের রূপের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কেবল সুন্দরী স্ত্রীলোক খুঁজিয়া বেড়াইত। সে পুলিসের জমাদারী চাকরি করিত, সেই সুযোগে নিজের কুবাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগও পাইত।

"আমার কাকা যখন আমার বিবাহের পাত্র খুঁজিতেছিলেন, তখন সে আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া কাকাকে ধরিয়া বসিল। কাকা তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না; বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন, এ লোকটা একটা সরকারী চাকরি করিতেছে, বিষয়-সম্পত্তিও কিছু আছে; সুতরাং ভাত কাপড়ের কষ্ট হইবে না, আর টাকাও কিছু দিতে হইবে না। এইরূপে সেই ঘোষের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহের পরে সে আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। তখন আমার বয়স ১৩।১৪ হইবে। সংসারে তাহার এক সৎমা ছিলেন। তাঁহাকে সে দেখিতে পারিত না। তিনি পৃথক হইয়া থাকিতেন। সেই অল্প বয়সেই আমার উপর সংসারের ভার পড়িল। আমি অনেক সময়ে তাহার মনের মত কাজ করিতে পারিতাম না, সে জন্য সে আমাকে মারধর করিত। ক্রমে আমার বয়স বাড়িল, কিন্তু তবুও তাহার মনজোগান আমার পক্ষে কঠিন হইত। সে মদ খাইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। এই ভাবে দুই বৎসর কাটিল। তখন ঘুস লওয়া অপরাধে তাহার পুলিসের চাকুরি গেল। তখন দেশে থাকিলে আর চলে না,—সে চাকরির চেষ্টায় কলিকাতায় গেল। আমাকে আমার কাকার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

"ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে কাকার মৃত্যু হইয়াছিল। সেখানে সংসারের অভিভাবক একমাত্র কাকীমা! আমার দাদা তখন গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া মহকুমার স্কুলে পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে কুসঙ্গে পড়িয়া তাহার স্বভাব খারাপ হয়। আমি তাহার নিকট কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম, অধিকাংশ ছাপার বই পড়িতে পারিতাম। দাদা যখন বাড়ী আসিত, তখন সে কত বাঙ্গলা বই সঙ্গে আনিত। আমি সেগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িতাম। কিন্তু তাহার মধ্যে ভাল বই প্রায়ই থাকিত না। আমার বোধ হয় সেই সকল বই পড়িয়াই দাদা বেশী গোল্লায় গিয়াছিল। তবে, এ কথা পরে শুনিয়াছি, আমার স্বামীই না কি তাহাকে মদ খাওয়াতে হাতে-খড়ি দিয়াছিল।

"একটা কথা আছে, সৎসঙ্গে কাশীবাস—অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। আমার কোন সৎলোকের সঙ্গ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ঐ সকল খারাপ বই আমার অসৎসঙ্গের কাজ করিয়াছিল। ঐ সকল বই পড়িতে পড়িতে সময় সময় আমার রক্তে যেন আগুন ধরিয়া যাইত। কিছু দিন পরে আমার ফিট্ হওয়া আরম্ভ হইল। আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে নানা কারণে হিষ্টিরিয়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে সময়ে পাড়াগাঁয়ের লোকে এই রোগের প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল, আমার উপর ভূতের দৃষ্টি হইয়াছে, কেহ বলিল কালীর ভর—ইত্যাদি। কাকীমা সেই সকল লোকের পরামর্শে নানা প্রকার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কেহ জলপড়া খাওয়াইল, কেহ মন্ত্র পড়িয়া হাতে লাল সুতা বাঁধিয়া দিল, কেহ মাথার চুলের সঙ্গে মাদুলি বাঁধিয়া দিল। আবার এক জনের ব্যবস্থা অনুসারে আমাকে এক শনিবার সন্ধ্যাকালে বিবস্ত্রা হইয়া বাগান হইতে একটা গাছের শিকড় আনিয়া গলায় ঝুলাইতে হইল। কিন্তু এত করিয়াও কোন ফল হইল না।

"আমার যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন এই বাড়ীর তোরাপ ফকির আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইল। এ ব্যক্তি চাষবাস করিত, আবার ফকিরামি করিয়াও বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিত। ইহার নানা স্থানে অনেক শিষ্য ছিল। আমার কাকার বাড়ীর নিকটে ইহার এক শিষ্যবাড়ী ছিল,—সেখানে সে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিল। সে অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানিত,—অনেক লোক তাহার নিকট মাদুলী, কবচ, তেলপড়া, জলপড়া, সুতাপড়া লইতে আসিত। সে ভূর্জ্জপত্রে লাল কালী দিয়া কি সব মন্ত্র লিখিয়া দিত, লোকে তাহাই তামার মাদুলীতে পুরিয়া গলায় বা কোমরে ধারণ করিত। আপনি এখন যে ঘরে বসিয়া আছেন, এখানে বসিয়া এই সব কাজ হইত। কোন গ্রামে কলেরা হইলে, গ্রামী লোকেরা চাঁদা করিয়া তাহাকে লইয়া যাইত। সে যাইয়া গ্রামের চারি কোণে মন্ত্র পড়িয়া শিকড় পুঁতিয়া দিয়া আসিত, আর রোগীকে জলপড়া খাওয়াইত। এক গ্রাম হইতে কলেরা বা গরুর মড়ক অন্য গ্রামে তাড়াইয়া দেওয়ারও না কি তার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আমি এ সকল বিশ্বাস করি না।

"তাহার গুণ-জ্ঞানের কথা শুনিয়া আমার কাকীমা এক দিন তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইলেন। সে আমার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ইহার উপর কালীর "দেষ্টি" হইয়াছে,—আমি আসছে অমাবস্যা রাত্রে একটা ঘরে বসিয়া কালীর পূজা করিব, ইহাকে সেখানে আনিতে হইবে, ঘরে আর কেহ আসিতে পারিবে না, পূজাতে জবা ফুল, ধূপ ধুনা লাগিবে। কাকীমা সম্মত হইলেন, কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে একলা এক ঘরে বসিয়া থাকিতে প্রথমে স্বীকার করি নাই। কাকীমা নিতান্ত জেদ করিতে লাগিলেন—"তোর ভয় কি? আমি ত পাশের ঘরেই থাকিব, ও ফকিরের নাম ডাক আছে ভাল,—দেখি, তোর যদি ব্যারামটা সারাইতে পারে।" আমি অগত্যা সম্মত হইলাম।

"সেই অমাবস্যা রাত্রে ফকির আমাদের বাড়ীতে আসিল। তাহার বয়স তখন প্রায় ৩০ বৎসর, চেহারা কালো কোলো, গড়ন খুব বলিষ্ঠ। আমাদের পশ্চিমদ্বারী খড়ো ঘরের মধ্যে তাহার আসন হইল। সে ঘরটা আগে পরিষ্কার করিয়া লেপান হইয়াছিল। ঘরে ধূপ ধুনা জ্বালা হইল ও আমাকে তাহার সম্মুখে একখানা আসনে বসাইয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন আমার ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু কাকীমা তাহার পাশে দক্ষিণদ্বারী ঘরে বসিয়াছিলেন, সেজন্য কিছু বলিলাম না। সে প্রথমে একটা ঘটিতে জল পড়িয়া সেই জল আমাকে খাইতে বলিল, আমি এক চুমুক খাইলাম। পরে আমার মাথায় একটা জবা ফুল বাঁধিয়া দিয়া আমাকে চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে বলিল। সে বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল, এবং সময় সময় "আয় কালী আয়—কার আজ্ঞা? শিবঠাকুরের আজ্ঞা" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে লাগিল। সে আমার চোখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এই রকম প্রায় এক ঘণ্টা থাকার পর আমার চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল। তখন গভীর রাত্রি, জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। আমাদের বাড়ীর চারিদিকে বাগান ও জঙ্গল,—কাছে আর কোন বাড়ী ছিল না। কাকীমা বোধ হয় তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ফকির আমাকে তখন বলিল—"দেখ, তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে, তুমি লজ্জা করিও না, কালী যেমন এক পা সামনের দিকে আর এক পা পিছনের দিকে দিয়া বিবস্ত্র হইয়া দাঁড়ান, তোমাকেও সেই ভাবে দাঁড়াইতে হইবে। তোমার মধ্যে কালী আসিবেন, আমি তাঁহার পূজা করিব।" আমি তাহার এই লজ্জাজনক কথা শুনিয়া কিছুতেই উঠিয়া দাঁড়াইলাম না। পরে সে আমার মাথায়, কপালে ও চোখে হাত বুলাইয়া দিল,—তখন আমার চোখ যেন

আবার বুজিয়া আসিল। আমি তখন তাহার হাতের ইঙ্গিত মতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—কিন্তু কাপড় খুলিলাম না। তখন সে ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বলিল,—"এখন কাপড় খোল, লজ্জা কি ?" আমি যেন তাহার প্রবল ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া কাপড় খুলিয়া ফেলিলাম ও সেই ভাবে দাঁড়াইলাম। তখন সে আবার মন্ত্র পড়িয়া আমার গায়ে জবা ফুল ফেলিয়া দিতে লাগিল। তিনবার ফুল দেওয়ার পর, সে আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া ঝাড়িতে লাগিল। আমি তাহার হাতের স্পর্শে বাঁশের পাতার মত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম এবং আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িলাম। তার পরে কি হইল আমার মনে পড়ে না, আমার চৈতন্য লোপ হইল।

আমার যখন আবার চেতনার সঞ্চার হইল, তখন আমি একখানা নৌকার মধ্যে। আমার পাশে সেই ফকির বসিয়া আছে, আর দুইজন লোক খুব জোরে নৌকা বাহিতেছে। আমি তখন কাঁদিয়া উঠিলাম। ফকির একখান গামছা দিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। সে খুব বলবান,—আমি তাহার সঙ্গে জোরে পারিব কেন। আমি একবার নৌকা হইতে জলে লাফ দিয়া পড়িতে চেষ্টা করিলাম। তাহা দেখিয়া ফকির আমার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং নৌকার গুণের দড়ি দিয়া আমায় বাঁধিয়া রাখিল। এই অবস্থায় আমার বারবার ফিট্ হইতে লাগিল। ফকির তখন আমার চোখে-মুখে জল ছিটাইয়া দিল। রাত্রি যখন ভোর হয় তখন নৌকা একটা গ্রামে পৌছিল; এবং অন্ধকার থাকিতে থাকিতে ফকির আমাকে কাঁধে করিয়া তুলিয়া এক মুসলমানের বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে একটা ঘরে আমাকে পূরিয়া, তাহার দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিল। আমি সাত দিন পর্য্যন্ত সেখানে আটক ছিলাম।

পরে শুনিয়াছি, পরদিন সকালে আমাদের গ্রামে মস্ত একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কাকীমা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন,—আমাকে খুঁজিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল। সকলে গুজব রটাইয়া দিল,—আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফকিরের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছি। আমার দাদা চিঠি পাইয়া বাড়ী আসিয়া এজাহার দিতে গেল। থানার দারোগা আগেই সে গুজব শুনিয়াছিল। সে কোন এজাহার না লইয়া, আমার স্বামীকে আনাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে দরখাস্ত দিতে পরামর্শ দিল। আমার স্বামী তখন কোথায়? তাহার নিকট কলিকাতায় চিঠি লেখা হইয়াছিল। বোধ হয় সে ঐ চিঠি পায় নাই,—পাইলেও আসিত কি না সন্দেহ। পরে ফকিরের নিকট শুনিয়াছি, আমার স্বামীকে চেহারা দেখিয়া ভদ্রলোক বিবেচনা করিয়া এক বুড়ো দোকানদার তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সে সেই বৃদ্ধের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে কতকগুলি টাকা ও গহনাপত্রসহ বাহির করিয়া লইয়া গিয়া, কোথায় এক দোকান দিয়া স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করিতেছিল।

যাহা হউক, আমার আর খোঁজ হইল না। ফকির আমাকে সাত দিন পরে আর এক গ্রামে লইয়া গেল; এবং এই রূপ নানাস্থানে ঘুরাইয়া অবশেষে তাহার এই বাড়ীতে লইয়া আসিল। এখানে আনিয়া মোল্লা ডাকাইয়া কলমা পড়াইয়া সে আমাকে নিকা করিল। তাহার দস্যুতার ভয়ে আমি তাহার মত অনুসারে চলিতে বাধ্য হইলাম। তাহার আর এক বৌ ছিল, তাহার কোন ছেলেপুলে হয় নাই। সে এখন ঐ ঘরে ব্যারাম অবস্থায় শুইয়া আছে। আমি থাকিবার জন্য একটা পৃথক ঘর চাহিলাম, এবং পৃথক রান্নাঘরে নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইতে লাগিলাম। সে আমার হিঁদুয়ানী বজায় রাখিবার জন্য নহে—তখন আবার আমার হিঁদুয়ানী কোথায়?—ওদের হাতে খাইতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। ক্রমে আমার গর্ভে চারিটি সন্তান হইল। তাহার প্রথম দুইটি মারা গিয়াছে; এখন দুইটি ছেলে বাঁচিয়া আছে। আমার সেই ফিটের ব্যারাম প্রথম সন্তান হওয়ার পরে আপনিই সারিয়া গেল। আজ ৩ বৎসর হইল সেই ফকির মারা গিয়াছে। সে যে জমি, বাড়ী, নগদ টাকা কড়ি রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের খাওয়া-পরার কষ্ট নাই।

"আমাকে বাড়ী আনার পরে ফকির সর্ব্বদা আমাকে খুসী করার চেষ্টা করিত। আমার থাকার জন্য পৃথক ঘর করিয়া দিয়াছিল এবং যাহাতে আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বাড়ে সেই চেষ্টা করিত। আমি পেঁয়াজ-মুরগী খাই না বলিয়া সে নিজেও এ সকল খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু হইলে কি হয়? আমি তাহাকে এক দিনের তরেও ভালবাসিতে পারি নাই। প্রথমে সে আমার উপর দস্যুবৃত্তি করাতে, তাহার প্রতি আমার যে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছিল, আমি কিছুতেই তাহা কাটাইতে পারি নাই। আমার স্বামীর প্রতিও আমার যে যথার্থ ভালবাসা জন্মিয়াছিল, এ কথা বলিতে পারি না। সে ছিল গ্রাম্য হিংস্র জন্তু, আর এই ফকির ছিল বন্য হিংস্র জন্তু।

"এখন মানুষ ত একটা অবলম্বন লইয়া থাকিতে চায়, নচেৎ সে কিরূপে বাঁচিবে? আমি এতকাল মুসলমানের সংসর্গে বাস করিলেও আমার শরীরে হিন্দুর রক্ত প্রবাহিত আছে। হিন্দুর সংস্কার এখনও আমার মনে ষোলআনা বর্ত্তমান। এখনও হিন্দুর বাড়ীতে পূজায় ঢাকঢোল বাজিতে শুনিলে আমার চোখে জল আসে। আমার এই জন্মগত সংস্কারই আমাকে আমার প্রকৃত পথ চিনাইয়া দিয়াছে। আমি ঘোর পাপী সন্দেহ নাই, নচেৎ আমার ভাগ্যে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন? কিন্তু এরূপ একজন ত আছেন, যাঁহার নিকট কাঁদিলে তিনি পাপীর দুঃখও শোনেন। আমি সেই হরির চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াছি। ঐ দেখুন—উঠানের কোণে একটা তুলসী গাছ আছে; তাহার চারি পাশে আমি নিজের হাতে কত ফুলগাছ লাগাইয়াছি। ঐ তুলসীতলায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিয়া বসি, ও হরিঠাকুরকে কত ডাকি। ঐ সব ফুলগাছে যখন ফুল ফোটে, তখন মনে মনে সেই ফুল ঠাকুরের চরণে নিবেদন করি। ঐ শিউলি গাছের ফুল যখন শিশিরে ভিজিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া তুলসীগাছের মাথায় পড়ে, তখন হাতযোড় করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলি, 'ঠাকুর, আমার পূজা গ্রহণ কর। আমি যবন হইয়াছি, আমার হাতের ফুল ত তুমি লইবে না!' পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কিছু লেখা-পড়া জানিতাম,—এখন ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে আরও কিছু শিখিয়াছি। শুনিয়াছি, নদীয়ার গৌরাঙ্গ যবন হরিদাসকে কোল দিয়াছিলেন,—হরিনামের এতই মাহাত্ম্য। দয়াল হরি কি এই পাপিষ্ঠাকে চরণে স্থান দিবেন না?"

এই বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া আবার বলিল—"ছেলেদের ইতিহাসে লেখা আছে, দিল্লীর এক বাদশার এক হিন্দু বেগম ছিলেন; তিনি হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া বাদশার সঙ্গে থাকিতেন ও প্রত্যহ যমুনায় স্নান করিতে যাইতেন। তাঁহার সঙ্গে আমার তুলনা হয় না, তবে এ কথা বলিতে পারি,—আমি ইচ্ছা করিয়া কোন অহিন্দুর আচরণ করি না।

"এই ত আমার জীবনের কেচ্ছা আপনাকে সব খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়াছি, নিজের পাপের কাহিনী অন্যের কাছে নিজের মুখে ব্যক্ত করিলে পাপের লাঘব হয়। আমি কত দিন মনে করিয়াছি—আমার দাদা কি আর কোন আত্মীয় আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবে, আমি তাহাদিগকে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব ও আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনাইব। ঐ নদী দিয়া কত নৌকা যায়, আমি ঘাটের পাড়ে বসিয়া থাকি। কিন্তু আমার এমনই পোড়া-কপাল, সে অঞ্চলের কাকটা পর্য্যন্ত এদিকে আসে না। কোন হিন্দু ভদ্রলোককে দেখিলে তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া মনের জ্বালা জুড়াইতে ইচ্ছা করে। তাই আজ যখন আপনাকে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম, তখন আপনার সঙ্গে কথা কহিলাম। আপনি হয়ত আমাকে নিতান্ত নির্লজ্জা মনে করিয়াছেন। আপনার চেহারা কতকটা আমার দাদার মত। পরে যখন আপনি আপনার নাম বলিলেন, তখন জানিলাম, আপনার যে নাম—আমার দাদারও সেই নাম। আপনি আমার ধর্ম্ম-ভাই। আর যদি কখনও এ পথে আসেন, তবে এ দুঃখিনীকে দেখিয়া যাইবেন। ভাল কথা—যে গরম পড়িয়াছে, আপনি একটু জল খান। আমার হাতের ছোঁয়া জল খাইতে বলি না, আমি একটা পিতলের ঘটী ও গেলাস মাজিয়া দিতেছি, ঐ নদী হইতে আপন হাতে জল তুলিয়া আনুন। আমার ঘরে হরির লুটের বাতাসা আছে, তাই দিয়া জল খান।"

আমি তার এই বিষাদপূর্ণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। এবার উঠিয়া বলিলাম—

"দাও বোন, আমি জল আনিয়া খাইতেছি।"

সে অমনি একটা ঘটী ও গেলাস আনিয়া দিয়া বলিল "ঐ যে আমার ছেলেরা স্কুল থেকে আসিতেছে।"

আমি নদী হইতে জল আনিয়া দেখিলাম, দুইটি সুকুমার শিশু উঠানে দাঁড়াইয়া কলা খাইতেছে। তাহারা মায়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পাইয়াছে। আমাকে আসিতে

দেখিয়া আমিনা বলিল—"ঐ দেখ্, উনি তোদের মামু—ওঁকে সেলাম কর।"

শিশু দুটি আমার কাছে আসিয়া সেলাম করিল—আমি তাহাদের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। আমিনা আমার জলখাবার বাতাসা আনিয়া দিয়া বলিল, "ঘরে ভাল পাকা কলা আছে, তাহার দুটা দিই ?" আমি কলা আনিতে সম্মতি দিলাম।

আমি যখন উঠানে বসিয়া জলযোগ করিলাম, তখন সে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আমি যখন বিদায় হই, তখন সে তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাতে নেকড়ায় বাঁধা আর কতকগুলি কলা গুঁজিয়া দিয়া বলিল—

"দাদা, এগুলি বাড়ী গিয়া ছেলেদের দিবেন।"

তাহার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে আমার চোখে জল আসিল। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই হরিবংশ। আবার অনেকে বলেন—বেদপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ। রামায়ণেও শ্রীকৃষ্ণ। এ ত গেল সংস্কৃতে। বাঙ্গলার লোক কি বলে ? কানু ছাড়া গীত নাই। সেই শ্রীকৃষ্ণকে, সেই কানুকে একখানি নাটকের মধ্যে আনা সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। অনেকে বলিবেন, সামান্য ধৃষ্টতার কর্ম্ম নহে। সাহসই হৌক আর ধৃষ্টতাই হৌক, অপরেশবাবু আনার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আনিয়াছেন। ভগবানের সর্ব্বতোমুখ উদ্যম, সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা এবং সর্ব্বতোমুখী বিভূতিকে সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই উহাঁর একটীমাত্র বিভূতি ভূভারহরণকে বীজ করিয়া অপরেশবাবু এই অপূর্ব্ব নাটকের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥"

তেমনি এই শ্রীকৃষ্ণ নাটকেরও আদাবন্তে চ মধ্যে চ পৃথিবীভার হরণং সর্ব্বত্র গীয়তে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বড় একটা নাই। কেবল দানলীলা ও অক্রূর সংবাদ, ভূভার-হরণের সূচনা মাত্র। তার পর কংস-বধ, জরাসন্ধ-বধ, শিশুপাল-বধ, কৌরব-বধ—সবই আত্মীয়-স্বজনের বধ। তার পর নিজ বংশ যদুবংশ ধ্বংস, তার পর আত্মনিপাত, নিজেরও ধ্বংস। এই ভূভার-হরণের শ্রীকৃষ্ণ অপরেশবাবু গাহিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাহাকেই ভূমির ভার বোধ করিয়াছেন, তাহাকেই সরাইয়াছেন, তাহার বেলায় তিনি পক্ষপাতশূন্য। প্রথম মামা, তার পর মামার শ্বশুর, তার পর পিস্তুতা ভাই। তার পর কুরুকুল, সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণ, কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, যুধিষ্ঠিরাদির পঞ্চপুত্র—সব সরাইলেন। শেষ সাত্যকি প্রভৃতি যদুবংশকে, শেষ নিজেকেও। কাহাকেও ছাড়েন নাই। তিনি নানা উপায়ে নানা দেশের নানা লোক বিনাশ করিয়া আপনাকেও ভার মনে করিয়াছিলেন,—তাই ব্যাধ-হস্তে নিজেও মরিলেন। বাঁচাইলেন কাদের—যাদের ভূভার বলিয়া মনে করেন নাই। যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভাই আর উত্তরার গর্ভস্থিত পরীক্ষিৎ। পঞ্চপাণ্ডব কি পাপিষ্ঠ নয় ? না, কোন মতেই নয়। কারণ, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানিতেন ; তাই তাঁহার হস্তে আপনাদের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে পাপ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, আদেশে এবং ধমকে। সুতরাং তাঁহারা ভূভার হইতে পারেন না। যাঁহারা ভগবানের কথাতেও অধর্ম্ম করিতে সঙ্কোচ করে, তাহাদের ভূভার বলিবে কেমন করিয়া ?

ভূভার হরণ করিয়া ফল কি হইবে ? যুধিষ্ঠিরের মত ধার্ম্মিক রাজার অধীন সব একচ্ছত্র হইয়া যাইবে। পৃথিবীর সুখসমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিবে। এই কথাই ত অপরেশবাবু শ্রীকৃষ্ণের মুখে বলাইয়াছেন। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তবে একচ্ছত্র রাজত্বগুলা ভাঙ্গে কেন ? রোম ভাঙ্গিল কেন ? মকিদন ভাঙ্গিল কেন ? তিন চারিবার পারস্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল কেন ? জেঙ্গিস খাঁর রাজত্ব ভাঙ্গিল কেন ? তৈমুরের রাজত্ব ভাঙ্গিল কেন ? মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল কেন ? সেগুলাও সময়ে সময়ে ভূমির ভার হইয়া উঠে ! তাই ভাঙ্গে। অথবা ভগবান্ ভাঙ্গিয়া দেন। যাক্, তা লইয়া অপরেশবাবুর সঙ্গে বা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিব না। তাঁহার যেমন ভাল বোধ হইয়াছে, তিনি তেমনি লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত ভারতে একচ্ছত্র সম্রাট্ করিয়া দিয়া আপনিও ভূভার-মধ্যে গণ্য হইয়া ব্যাধ-হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ নাটকও ফুরাইল।

আজ বিংশ শতক,—দ্রুতযানের অভাব নাই। রেল হইয়াছে, ষ্টীমার হইয়াছে, উড়ো কল হইয়াছে, হাওয়া গাড়ী হইয়াছে, ক্রমে দ্রুতগতি আরও বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নাটকের মত দ্রুতগতি কোথাও দেখি নাই। যেন স্পেশাল মেল ট্রেণ, রোড-সাইড ষ্টেশন লক্ষ্যই করে না, সব মেল ষ্টেশনেও দাঁড়ায় না, একেবারে পাঁচ সাতটা মেল ষ্টেশন বাদে দাঁড়ায়। ভীষণ গতি। প্রায় একশত বৎসরের বিপুল কাণ্ড আড়াই শত পৃষ্ঠায়। গ্রীকেরা হইলে অপরেশবাবুকে মারিয়াই ফেলিত ; তাহারা এক নাটকের একই স্থান ও একই কাল চায়। আর এ নাটকে—এই মথুরায়, এই মগধে, এই হস্তিনায়, এই ইন্দ্রপ্রস্থে, আর এই দ্বারকায়। আর সময়ের ত ঠিকই নাই। শিশুপাল বধ আর কুরুক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৪ বৎসর তফাৎ, কুরুক্ষেত্র আর যদুবংশ ধ্বংসের অন্ততঃ ৫০ বৎসর। গ্রীকেরা যাই করুক, আমাদের ঋষিরা কি করিতেন জানি না, কারণ তাঁহারা অঙ্কগুলায় অন্ততঃ স্থান ও কালের ঐক্য রাখিতেন। এক নাটকে এক অঙ্কের কত স্থান ও কাল-বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখন হইয়াছে দৃশ্য। সে দৃশ্যগুলাও প্রায় এক একটা অঙ্কের মত। অপরেশবাবু এই শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত ভারতবর্ষটা দেখাইয়াছেন এবং তাহার এক শত বৎসরের ঘটনা দেখাইয়াছেন। অলঙ্কারশাস্ত্রওয়ালারা একে নাটক বলিতেন কি না সন্দেহ। না বলুন, আমরাও না হয় না বলিলাম,—বলিলাম, শ্রীকৃষ্ণ বইখানা নাটক নয়। তাহাতে আসে যায় কি ? সংস্কৃতে অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের দশ পনর রকম লক্ষণ করিয়া শেষ বলিলেন চমৎকৃতিমৎ কাব্যম্। যাহা পড়িয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া যায়, সেই কাব্য। আমরা না হয় বলিলাম চমৎকৃতিমৎ নাটকম্। যাহা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া যায়, তাহাই নাটক। শ্রীকৃষ্ণ নাটক চমৎকৃতিমৎ যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা ইহাকে নাটক বলিবেন ; আর যাঁহারা বলিবেন না, তাঁহারা ইহাকে নাটকও বলিবেন না। কিন্তু কে সাহস করিয়া বলিবে শ্রীকৃষ্ণ নাটক চমৎকৃতিমৎ নয় ?

অপরেশবাবু মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও হরিবংশ খুঁটিয়া যাহা কিছু পাইয়াছেন, সব সংগ্রহ করিয়া এই নাটকের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং চমৎকৃতিমত্ত্বের অভাব ইহাতে কিছুমাত্র নাই। কিন্তু সেই ভাল জিনিষগুলি বাছিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে। কারণ, ঐ তিনখানি পুস্তক তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইয়াছে। তার মানে দুই লক্ষ শ্লোক প্রায়। তাহার উপর আবার অপরেশবাবুর স্বখাত সলিল আছে। তিনি "কর্ণার্জ্জুনে" এই সকল পুস্তকের অনেক ভাল জিনিষ বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা ত আর তিনি 'রিপীট' করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে বেশ হুঁসিয়ার হইয়া বাছিতে হইয়াছে। সুতরাং এই নাটকে তাঁহার বাহাদুরী বাছা আর সাজানো। তিনি নিজে একজন ভাল অভিনয়কর্ত্তা ও একজন ভাল নাটককার ; সুতরাং কেমন করিয়া সাজাইতে হয় তাহাতে তিনি সিদ্ধ। তাঁহার নাটকে বীজমন্ত্র ভূভারহরণ। বীজের সঞ্চার নাটকে গোড়াতেই করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থকার দাঁড়াইয়া তাহা বলিয়া দিতে পারেন না, কারণ তাহাতে "বেমজা" হইয়া যায় ; সুতরাং পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া বাহির করিতে হয়। এখানেও তাহাই হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের নানা কারণে ভূভার-হরণে যতই বাধা হইয়াছে, ততবারই বেশী জোরে ভূভার-হরণের কার্য্য হইয়াছে। তিনি বাঁচাইয়াছেন পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইকে আর নিজেকে, কিন্তু সেও শেষ পারিলেন না, ব্যাধের হাতে মরিলেন।

এই নাটকে কৃষ্ণের চরিত্র অতি অদ্ভুত। তিনি যেন কেহই নহেন, সকল কাজেই তিনি যেন উদাসীন, তিনি স্থির, তিনি ধীর, তিনি সাক্ষী মাত্র। সমস্ত কল চালাইতেছেন তিনি, অথচ তাঁহার আগ্রহ নাই, চিন্তা নাই, রাগ নাই, রোষ নাই ; গম্ভীরভাবে স্থিরভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখিতেছেন, আর যেখানে বাধাবিঘ্ন হইবে, সেখানটা একটু সোজা করিয়া দিতেছেন। যখন দেখিলেন, সাত দিন যুদ্ধের পর দুর্য্যোধনের তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া ভীষ্ম পাঁচটী বাণ দেখাইলেন পঞ্চপাণ্ডবের বধের জন্য, তখন তিনি অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনের কাছে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মুকুটটী সংগ্রহ করিলেন ; এবং সেই মুকুট পরাইয়া অর্জ্জুনকে বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট পাঠাইলেন ; অর্থাৎ অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধন সাজাইয়া সেই বাণ পাঁচটী হরণ করিলেন। মহাভারতে দেখি ; যখন কৃষ্ণ দেখিলেন, কর্ণের একাঘ্নীবাণে একজন না একজন পাণ্ডবের প্রাণনাশ সম্ভাবনা, তখন ঘটোৎকচকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। শেষ এমন দাঁড়াইল যে সে একাঘ্নীবাণ না খরচ করিলে সেইদিনই কুরু-সৈন্য ধ্বংস হয়। কর্ণ সে অমোঘ বাণ ঘটোৎকচে খরচ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন বাঁচিয়া গেলেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন ত কথায় কথায় বলেন আর যুদ্ধ করিব না, আর জ্ঞাতি বধ দেখিতে পারিব না, আর ক্ষত্রিয়-সংহার দেখিতে পারি না বলিয়া হতাশ হইয়া বসেন, তখন কৃষ্ণ শান্ত গম্ভীরভাবে তাঁহাদিগকে বুঝান কে কাকে মারে এবং সব মরিয়া আছে। নিজের কর্ম্মদোষে মরিয়া আছে। তোমরা কেবল নিমিত্ত। আমি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, আমিই উহাদিগকে মারিয়া রাখিয়াছি। এইরূপে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। এ নাটকেও বিশ্বরূপ দর্শনের চেষ্টা হইয়াছে। এবং সে চেষ্টা অনেকটা সফলও হইয়াছে। কিন্তু চিত্রে বা প্রতিমায় কেমন করিয়া বিশ্বরূপ দেখাইতে হয়, বাঙ্গলা দেশে তাহার কোন নিদর্শন নাই। সে যায়গাটী যেমন জমা উচিত তেমনটা জমে নাই। মহাভারতে ভগবদ্গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের পর ও জিনিষটা এতই চমৎকার হইয়াছিল যে, সকল পুরাণে ও অনেক তন্ত্রে উহার অনুকরণ হইয়াছিল এবং চিত্রে ও পাথরে সেইটা আঁকার চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার কয়েকখানি চিত্র নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে আছে ; আর প্রতিমাটী পশুপতি ও গুহ্য-কালীর মধ্যে মৃগস্থলীতে জঙ্গ বাহাদুরের বিশ্বরূপ মন্দিরে আছে। এই সকলের একটা আবছায়া দেখাইলে যাহা হইত, শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতায় তাহার শতাংশের একাংশও ফুটিয়া উঠে নাই।

যেখানে সকলের চেয়ে বেশী কঠিন কাজ, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হস্তিনা দখল হইয়া গেল। পাণ্ডবদের ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে প্রণাম করিতে যাইতে হইবে। বড় শক্ত, বিশেষ পাণ্ডবদের পক্ষে,—চল সখা, তুমি সঙ্গে চল। কৃষ্ণ গেলেন। গান্ধারী আর্য্য নারী, তিনি সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিয়া ভগবানের লীলা বলিয়া ঠাণ্ডা হইয়া আছেন। তিনি উহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন, সৎপরামর্শ দিলেন, কাজ চুকিল। তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র, বৃদ্ধ অন্ধ, শত পুত্রশোকে ক্ষিপ্ত-প্রায়। কৃষ্ণ সকলকে লইয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর ভীম। কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিলেন, যাইও না।

তাহার বদলে একটা লোহার ভীম দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনে সেটা চূর্গ-করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ ভীমকে বলিলেন দেখ্‌লে দাদা, তোমার কি ওখানে যেতে আছে?

এ নাটকে কৃষ্ণকে কেবল দুইবার নিজমূর্ত্তি ধরিতে অর্থাৎ নিজ হাতে কাজ করিতে হইয়াছে। একবার যখন শিশুপাল ক্ষেপিয়া রাজসূয় যজ্ঞটা পণ্ড করার অবস্থা হইয়া দাঁড়াইতেছে, তখন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের পা ধোয়ার গাড়ু ফেলিয়া সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন। শিশুপালের মাথাটা কাটা গেল। সে সময় যদি যুদ্ধ হয়, দু' দলেই লড়াই করিতে কোমর বাঁধিবে, যজ্ঞ করিবে কে? সুতরাং ভগবান্‌কে নিজ বিভূতি প্রকাশ করিতে হইল। আর একবার যখন অষ্টম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরে অর্জ্জুন রথের উপর অজ্ঞান, পাণ্ডবের আর উপায় নাই, তখন কৃষ্ণ নিজ বিভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুদর্শনকে স্মরণ করিয়াছিলেন। তখন ভীষ্ম বলিয়াছিলেন, কেমন ঠাকুর, বড় যে বলেছিলে লড়াই করবে না, কেমন, এখন ত করতে হ'ল? এখন আমায় উদ্ধার কর' বলিয়া ধনুক ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ভীষ্মকে উদ্ধার করিলেন না। অবহার হইল।

ভীষ্মের শেষ দিনের যুদ্ধ অপরেশবাবু বর্ণনা করেন নাই। তাঁহাকে অনেকটা লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে সে যুদ্ধটা বড় জাঁকাল। শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া পিছন হইতে অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতেছেন। শিখণ্ডী আগে স্ত্রী ছিল এখন পুরুষ হইয়াছে, সুতরাং স্ত্রীলোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, আর অর্জ্জুন শিখণ্ডীর পিছন হইতে তীর মারিতেছেন, আর ভীষ্ম প্রতি শরাঘাতেই বলিতেছেন "নৈতে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।" তার পর ভীষ্মের শরশয্যা। ভীষ্মের মাথায় শরের বালিশ, সে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহ তৈয়ার করিয়া দিতে পারিল না। তাহার পর ভীষ্মের তৃষ্ণা, আর অর্জ্জুনের বাণে 'টিউব ওয়েলের' সৃষ্টি। এ সব বাধ্য হইয়া নাটককারকে ছাড়িতে হইয়াছে।

কৃষ্ণের আশ্চর্য্য স্বভাব; তিনি সুখে, দুঃখে, রণে, বনে, সভায়, মন্ত্রণায়, স্তুতি, নিন্দায়, বিপদে, সম্পদে, স্বদেশে, বিদেশে, সব অবস্থাতেই সমান; কোনরূপ চঞ্চলতা নাই, কোনও উত্তেজনা নাই, উন্মাদনা নাই। অথচ তিনি সমস্ত জগৎকে উত্তেজিত ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন। কৃষ্ণের এই-ই স্বভাব মহাভারতে, কৃষ্ণের এই স্বভাব শ্রীকৃষ্ণে।

অপরেশ বাবুর অপরূপ সৃষ্টি তাঁহার প্রাপ্তি আর অস্তি। দুটীই কংসের স্ত্রী, দুটীই জরাসন্ধের কন্যা; কিন্তু দুটির দুরকম স্বভাব—একেবারে স্বর্গ ও নরক। ভূভার-হরণের প্রথম আয়োজনেই কবি দেখাইলেন—ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। এক ব্যাখ্যা জগতের উপকার আর সত্যই ভূভার-হরণ—ইনিই অস্তি। আর এক ব্যাখ্যা, ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি; কংসের মৃত্যুতে কংসের পতিব্রতা পত্নীর ক্ষতি—ইনিই প্রাপ্তি। সমস্ত বইখানা জুড়েই ইঁহারা দুজন আছেন। একজন আপনাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া জগতের মঙ্গলকার্য্য দেখিতেছেন; আর একজন জগতের মঙ্গলকে মধ্যস্থানে বসাইয়া সমস্ত কার্য্য দেখিতেছেন। একজন নিজেকে জগতের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন, আর একজন নিজের ওজনেই জগতের ওজন বুঝিতেছেন। দুজনেরই দল আছে। একজন দুর্য্যোধনকে নাচাইতেছেন 'কৃষ্ণকে আগে বধ কর, ঐ যত নষ্টের গোড়া'—আর একজন দ্রৌপদীর মুখ দিয়া বলাইতেছেন, 'গুরুপুত্র, তুমি আমার পাঁচটি ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় মেরেছ, আমার [illegible]কে মেরেছ, তোমায় ক্ষমা করিলাম; আমি যেমন পুড়িতেছি, তুমি মরিলে তোমার মা ও তেমনি পুড়িবেন, তাঁহার জ্বালা নিবারণের জন্য তোমায় ক্ষমা করিলাম। তবে তোমার মাথার মণিটি দিয়া যাও।' শ্রীকৃষ্ণ ছুরি দিয়া সে মণি মাথা হইতে তুলিয়া লইলেন। অশ্বত্থামার সে ঘা কিন্তু তিনি অমর বলিয়া কল্পান্তস্থায়ী হইল। আর আমরা হিন্দুমাত্রেই তেল মাখার সময় ক'ড়ে আঙুলে তেল লইয়া প্রথমেই 'অশ্বত্থাম্নে নমঃ' বলিয় অশ্বত্থামার মাথার ঘায়ে ছিটাইয়া দিয়া তবে তেল মাখিতে বসি, না দিলে অশ্বত্থামা মাথার ঘায়ে পাগল হইয়া পড়েন। অস্তি ও প্রাপ্তির প্রভেদটুকু নাটকে বেশ ফুটিয়াছে, এটুকু নাটককারের খুব বেশী কৃতিত্ব।

সমস্ত মহাভারতখানা ২৫০ পাতায় পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনা যদি সংক্ষেপে আড়াই পাতায় করি, বিশেষ দোষ কেহ দিতে পারিবেন না।*

* শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১॥৹ টাকা।

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

২

বাণিজ্যপ্রধান দেশে পরিণত হবার আগে জার্ম্মাণী ছিল একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষিপ্রধান দেশ। তখন জার্ম্মাণীতে যে শস্য উৎপন্ন হ'তো⋯সমগ্র জার্ম্মাণীর প্রয়োজন পূর্ণ ক'রেও প্রতিবেশীদের জন্য তাদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকতো। এখনও

বাভেরীয়ার গ্রাম্য নারী। (মূলা কাটছেন ছুরির সাহায্যে সুন্দর করে!)

জার্ম্মাণীর ধনাগমের একটা প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে তার কৃষি বিভাগ; তবে সেকালের মতন এখন আর কৃষিকার্য্যই জার্ম্মাণীর প্রধান উপজীবিকা নয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর প্রায় সাড়ে তিন কোটী 'একর' জমী চাষের জন্য ব্যবহৃত হ'তো! প্রায় সর্ব্ব প্রকার শস্যই জার্ম্মাণী তার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক'রতো! কিন্তু বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর ভূসম্পত্তি হ্রাস হওয়াতে কৃষি-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শস্যোৎপাদনও কমে গেছে। এখন জার্ম্মাণীকে নিজের প্রয়োজনের জন্য বাইরে থেকে শস্য আহরণ ক'রে আন্‌তে হচ্ছে।

চাষকর জমী ছাড়া জার্ম্মাণীর আর একটা প্রধান আয়ের পন্থা হ'চ্ছে তার ফলকর ভূমি। জার্ম্মাণীর দ্রাক্ষাক্ষেত্র তার একটা মস্ত সম্পদ। তা ছাড়া আপেল্‌, কুল, বাদাম, পীচ, চেরী প্রভৃতি অসংখ্য ফলের গাছ জার্ম্মাণীকে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য করে। জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র এমন কি বড় বড় রাস্তার ধারে ও অলিতে গলিতে পর্য্যন্ত এই সব ফলের গাছের ছড়াছড়ি। প্রত্যেক দিকের স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি এই সব ফলের গাছের মালিক। প্রতি-বৎসর এই সব ফলের গাছ, যে সবচেয়ে বেশী দর দিতে পারে তাকেই এক বছরের জন্য, বিলি করে দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণীর অধিকাংশ লোক এখনও কৃষি ব্যবসায়ী। কারণ কৃষিকার্য্য এখনও সেখানে বেশ একটা লাভজনক ব্যবসাই হয়ে আছে। কেবলমাত্র মেকৃলেনবার্গ ও পূর্ব্ব প্রাশীয়াই চাষের কাজে তেমন অগ্রসর হ'তে পারেনি বলে কৃষি-সম্পদে তারা আজও দীন হয়ে আছে। ফলে এতদুভয় অঞ্চলে শোচনীয় দারিদ্র্য ও তদনুষঙ্গিক নীতি-দৌর্ব্বল্যও অত্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়।

জার্ম্মাণীর অরণ্যসম্পদ এদেশের একটা বিশেষত্ব। বনভূমিকে এরা যেমন করে ঐশ্বর্য্যের আকর ক'রে তুলেছে এমনটি আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত অরণ্য-ভূভাগ এরা সযত্নে রক্ষা করে। কোন্ বনে কি কি গাছ কতগুলি ক'রে আছে জার্ম্মাণী তার হিসাব একেবারে নখদর্পণে রেখে দেয়। কোন্ জঙ্গল থেকে বার্ষিক কত আয় হওয়া সম্ভব, তারও তালিকা জার্ম্মাণীর অরণ্য-বিভাগের খাতায় নথিবদ্ধ করা আছে। অরণ্যের তত্ত্বাবধান করা জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'ন, তাঁরা আরণ্যবিদ্যায় বিশেষ ভাবে পারদর্শী হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তবে এই বিভাগে নিয়োজিত হন। আরণ্য-বিদ্যার উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য জার্ম্মাণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য বিশেষ বিভাগ আছে।

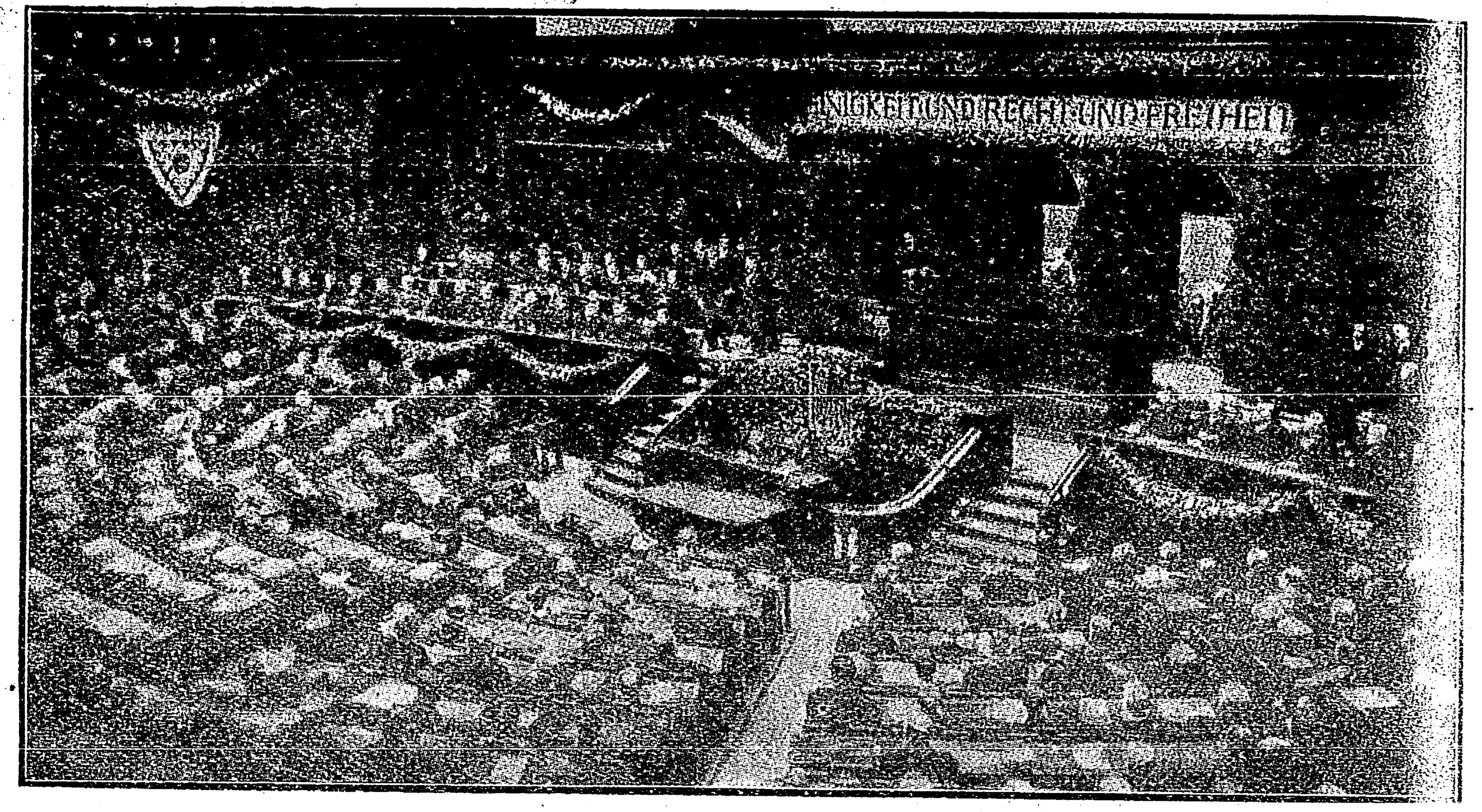

রাইষ্টাগ্ (Reichstag) (জার্ম্মাণ রাষ্ট্রসভার দৃশ্য)

জার্ম্মাণীর নদী ও ঝর্ণাগুলি সবই প্রায় বৈজ্ঞানিকরা 'যন্ত্ররাজ বিভূতির' মতো বেঁধে ফেলেছেন। এক সুইট্জার্ল্যাণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশই তরঙ্গবেগকে এমন করে কাজে লাগাতে পারেনি। সেখানে জলের স্রোতের বেগে অনেক কলকারখানা চ'লছে। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্যই বিশেষ করে তারা অসংখ্য প্রবাহের গতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। জার্ম্মাণীর যে কোনও

শবযাত্রা (এঁরাও সকলে 'স্কেট' করে বরফের উপর দিয়ে শব নিয়ে চলেছেন।)

একটা গণ্ডগ্রামেও পথে পথে এবং পর্ণকুটীরেও "বিজলী বাতী" জ্ব'ল্ছে দেখ্তে পাওয়া যায়!

কুটীর-শিল্প অবলম্বনেও জার্ম্মাণীর অসংখ্য নরনারী তাদের জীবিকার সংস্থান ক'রছে। কৃষি ও কুটীর-শিল্প ছাড়া জার্ম্মাণরা কলকারখানার কাজে ও ব্যবসায় বাণিজ্যেও বিশেষ মনোযোগী হ'য়ে উঠেছে। বরং চাষের কাজের চেয়ে এই সব দিকেই সে দেশের লোকের ঝোঁক ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখা যায়। প্রাশীয়ার রাইন্ল্যাণ্ড ও ওয়েষ্ট্ফেলিয়া প্রদেশ এবং স্যাক্সনী কলকারখানার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লৌহ ও ইস্পাতের বড় বড় কলকারখানা সমস্তই এই ওয়েষ্ট্ফেলিয়া ও উত্তর সাইলেশীয়ায় অবস্থিত। উত্তর সমুদ্র ও বল্টিক্ সাগর-কূলে সুবৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণের একাধিক কারখানা আছে।

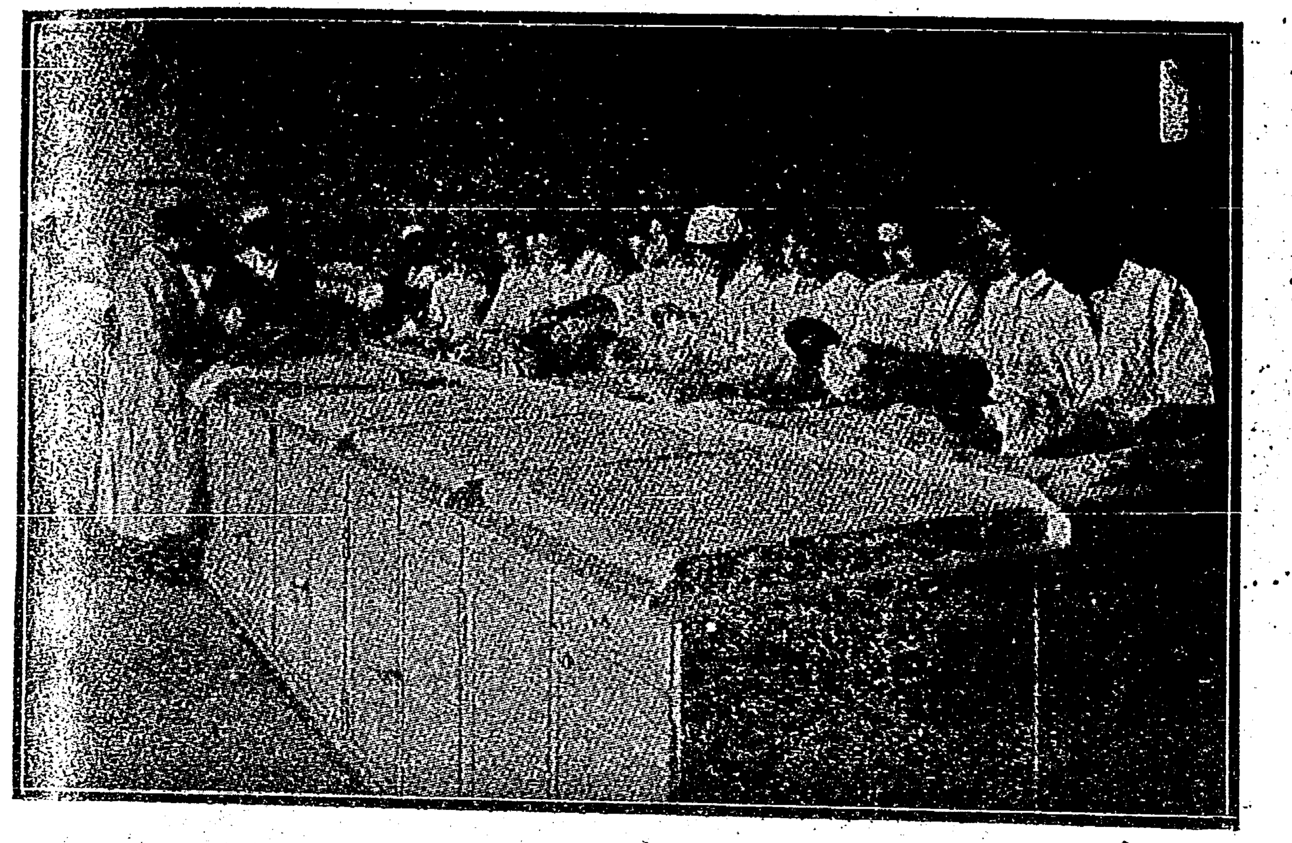

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থিনী ছাত্রীরা শিশুদের ওজন পরীক্ষা করছে।

রাসায়নিক ও রঞ্জন (রং) বিদ্যার বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আজ সেখানে এই দুই বিভাগেরই আশ্চর্য্য রকম উন্নতি হয়েছে।

তূলা ও পশমের কারবারে প্রাশীয়াই জার্ম্মাণীর অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রণী। সাদা কাপড়ের থান, ছিটের কাপড়, মোজা, গেঞ্জী, লেস্ এবং রেশমের কারবারেও জার্ম্মাণীর যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি। কাচ, চীনেমাটীর দ্রব্যাদি, ছোট বড় ঘড়ী, কাগজের মালমশলা ও অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা আর

স্কুলের মেয়েরা। (উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিত হ'য়ে চলেছে।)

খেলনা-পুতুল প্রভৃতি ছোট খাটো সৌখীন দ্রব্যাদি প্রস্তুতেও জার্ম্মাণী একেবারে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে।

কোনও দেশের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব এবং তাদের

একটু সাম্‌লে উঠ্‌তে না উঠতেই নেপোলীয়ানের সঙ্গে জার্ম্মাণীর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল। এর ফলে জার্ম্মাণীতে একটা জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়ে গেছল! জার্ম্মাণীর খণ্ড খণ্ড

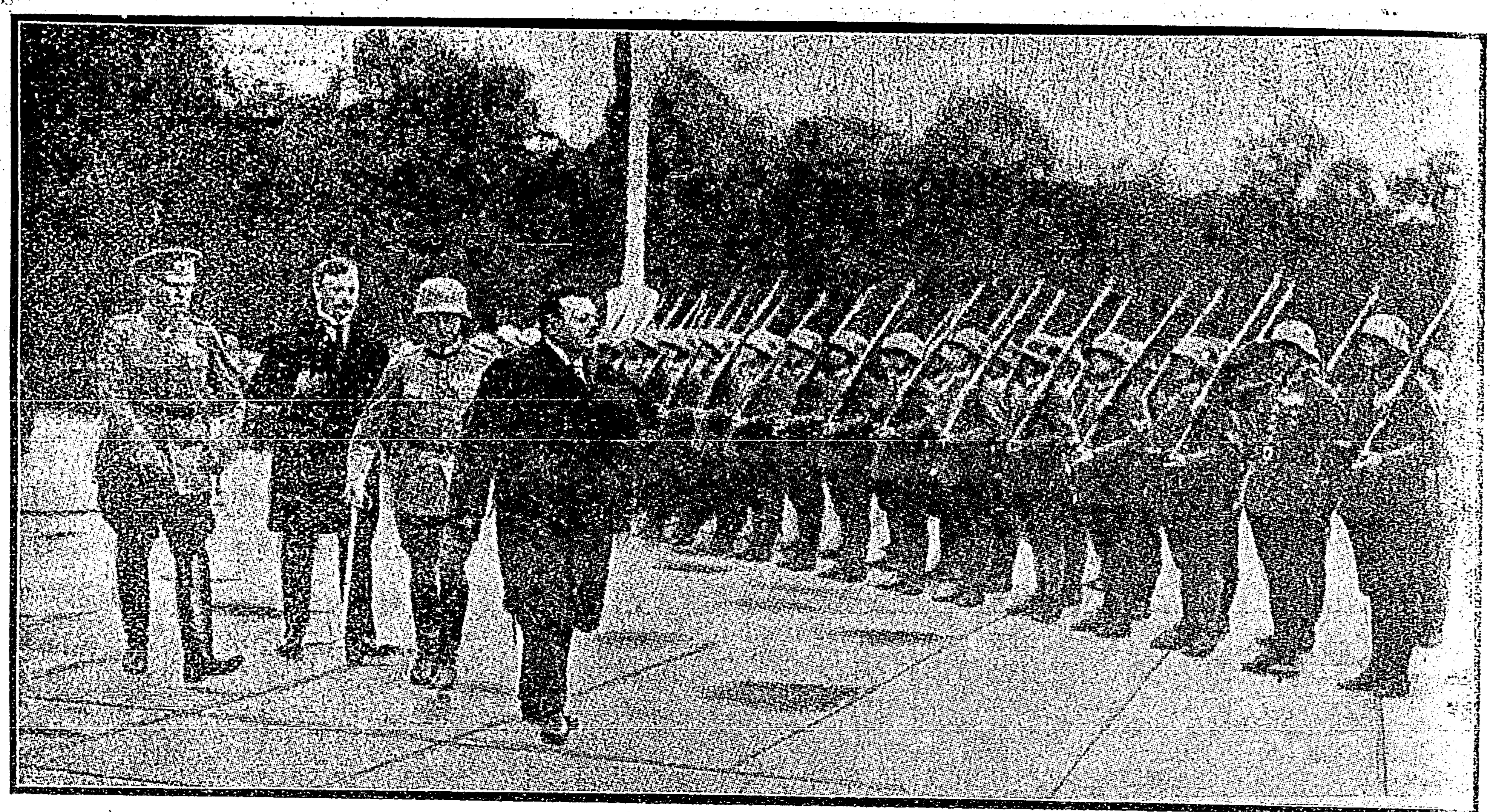

সৈন্য পরিদর্শন (গণতন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হার্ ফ্রেডরাক্ এবার্ট জার্ম্মাণ বাহিনী পরিদর্শন করছেন।)

সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা যে সেই জাতির প্রাচীন ইতিহাসের ধারা অনুসারে গ'ড়ে ওঠে, এ কথাটা অনেকখানি সত্য হ'লেও, জার্ম্মাণীর বেলা কিন্তু এর একটু বিশেষত্ব দেখা যায়!—এ দুটোর সঙ্গে তাদের যেন একটু ভিন্নরূপ সম্বন্ধ! জার্ম্মাণদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কয়েকটি বিশেষ গুণই তাদের এই ব্যবসায়ের পথে আজ এতটা অগ্রসর করে দিয়েছে। ব্যবসায়-বুদ্ধি ও কাজের যোগ্যতা যেন এদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি!

১৮৭১ সালে জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় একতা লাভের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ জাতকে দীর্ঘকাল ধ'রে একটা কঠোর অনুশাসনের ভিতর দিয়ে যেতে হ'য়েছিল। কয়েক শতাব্দী ধ'রে জার্ম্মাণীর ইতিহাস ছিল শুধু তার আভ্যন্তরীন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহের এবং বিদেশীর আক্রমণ ও উৎপীড়নের। বারম্বার জার্ম্মাণী বিধ্বস্ত হ'য়েছে, তার জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছে—১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ সাল পর্য্যন্ত তিরিশ বৎসর-ব্যাপী যে বিপুল যুদ্ধ চলেছিল তাতে জার্ম্মাণী একেবারে জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হ'য়েছিল। এই সর্ব্বনাশ থেকে

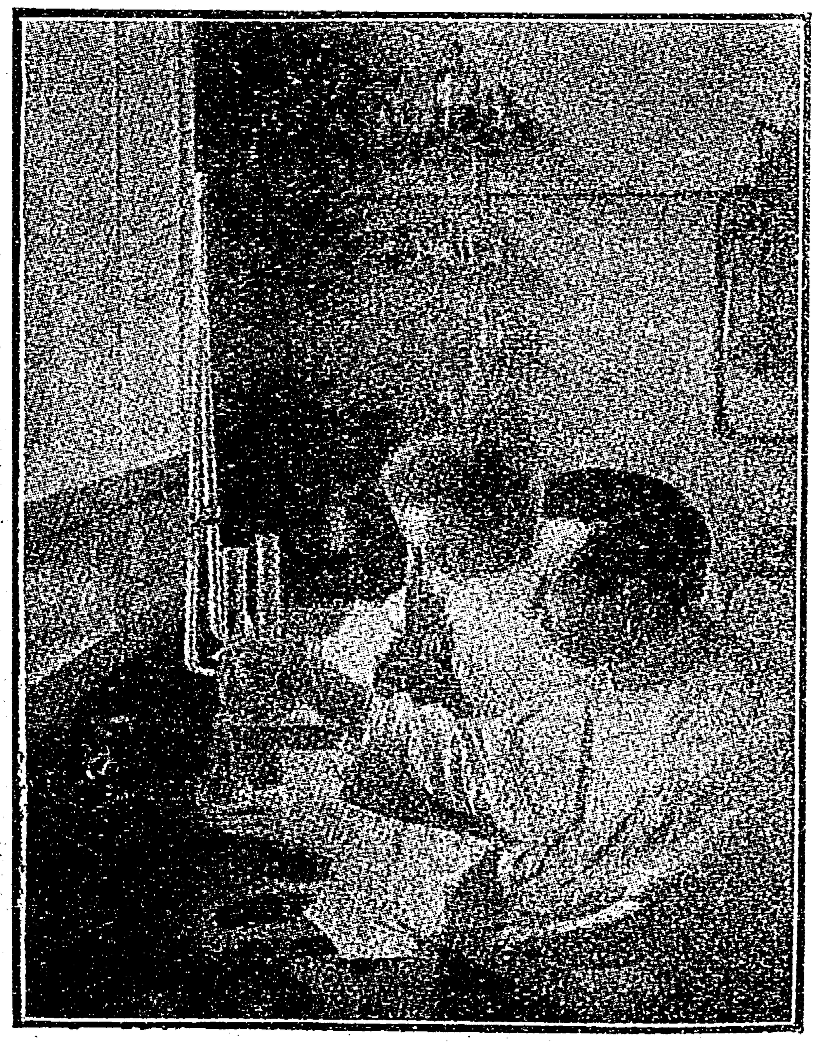

জার্ম্মাণীর ডাক্তারখানা

রাজ্য ও বিভিন্ন জাতি একত্র হ'য়ে যখন একটা বড় জাতি ও অখণ্ড দেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন

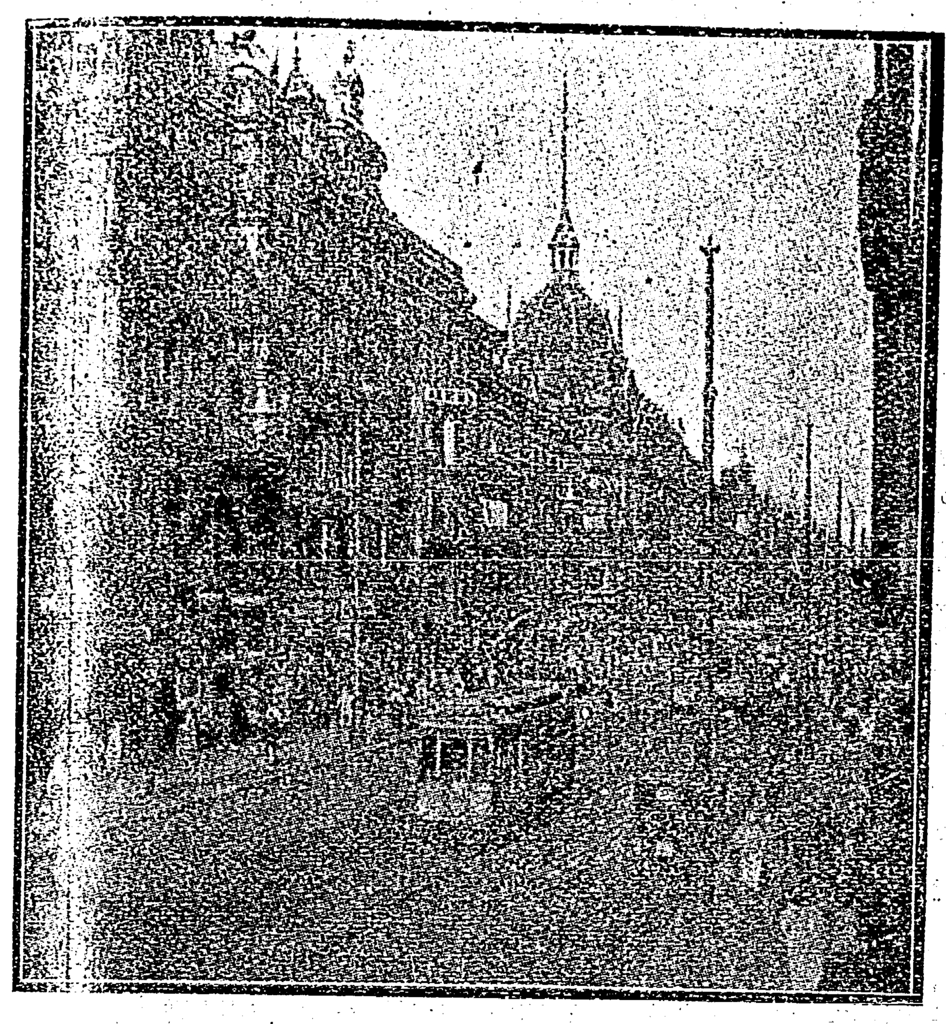

বার্লিনের লাইপ্‌জিগার্ ষ্ট্রাসে (ষ্ট্রীট্)

অন্যান্য কতকগুলি দেশের চোখ টাটাল'। জার্ম্মাণীর খণ্ডছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকাটাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূল। তারা তাই জার্ম্মাণীর এই একতা লাভ ও সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টাকে প্রাণপণে বাধা দিতে উদ্যত হ'ল। ফলে হোয়েন্‌জোলার্ণসদের অধীনে এক মহা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে জার্ম্মাণীকে আরও তিনটি যুদ্ধে নামতে হ'য়েছিল। এরূপ অবস্থায় কোনও জাত যখন বিপদকে কাটিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন দেখা যায়—হয় সে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, নয় সে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে! সৌভাগ্য-বশতঃ জার্ম্মাণী এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বেরিয়ে এসেছিল অধিকতর ক্ষমতাবান্ হ'য়ে! কিন্তু এই যে বেঁচে থাকবার জন্য, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য তাকে ক্রমাগত যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল এরই ফলে জার্ম্মাণী একটা বীর যোদ্ধার জাতে পরিণত হ'য়েছিল। রণশাস্ত্রে এরা তাই জনে জনে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও ঠিক এদের উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল না বলে এই নবীন জার্ম্মাণ জাতকে সেদিন প্রকৃতির সঙ্গেও অবিরাম যুদ্ধ ক'রতে হয়েছিল। কৃষি ছিল তখন এদের প্রধান সম্পদ—অথচ দেশের জলহাওয়া ছিল সে সম্পদের প্রধান বাধা! ক্ষণিকের নিদাঘ এবং সুদীর্ঘ ও সুকঠোর শীতের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে এদের কৃষিকার্য্য ক'রতে হতো। এদের দেশের খনিজ-সম্পদও যৎসামান্য! জার্ম্মাণীর

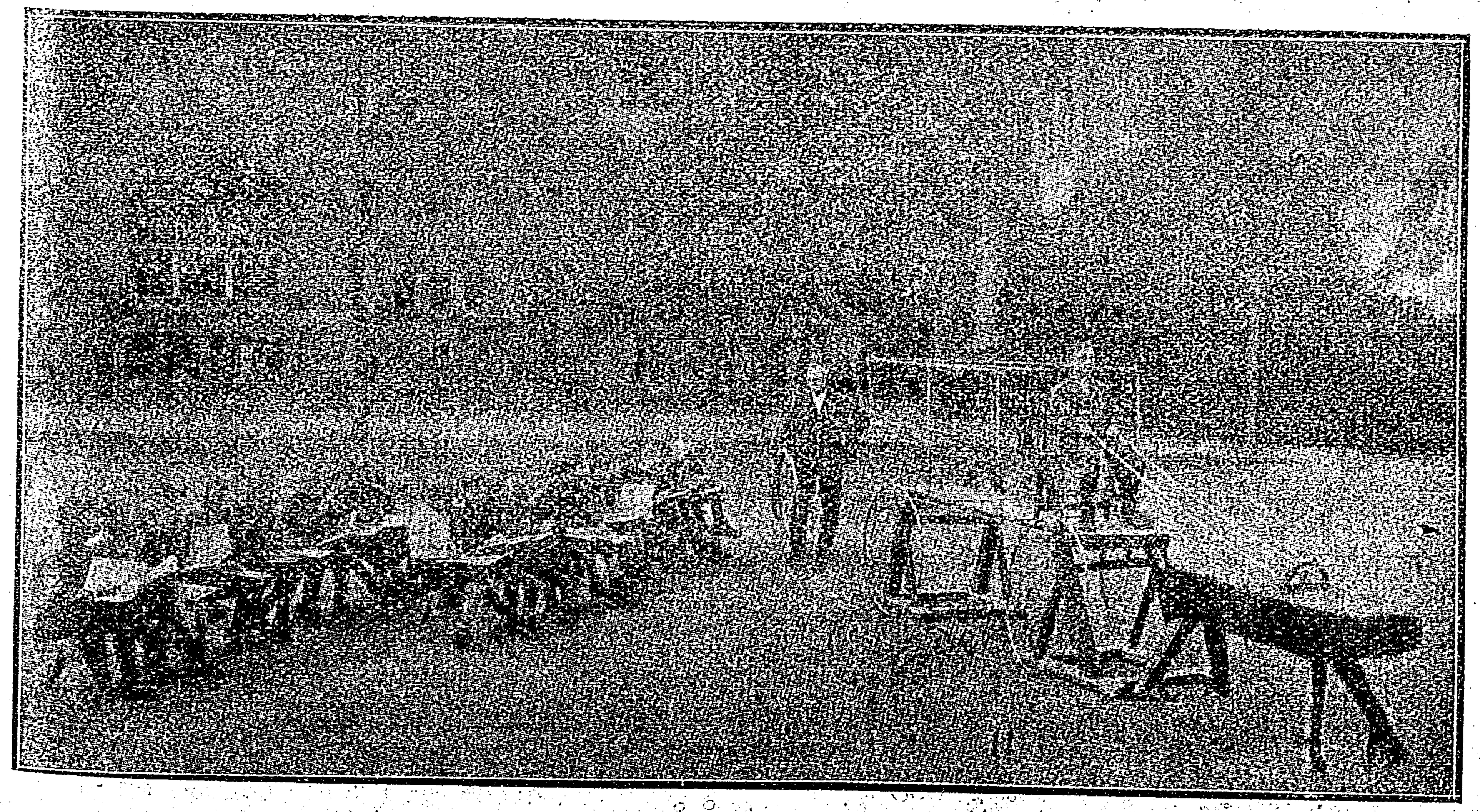

চিত্রাঙ্কন। (বস্তু দেখে তার চিত্র আঁকতে শেখানো হ'চ্ছে।—এখানে আঁকবার বিষয়টি হ'চ্ছে গাড়ী ঘোড়া।)

উত্তরে ও উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে বিস্তৃত বালুকাময় ভূখণ্ড পড়ে আছে। অতি কষ্টে ও বহু পরিশ্রমে হয়ত এই বালিয়াড়ী থেকেই, মানুষ ও ঘোড়ার উপযুক্ত খাদ্য উৎপন্ন করা যেতে

প্রাশীয়ার পার্ব্বণ দিনে। (ছেলেরা বাড়ী বাড়ী সিধে সেধে বেড়াচ্ছে।)

পারে। এ ছাড়া জার্ম্মাণীর মধ্য প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব হতে উত্তর-পশ্চিম পর্য্যন্ত যে পর্ব্বত-শৃঙ্খল বিস্তৃত রয়েছে, এ অংশেও চাষের বিশেষ অসুবিধা। শস্য উৎপাদন এ অঞ্চলে একেবারে দুঃসাধ্য না হ'লেও একান্ত কষ্টসাধ্য।

জার্ম্মাণীর যে লৌহ কারখানা আজ জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব'লে খ্যাত হ'য়েছে, তার অস্তিত্ব রক্ষা এবং অন্যান্য কলকারখানা চালানোও জার্ম্মাণীর পক্ষে একদিন কঠিন হ'য়ে উঠেছিল—তাদের দেশে কাঁচা মাল মশলার অভাবে! নিয়ত অভাব ও অসুবিধার বাধা সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্ট লাভের জন্য জার্ম্মাণীর জিদ আরও বেড়ে উঠেছিল এবং সেই জন্যেই সে নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও বুদ্ধিবলে তার সকল প্রতিবন্ধক চূর্ণ করে এগিয়ে আসতে পেরেছে! এই শিল্প বিজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ জার্ম্মাণীকে আশাতীত উন্নতির শিখরে তুলে দিয়েছে। যথাকালে এদিকে সচেষ্ট না হ'লে জার্ম্মাণীকে আজ য়ুরোপের এক দীন দরিদ্র নগণ্য তুচ্ছ দেশ হ'য়ে পড়ে থাকতে হ'তো।

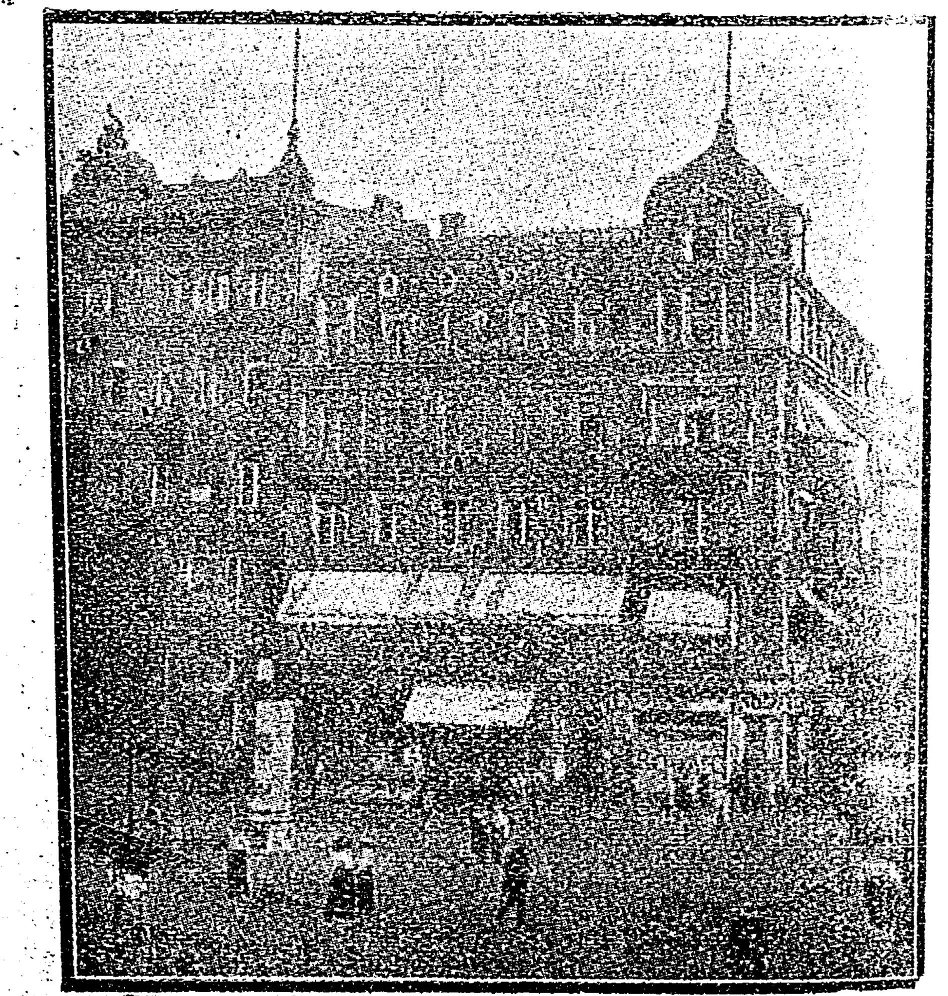

বার্লিন সহরের দৃশ্য (উণ্টার ডেন্ লিণ্ডেন্ নামক বিস্তৃত রাজপথ)

জার্ম্মাণদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি এই জাতকে আদর্শ গৃহস্থও ক'রে তুলেছে। প্রথমতঃ এদের প্রত্যেকেরই

ঘরের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে যেটা এরা কিছুতেই লঙ্ঘন করে না। এদের মিতব্যয়িতা, আয়ের অনুপাতে হিসাব করে খরচা করা, এদের কথার ও কাজের কোনও দিন অনৈক্য না হওয়া, সর্ব্বদা বংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং সম্মান বজায় রেখে চল্‌বার চেষ্টা—এই সকল সদ্‌গুণের জন্যই এরা জাতি হিসাবে এত শীঘ্র বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পেরেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর পারিবারিক শৃঙ্খলা কিছু পরিমাণে

স্কুলের ছাত্রগণ। (ক্লাশে বসে ছেলেরা ছবি আঁকা শিখছে।)

ছুটীর ঘণ্টায়। (টিফিনের সময় ছেলেরা মাঠে বসেই জলযোগ করছে।)

ঢিলে হয়ে পড়লেও এখনও গৃহস্বামীর কর্ত্তৃত্বের অধিকার একেবারে লুপ্ত হয়নি। মোটের উপর য়ুরোপে আর অন্য কোনও দেশ নেই যেখানে গৃহস্থের জীবন এতটা সুস্থশান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত দেখতে পাওয়া যায়। একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে জার্ম্মাণীতে ধনী মধ্যবিত্তের কথা ছেড়েই দাও, মজুরদের মধ্যেও শিশু-রক্ষণের জন্য শিশুমঙ্গল ও শিশুকল্যাণকর নানা ব্যাপারের যেরূপ বিধি ব্যবস্থা আছে জগতের অন্য কোনও দেশে তা নেই।

এ ছাড়া জার্ম্মাণীর আর একটা প্রধান গুণ হচ্ছে তারা অতি সচ্চরিত্র জাত! বাই-বেলোক্ত ঈশ্বরের দশটি আদেশের মধ্যে পঞ্চম আজ্ঞার প্রতি এদের মত শ্রদ্ধাবান খৃষ্টান জগতে খুঁজে পাওয়া যায় না! এগুলো সবই জার্ম্মাণীর জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী ও গৌরবময় করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

জার্ম্মাণ মেয়েরা ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তারা নোংরা বা ময়লা একেবারেই দেখতে পারে না! রাতদিন ঘরদোর ধোয়া মোছা ঝাড়া পরিষ্কার করা এই নিয়েই আছে।

ধাত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা।

যুরোপের অন্যান্য দেশের মেয়েরা তাই জার্ম্মাণ মেয়েদের ঠাট্টা ক'রে বলে—ওরা 'এত' শুচি-বায়ুগ্রস্ত যে রাস্তার ধারের 'মাইল ষ্টোন্' (দূরত্ব নির্দ্দেশক শিলাখণ্ড) গুলো পর্য্যন্ত ধুয়ে রাখে!

পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে জার্ম্মাণীর একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে—প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির রাজধানী তাদের অতিরিক্ত জাঁকজমক প্রভৃতি একাধিক দোষ সত্ত্বেও, শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি ও প্রসারের দিক দিয়ে জার্ম্মাণ জাতকে বড় ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করতো এবং করেওছে। 'ফ্রেডরীক 'দি গ্রেটের' সময় পটস্‌দামের দান, কার্ল আগষ্টের সময় "ওয়াই-মারের"—রাজা ম্যাক্সিমিলীয়ানের

জার্ম্মাণ জননী! (যুরোপে ছেলে মেয়েদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে ও যত্ন করতে জার্ম্মাণ জননীদের মতো আর কোনও জাতের মেয়েদের দেখা যায় না।)

গির্জ্জার পথে। (ওয়েষ্টিশ্ মেয়েরা সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য গির্জ্জাভিমুখে চলেছে।)

সময় 'মিউনিশের' প্রাধান্য প্রতিপত্তি খুবই ছিল। এই সব রাজসভা এবং ষ্টাট্‌গার্ট, ড্রেস্‌ডেন, কার্লশ্রু, ব্রান্স্‌উইক্ প্রভৃতি আরও অন্যান্য ছোট ব'ড় রাজধানীগুলি বরাবরই জ্ঞানের আলোক ও শিক্ষার উৎকর্ষের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই রাজধানীগুলি থেকেই শিল্প ও সাহিত্য, নাট্য ও সঙ্গীত প্রভৃতি ললিত-কলার সৌন্দর্য্য ও স্বাদ সমগ্র জার্ম্মাণী উপভোগ করতে শিখেছিল!

প্রাচীন জার্ম্মাণীতে যদি এই রকম বিশ পঁচিশটি পৃথক্ রাজ্য না থাক্‌তো, কেবল যদি একমাত্র রাজধানী সুদূর বার্লিন থেকেই শিক্ষা-সভ্যতা-জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ঢেউ আসবার অপেক্ষায় জার্ম্মাণীকে বসে থাকতে হ'তো, তাহলে সমগ্র জার্ম্মাণী আজও মানুষ হ'য়ে উঠতে পারতো কি না সন্দেহ! এ ছাড়া 'বার্লিন' যে সমগ্র সাম্রাজ্যের গুরুভারে একেবারে 'প্যারির' মতো প্রপীড়িত হ'য়ে পড়ে নি, তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, এক অখণ্ড মহাসাম্রাজ্যে পরিণত হয়েও জার্ম্মাণী তার প্রাচীন অভ্যাস মতো নিজ নিজ প্রদেশগত স্ব স্ব প্রাধান্য ও বিশেষত্ব একেবারে পরিত্যাগ করে নি। কাজেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও

কলেজের উৎসবে। (ছেলেরা সখের সৈন্যদলের পোষাক পরে—উৎসবে যোগদান করে আমোদ করছে।)

খোলামাঠে পড়া (গ্রীষ্মের দিনে ছেলেদের স্কুল ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে খোলা মঠে এনে পড়ানো হয়।)

শাসনের গুরুভার সবটাই বার্লিনের স্কন্ধে আসবার সুযোগ পায়নি।

ফলে জার্ম্মাণীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সে সময়ে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব হবার কারণ ঘটেছিল। বুরোক্রেশীর সে বিষময় প্রভাবে তারা জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল। সর্ব্বরকমে রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকার দরুণ জার্ম্মাণরা তাদের স্বকীয় বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্যকারিকা শক্তি হারিয়ে ফেলছিল।

জার্ম্মাণীর সামাজিক অবস্থাও তখনকার দিনে এই রাজকীয় প্রভাবের হাত এড়িয়ে চলতে পারত না। রাজ-সরকার থেকে উপাধি ও খেতাব পেয়ে আভিজাত্য গৌরব লাভ করবার একটা প্রবল ঝোঁক সে সময় জার্ম্মাণদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যেতো। যারা বনিয়াদি পুরাতন সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক তাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যারা রাজসরকারের অনুগ্রহলব্ধ খেতাবে সুসজ্জিত হ'য়ে সম্ভ্রান্ত সাজতে চাইত, তারা দেশের যথার্থ বড়লোক হ'য়ে উঠতে পারতো না কোনও দিনই! আগেকার দিনে মধ্যে শুধু প্রকৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে যে 'ভন্' (Von) শব্দটি ব্যবহার হ'তো, যেমন ফরাসীদের 'ডি' (De) শব্দটি ব্যবহার হয়, সেটি প্রায় সবার নামের পূর্ব্বেই দেখা যেতে লাগল।

পরিচ্ছন্নতার পরিচয়। (বার্লিনের একটি বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের আর্শী চিরুণী ব্রুশ ও দাঁতমাজা ও মুখ ধোবার সরঞ্জম এনে স্কুলে রাখতে হয়। একটি ঘরে তাকের উপর; নম্বর দেওয়া সেগুলি ঝুলানো থাকে। ইস্কুলে এসে টিফিনের পর এবং বাড়ী যাবার সময় তাদের এগুলি ব্যবহার করতে হয়।)

এই জাত নূতনকে বরণ ক'রে নিয়ে যুগধর্ম্মের বর্ত্তমান গতির সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে চ'ললেও সে তার প্রাচীন ও পুরাতনকে একেবারে নিঃশেষে বর্জ্জন ক'রে দেয়নি। সাবেকের মধ্যে যা' যা' শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর ছিল—যার মূল্য অক্ষয় এবং যার প্রয়োজন শাশ্বত কালের বলে সে বুঝতে পেরেছিল, তাকে সাগ্রহে ধ'রে রেখেছে।

জার্ম্মাণীর প্রাচীন ব্যবস্থার গুণও ছিল যেমন, তার দোষও ছিল তেমনি একাধিক। প্রত্যেক পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র রাজ্যের নরপতিগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার

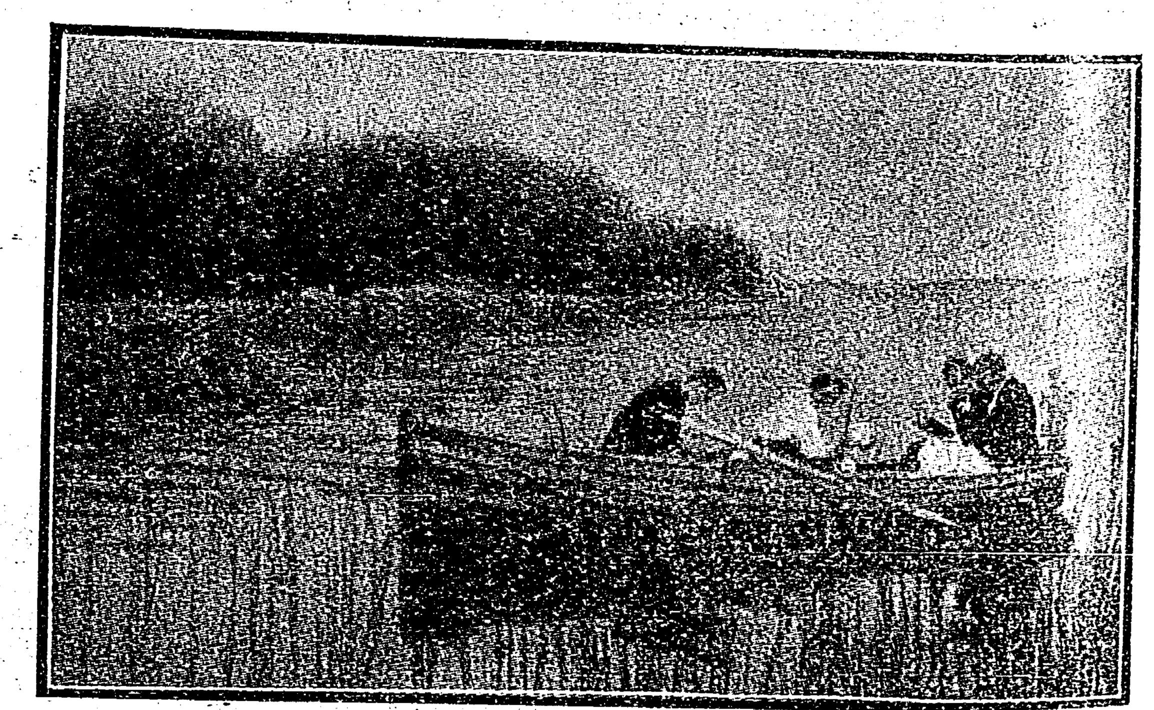

বোটে বসে পড়া। (নৌকা ক'রে বেড়াতে বেড়াতে জার্ম্মান্ ছাত্রেরা অনেকে পাঠাভ্যাস করে।)

শুধু 'খেতাব' নয়, রাজ-সরকারে চাকুরী পাবার একটা বিষম প্রলোভনও তাদের মধ্যে এসে পড়েছিল; কারণ 'উপাধি" সংগ্রহ করবার ওইটেই ছিল তখন সোজা পথ। কাজেকাজেই জার্ম্মাণীর উপাধিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে গভর্মেণ্টের চাকুরের সংখ্যাই বেশী দেখতে পাওয়া যায়। তৈলকীট যেমন কোনও দিনই পাপপদবাচ্য হ'তে পারে না, তেমনি এই সব খেতাবলুব্ধ চাকুরে ও ব্যবসায়ীদের কোনও দিনই প্রকৃত সম্ভ্রান্ত হবার আশা ও সম্ভাবনা নেই।

অনেকে মনে ক'রেছিলেন যে দেশে জনমত প্রবল হ'য়ে উঠলে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লে এই উপাধিব্যাধিগ্রস্তরা আরোগ্য হ'য়ে উঠবে! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রোগ আরও বেড়ে গেছে দেখা যাচ্ছে! এমন কি ওটা আজকাল ছোটখাটো চাকুরেদের মধ্যেও সংক্রামিত হ'য়ে পড়ছে!

জার্ম্মাণীর কয়েকটা প্রধান প্রধান জাতির চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এইবার সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির এমন কতকগুলি বিশেষ গুণের আলোচনা করা যাক্—যে গুণগুলি ওদের রাজারাজড়া থেকে আরম্ভ ক'রে জনসাধারণের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতিরই নিজের নিজের একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে, যেটা জাতির সভ্যতা, রাষ্ট্রগোষ্ঠী, ইতিহাস, আবহাওয়া, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সম্প্রদায় হিসাবে গড়ে ওঠবার শান্ত-সংযত বা উগ্র উচ্ছৃঙ্খল গতি অনুসারে জন্ম লাভ করে। জার্ম্মাণদের সম্বন্ধে এক কথায় বলা হয় যে তারা খুব 'কড়া জান্'!

লাইপ্জিগের মেলা। (বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের ঘটা!)

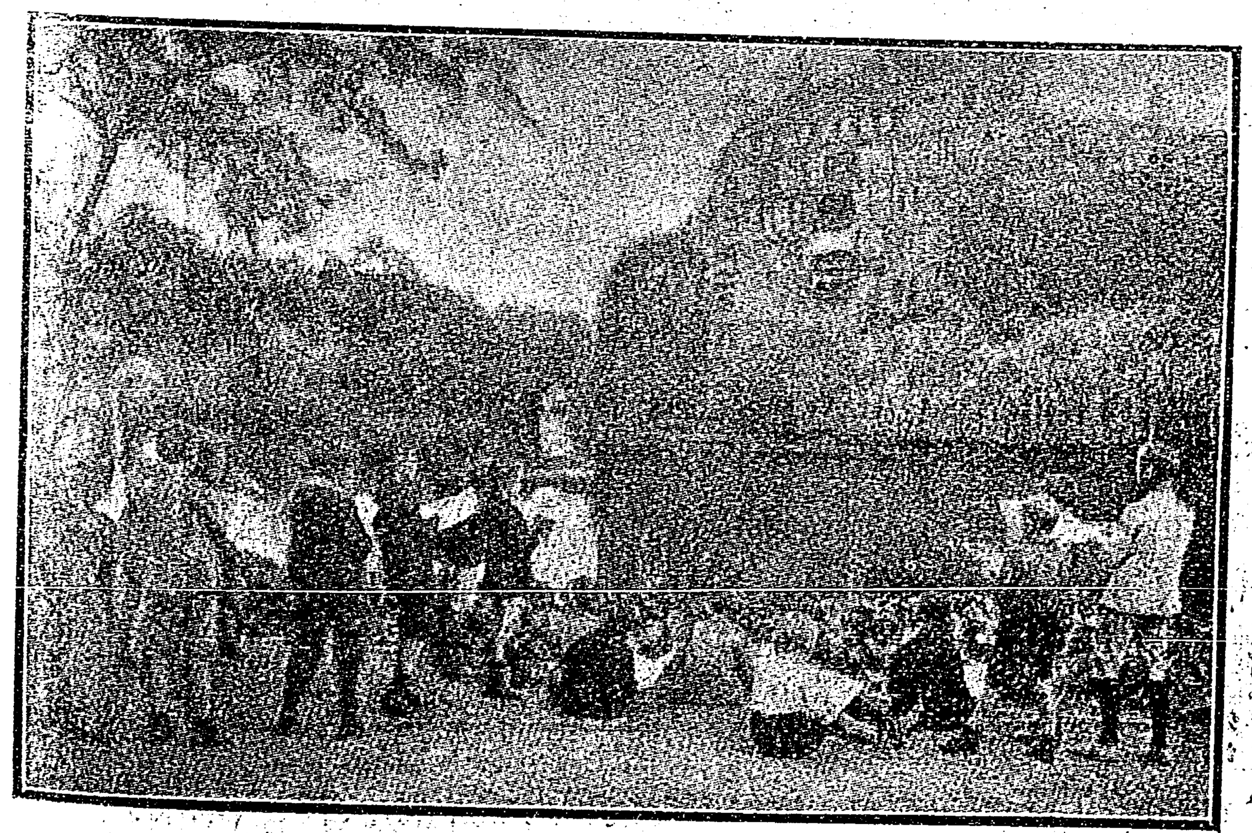

শিশু শিল্পীর দল (প্রকৃতির সৌন্দর্য্য থেকে ছাত্রেরা চিত্রাঙ্কন-শিল্প শিক্ষা ক'রছে)

অর্থাৎ মোটেই ভাবপ্রবণ নয়। কখনই আবেগে অধীর হ'য়ে ওঠে না এবং চপলতা কাকে বলে জানে না। তারা যেন সংযত ও নিরুদ্বেগ মানুষের আদর্শ। কিন্তু এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অধিকাংশ জার্ম্মাণ মোটেই সংযত ও নিরুদ্বেগ নয়। বরং তারা খুব স্ফূর্ত্তিবাজ আমুদে এবং ভাবের দিক দিয়ে তাদের হৃদয় একেবারেই উদাসীন নয়! তবে তাদেরই বিভিন্ন জাতের মধ্যে ওটার ওজন একটু কম বেশী হতে পারে।

মোটের উপর জার্ম্মাণরা বেশ একটা হৃদয়বান মরমী

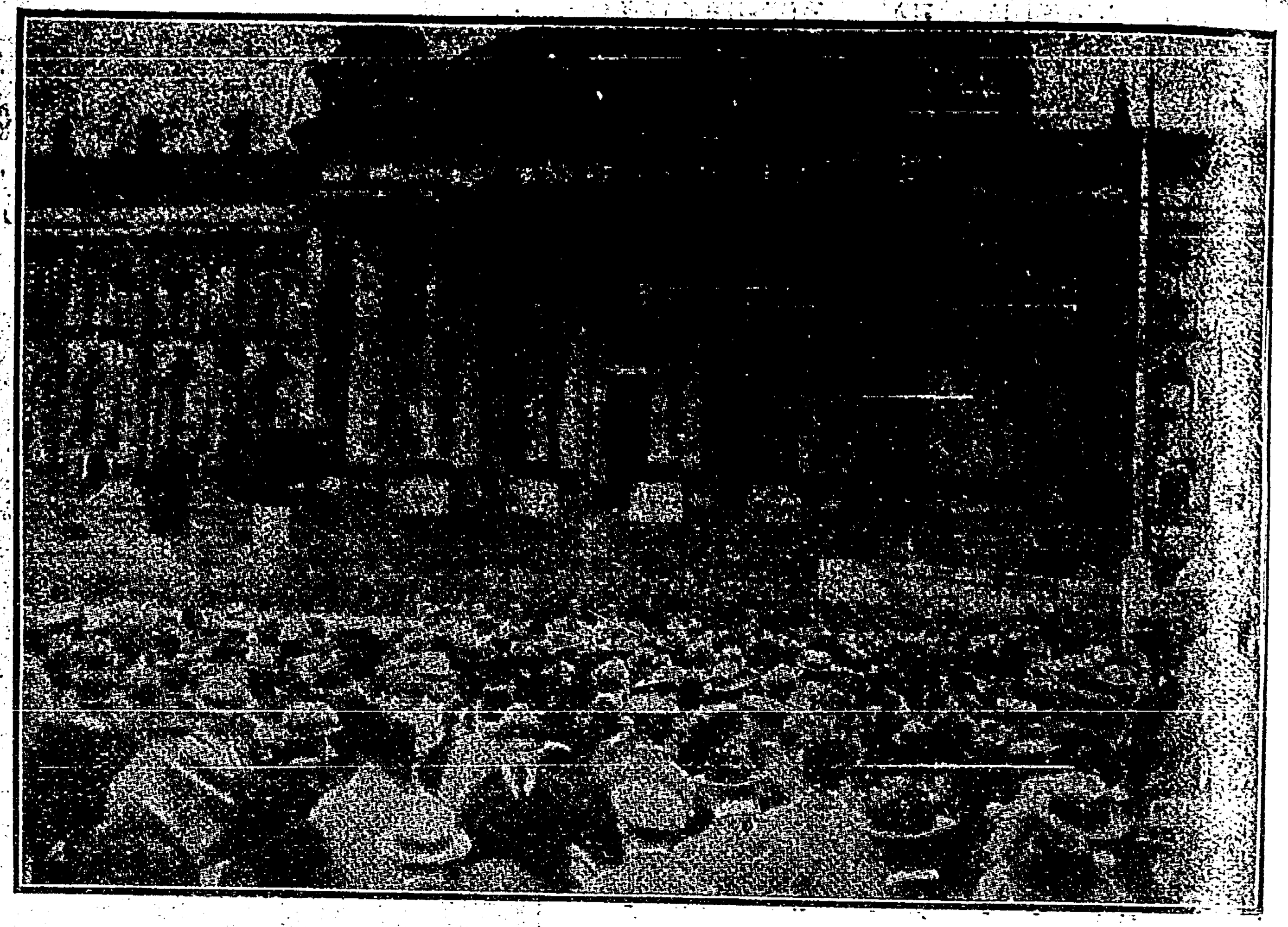

সভাগৃহের সম্মুখে!

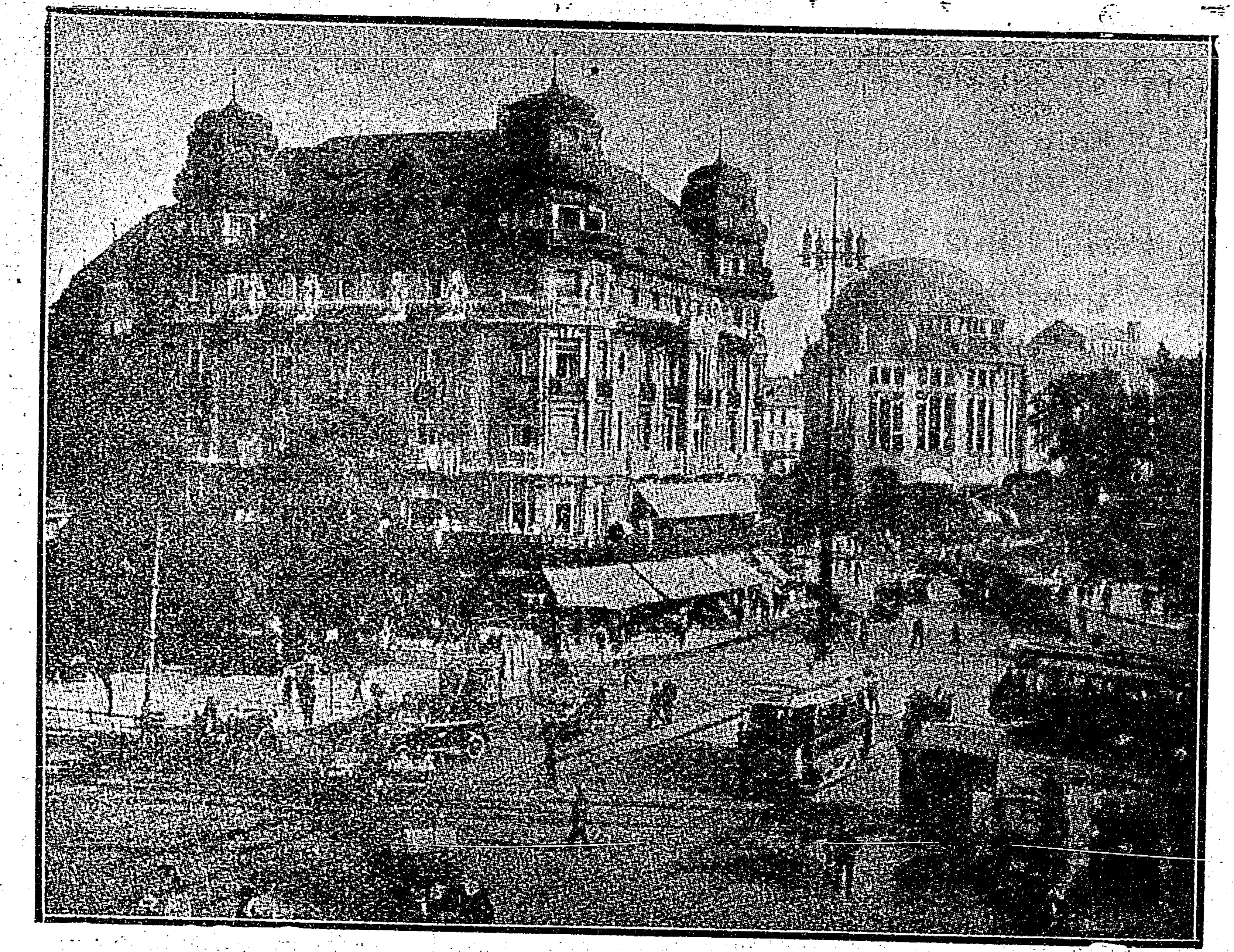

বার্লিনের "পটস্‌ডামারপ্লাট্‌জ" নামক চৌমাথা। (অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা এসে এখানে একত্র মিশেছে। গাড়ী ঘোড়া ট্রাম মোটর ও লোকজনের ভিড় এখানে সদা সর্ব্বদা!)

ও দরদী জাত। শিল্পানুরাগী, সামাজিক সভ্যতার চরম উন্নতিকামী, মিশুক, অতিথিবৎসল, উদারচরিত, দয়াল, অজ্ঞাত অপরিচিতকে সাহায্য করতে কোনও দিনই সে পরাঙ্মুখ নয়। এ ছাড়া বন্ধুবৎসল জাত ও জার্ম্মাণদের মতো এমন খুব কমই দেখা যায়। সঙ্গীত ও নাট্যকলা যেন তাদের একটা নেশার মতো! সহরের কথা ছেড়ে দাও—এমন কোনও গ্রাম নেই, যেখানে একটা গাইয়ে-বাজিয়ের দল তাদের আখড়া বা আড্ডা খুলে বসেনি। বড় বড় শহরে মিউনিসিপ্যালটির সাহায্যেই থিয়েটার-গৃহ, সঙ্গীত-ভবন, কলাভবন ও যাদুঘর প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক শহরেই নাট্যমন্দির আছে এবং সেখানে নিত্য অভিনয় হয়। জার্ম্মাণীর একটা অতি নগণ্য ক্ষুদ্র শহরেও এমন উচ্চ অঙ্গের অভিনয়কলা দেখতে পাওয়া যায় যে বিলাতের প্রধান শহর লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে তার তুলনা হ'তে পারে! জার্ম্মাণরা থিয়েটারকে কেবলমাত্র আমোদ উপভোগের স্থান ব'লে মনে ক'রে না। নাট্যাভিনয়কে তারা শিক্ষা ও সভ্যতায় উৎকর্ষ লাভের উপায় বলেও মনে করে। শেক্সপীয়ার প্রভৃতি একাধিক ইংরাজ নাট্যকারের রচিত নাটকাবলী জার্ম্মাণীতে এত বেশীবার অভিনীত হয়েছে এবং এখনও হয়, যা তাদের নিজেদের দেশে কখনও হয়নি এবং হবার সম্ভবনাও কম। জীবনের সামাজিক সম্ভোগের দিক থেকে হোটেল, চটি, পান্থনিবাস ভোজনালয়, পানশালা প্রভৃতি স্থানগুলি জার্ম্মাণীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে বিবেচিত হয়।

জার্ম্মাণদের নামে 'মাতাল' বলে যে একটা বদনাম রটেছে সেটাও সম্পূর্ণ অলীক। 'বীয়ার'টা তারা একটু বেশী পরিমাণে খেলেও তারা খুব কমই 'ব্র্যাণ্ডী' পান ক'রে। তাদের মতো ঠাণ্ডা দেশে 'বীয়ারটাকে' ঠিক মদ বলা চলে না; ওটা একটা নির্দ্দোষ পানীয় মাত্র!

জার্ম্মাণরা খুব উচ্চ শ্রেণীর বক্তা! তাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকারী, রাষ্ট্রসভার সভ্য, অধ্যাপক, ধর্ম্মপ্রচারক, পুরোহিত, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি এক একজন একেবারে বক্তার রাজা। একাদিক্রমে এরা ছয় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েও ক্লান্তিবোধ করে না।

জার্ম্মাণদের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, তাদের প্রকৃতির রূপশ্রীর প্রতি অনুরাগ! প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্য তাদের মনের উপর বেশ গভীর প্রভাব বিস্তার

লাইপ্‌জিগের মেলায় (বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের ঘটা!)

করে। এই গুণেই জার্ম্মাণীর কাব্য-সম্পদ অতুলনীয় হ'য়ে উঠেছে! সকল জিনিস বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রবৃত্তিটা তাদের মধ্যে সহজাত বলে তারা গোঁড়া হয়েও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেয় না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসী হয়েও নাস্তিককে ঘৃণা করে না। একটা কোনও 'মত' ও 'পন্থার' পক্ষপাতী

হ'লেও কোনও 'মত' বা 'পন্থাকে' তারা ধ্রুব বলে মানে না। বিধি-বিধান মেনে চ'ল্‌লেও কোনও বিধি-বিধানই তাদের আক্রমণের হাত এড়িয়ে যেতে পারে না। তাদের সংগঠন-শক্তি ও বুদ্ধির চেয়ে ধ্বংস ও চূর্ণ করার দিকেই ঝোঁকটা একটু বেশী দেখা যায়।

রসিকতা এরা উপভোগ করতে যতটা পটু, রস-রহস্য উদ্ভাবনে ততটা দক্ষ নয়। এ বিষয়ে ইংরেজরা এদের চেয়ে বড়। ইংলণ্ডের যে কোনও একখানা হাসি-তামাসার কাগজ নিয়ে জার্ম্মাণীর এই শ্রেণীর পত্রিকার

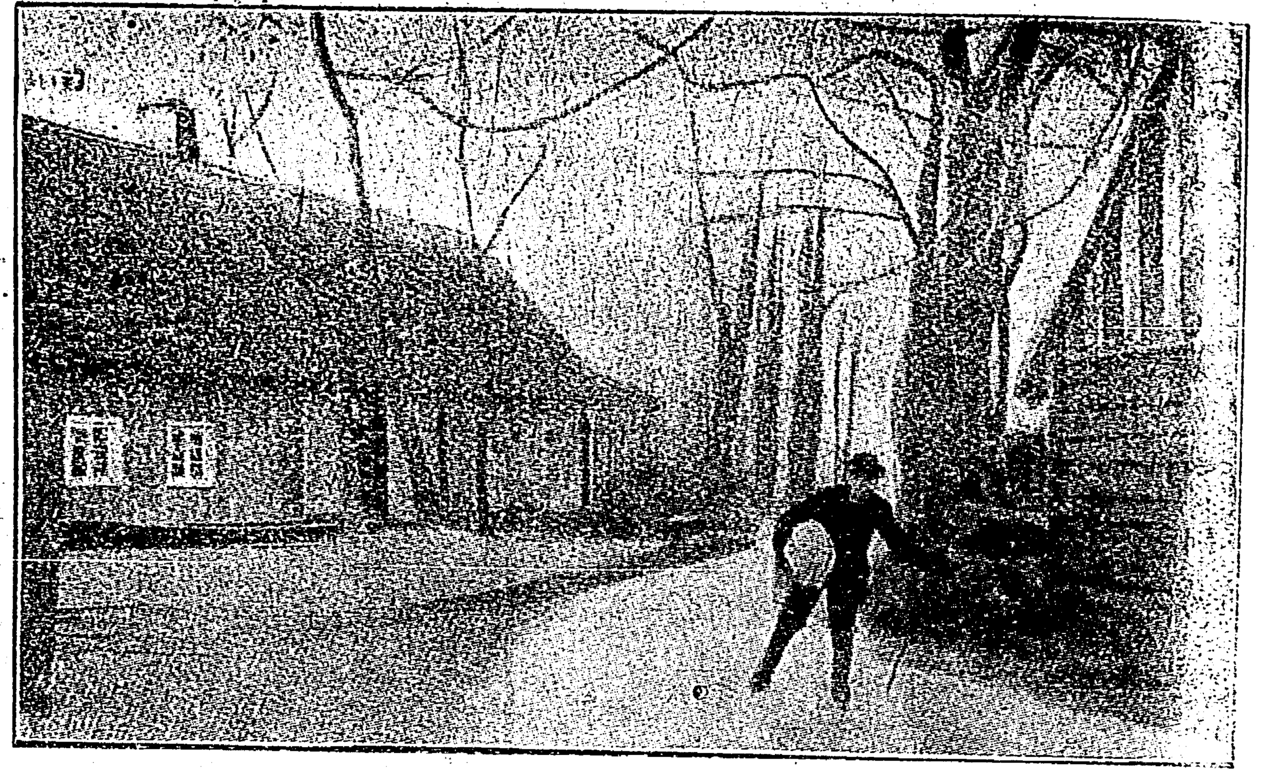

বাজারের পথে। (জার্ম্মাণীর 'স্প্রীওয়াল্ড' অঞ্চল শীতের দিনে বরফাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। এখানকার প্রত্যেক জার্ম্মাণ 'স্কেটিং' জানে। স্কেট করতে না জান্‌লে বরফে ঢাকা রাজপথে চলা অসম্ভব। একজন কৃষক 'স্কেট্' করে বগলে মাল নিয়ে বাজারে চলেছে।)

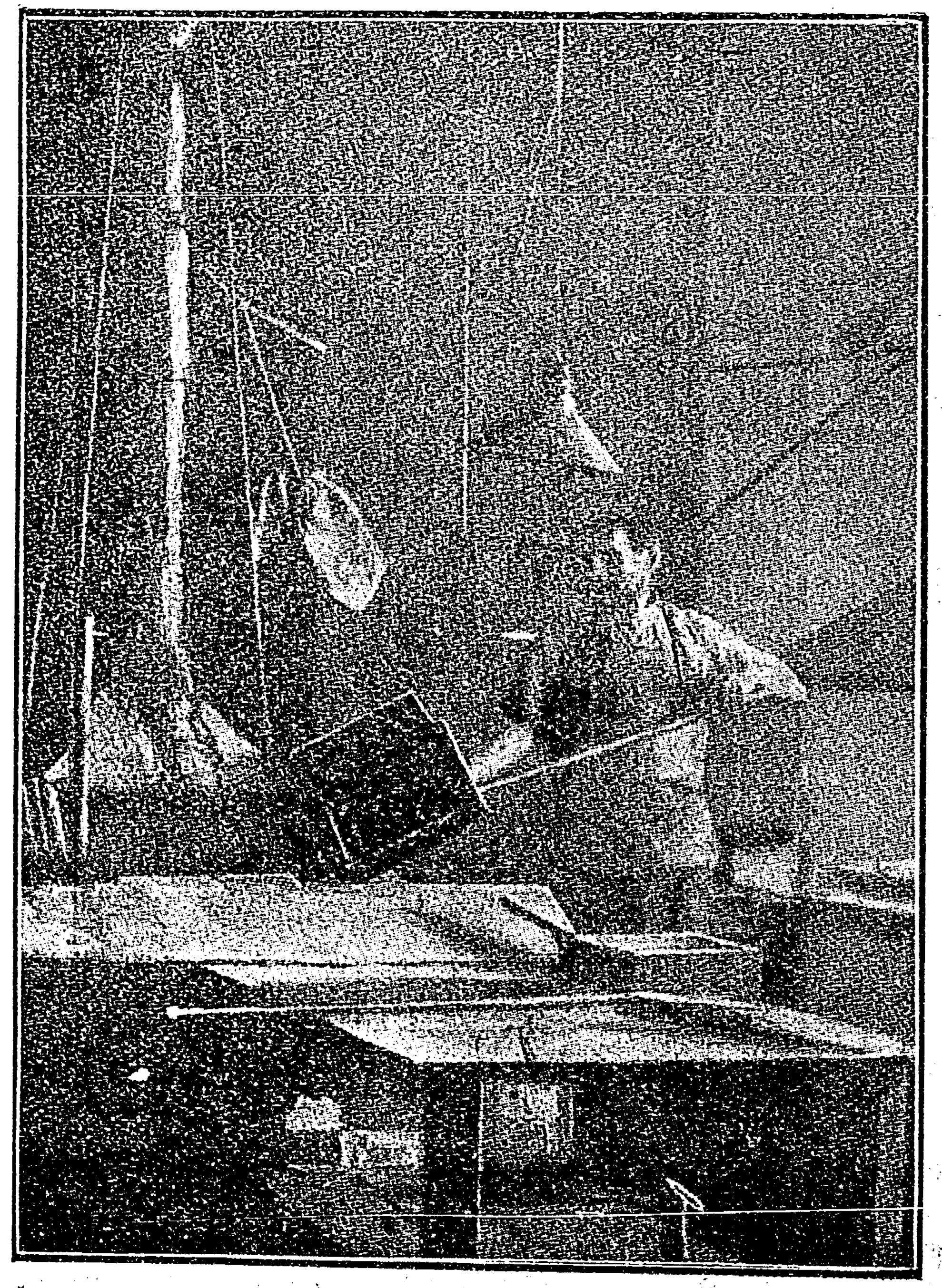

জার্ম্মানীর কাঁচের কারখানা

সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই এটা সহজে ধরা পড়ে। রগড় দেখা ও রগড় করায় অনেক তফাৎ। জার্ম্মাণদের মধ্যে জাতীয় গুণাবলির অনেক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও আচার ব্যবহারের বহু বিপরীত অনৈক্যও দেখা যায়। উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের ও পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চিমের অনেক বিষয়ে গরমিল আছে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

জার্ম্মাণ সহরগুলিতে বড় বড় পাকা বাড়ী অসংখ্য আছে বটে, কিন্তু গ্রামের কৃষক অধিবাসীরা সবাই কুটীরবাসী। তাদের অধিকাংশ কুটীরই কাঠের তৈরী। কেউ কেউ শুধু কাঠের কাঠামো ও চালা রেখে, দেয়ালগুলি সব ইঁট ও বালি চুণের দ্বারা নির্ম্মাণ ক'রেছে। উত্তরাঞ্চলের কৃষকেরা সকলেই প্রায় তাদের ক্ষেতের ধারেই বাড়ী করে বাস করে। কিন্তু বাভেরীয়ার কৃষকরা গ্রামের মধ্যে বাস করতেই ভালবাসে। গ্রাম থেকে তাদের ক্ষেত অনেক দূরে হ'লেও তারা গ্রাম থেকেই ক্ষেতে যাওয়া-আসা করে।

এই কৃষি-জীবী জার্ম্মাণ অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য এত বেশী যে, তা খুঁটিয়ে বর্ণনা ক'রতে গেলে একখানি মহাভারত হ'য়ে পড়বে। ধর্ম্মসংক্রান্ত যে কোনও উৎসবের সময় সাজ-পোষাকের এই বৈচিত্র্য খুব বেশী চ'খে পড়ে। স্ত্রীলোকের ও পুরুষের পোষাকের পার্থক্য ছাড়া সেখানে বয়স হিসাবে, পদমর্য্যাদা হিসাবে এবং সামাজিক অবস্থা ও পোষাকের বিশেষ বিশেষ তারতম্য আছে। (ক্রমশঃ)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের অধোগতি

শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার

আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করে' তৎসম্পর্কে দু'একটী কথা বলা কর্ত্তব্য মনে কচ্ছি; কারণ ভারতবর্ষের প্রগতি বা অধোগতি বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-মাত্রই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

বসন্তবাবুর প্রবন্ধ পাঠে যতদূর বোঝা যায়, তা থেকে মনে হয়, প্রবন্ধটী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "শূদ্রধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের সমালোচনা ব্যপদেশে লিখিত এবং প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করা। লেখক মহাশয়ের মতামত সম্বন্ধে আলোচনা কর্ব্বার পূর্ব্বে দেখা যাক, বিশ্বকবি তাঁর 'শূদ্রধর্ম্ম' প্রবন্ধে কি বলতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর বক্তব্য সত্য সত্য যুক্তিসঙ্গত কি না। কবি বলেচেন "যে সকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, যা' বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হতে' পারে তা ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হতেই পারে না; যদি তাকে বংশে আবদ্ধ করা হয়, তাহলে ক্রমেই তার প্রাণ মরে' গিয়ে বাইরের ঠাট্‌টাই বড় হয়ে উঠে। * * * * * আসল জিনিস মরে' যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে, জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়।" বিশ্বকবির কথাগুলি তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রণালীর ঘোরতর বিরোধী হলেও, যে মানব-সাধারণের স্বভাবসিদ্ধ এবং ব্যবহারিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই; কারণ, আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান, বংশানুক্রমে চল্‌তে চল্‌তে তার অভ্যাসটা এরূপ পাকা হয়ে গিয়েচে এবং দাম্ভিকতা এতদূর প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েচে যে, আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝতে পাচ্চি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আত্মা বহুকাল পূর্ব্বে তিরোহিত হ'য়ে অধুনা প্রেতাত্মা রূপে আমাদের জাতির স্কন্ধে চেপে বসেচে এবং নিরন্তর একটা অর্থশূন্য অভ্যাসগত ছুঁৎমার্গের বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে' সমগ্র জাতিকে নিয়ত নাস্তানাবুদ করে' ফেলচে। আমরা তর্কস্থলে এ কথা স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু প্রতিদিন যে আমরা আমাদের চোখের সম্মুখে এ ঘটনা দেখ্‌তে পাচ্চি, তা' অস্বীকার কর্ব্বার যো নাই। মহর্ষি মনু বলেচেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

অস্যার্থ;—যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করে' অন্যত্রে অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যালাভে যত্নবান্ হন, তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

তাহ'লে দেখা যাচ্চে—মনুর মতে আমরা জাতিশুদ্ধ সকলেই বহু দিন পূর্ব্বে শূদ্রত্ব লাভ করেছি। অথচ বংশগত ও জাতিগত সংস্কারহেতু তথাকথিত শূদ্র বা নিম্নস্তরের জাতিকে প্রাণপণে ঘৃণা করে' আসছি এবং শাস্ত্রমর্ম্মানুসারে আমরা শূদ্রাধম হয়েও নিম্নতর জাতিকে সমস্ত অধিকার হতে' বঞ্চিত কর্ব্বার স্পর্দ্ধা রাখি। এ দেখেও কি বলা যায় না যে, এই দাম্ভিকতা, এই অন্ধ সংস্কার আমাদের জাতীয় জীবনপথের বিঘ্ন ঘটাচ্চে! বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের যা সম্ভাব্য উপকার, বর্ত্তমানে তার একতিলও আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু অপকারগুলি আমরা পদে পদেই অনুভব কচ্চি। কাজেই বিশ্বকবির বাক্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তা' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তার পর বসন্তবাবুর কথা। তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নানা স্থানে নানা ভাবে যে কথাটী প্রকট হয়ে উঠেচে, সেটি হচ্চে কর্ম্মধারা বংশগত তথা জাতিগত হ'লে অনিষ্টের কোন কারণ ত নাই-ই, বরং উন্নতির কারণ যথেষ্ট আছে। যুক্তি-স্বরূপ তিনি দেখিয়েচেন "যে প্রকারের মতিগতি পিতামাতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, পুত্রেরও তদনুরূপ মতিগতি হইবার সম্ভাবনা বেশী।"

পূর্ব্বপুরুষের গুণাবলি যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্তান সহজভাবে কতকগুলি ব্রাহ্মণগুণ লাভ করে এবং ব্রাহ্মণেতর অপরাপর বর্ণীর পুত্র তত্তৎ বর্ণজ-গুণ লাভ করে, এ কথা অস্বীকার কর্ব্বার কোনও কারণ নাই ; কিন্তু কর্ম্মগুণে এবং প্রকৃতিদত্ত প্রবণতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধনের দ্বারা ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয়-গুণসম্পন্ন ও ও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন, অথবা ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্রের গুণসম্পন্ন ও শূদ্রের পুত্র ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন যে হতে পারে না, এ কথা কি কেউ সত্য এবং ভূয়োদর্শনের মর্য্যাদা রক্ষা করে বলতে পারেন ? সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের ইতিহাসও কি এই কথাই বলে না যে, জাতীয় কল্যাণ বা উন্নতির সহস্র সম্ভাবনা থাকলেও মানববিশেষকে তথা জাতিবিশেষকে জন্ম থেকে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগণ্ডীর ভেতর কোন কারণেই বেঁধে রাখা চলতে পারে না ? "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্ণ-ধর্ম্মের যে সংজ্ঞা দিয়েচেন, তার অভিপ্রায়ও কি এই তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিরোধী নয় ? অবশ্য গুণ ও কর্ম্ম অর্থে যদি লেখক মহাশয় বংশ ও জন্ম মনে করে থাকেন, তাহ'লে পৃথক্ কথা। কিন্তু তাঁর মত পণ্ডিত লোক যে এরূপ মনে কর্ব্বেন, তা' বিশ্বাস হয় না। গুণ কর্ম্ম অনুসারে মানুষের বর্ণ-নির্ণয় মাত্র হতে পারে ; যেহেতু বর্ণ, গুণ ও কর্ম্মের পরিচায়ক বা নির্দ্দেশ-সংজ্ঞা মাত্র। তাকে কোনরূপেই বংশ বা জন্মের অধীন করা চলে না। বর্ণ পরের জিনিষ এবং যোগ্যতা ও কর্ম্মের দ্বারা লভ্য। জন্ম-মাত্রেই কেহ কোনও বর্ণ-বিশেষ লাভ কর্ত্তে পারে না। মহর্ষি মনুও বলে গিয়েচেন "জন্মনা জায়তে শূদ্র ইত্যাদি।" কাজেই দেখা যাচ্চে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে যে প্রণালী নির্দ্ধারণ করে' গিয়েচেন, তাছাড়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বর্ণবিভাগ হতেই পারে না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা কর্ত্তে গিয়ে এই কথাটাই আমরা প্রায়শঃ ভুলে যাই যে, বর্ণ অর্থে জাতি নয়। বর্ণ মানুষের গুণ ও কর্ম্মজ্ঞাপক সংজ্ঞা এবং জাতি জন্মগত পার্থক্য-বোধক পরিভাষা। যেমন, বর্ণ বলিতে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বুঝি এবং জাতি বলিতে মানবজাতি, গোজাতি প্রভৃতিকে বুঝে থাকি। আমরা যে জিনিষটীকে সমর্থন কর্ত্তে ও যার অপকারিতা এবং অনিষ্টকারিতা ঢাকবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে থাকি, সেটী হচ্চে "জাৎ",—বর্ণ বা জাতি নহে। এ জাৎ ছুঁলে যায়, কিন্তু বর্ণ বা জাতি ছুঁৎমার্গের বাইরে।

বসন্ত বাবু এক স্থানে লিখচেন, "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্মরণাতীত কাল হ'তে বংশগত।" এ কথার তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য হ'ল না। কারণ একমাত্র বৈদিক ভারতেই অর্থাৎ যে সময়ে ভারতবর্ষে নিছক বেদবিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রচলন ছিল, সেই সময়েই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল। লেখক মহাশয় এখানে যে যুগের কথা ইঙ্গিতে বলেছেন, সে যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলে কোন জিনিষ প্রকৃত পক্ষে ছিল না,—ছিল জাতিভেদ-প্রথা। একটু প্রণিধান কর্লেই তিনি বুঝতে পার্ব্বেন যে, কালক্রমে যে সময় হ'তে কর্ম্ম ও বৃত্তি বংশগত হ'য়ে দাঁড়াল, ঠিক সেই সময় হতেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তিরোধান এবং বৈদিক যুগের অবসান হ'ল। তার পর এল জাতিভেদের যুগ, যে যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সংজ্ঞা বংশ এবং জন্মজ্ঞাপক হ'য়ে উঠল। বৈদিক যুগে গুণ-কর্ম্মজ্ঞাপক বর্ণ-ভেদ ছাড়া কোনরূপ জাতিভেদ যে ছিল না, এ কথা, বোধ করি, লেখক মহাশয়কে বলে' দিতে হবে না। অতএব, কোন কালেই যে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বংশগত ছিল না এবং থাকতেও পারে না, এ কথা প্রামাণ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণধর্ম্ম এবং বক্ষ্যমান জাতিভেদ-প্রথা—যাকে আমরা চলতি কথায় 'জাৎ' বলি, এই দুয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েচে, তা দেখিয়েচি। এই তফাৎটাকে আমরা লক্ষ্যের মধ্যে আনিনে বলেই বর্ণধর্ম্ম-আদর্শের মহীরুহের আওতায় এই মহা অনিষ্টকারী জাতিভেদ প্রথারূপ আগাছা জন্মাতে পেরেচে, যা'তে করে' একটা বিরাট জাতির শোচনীয় স্বাস্থ্য-হানি ঘটেচে। যুগ-সঞ্চিত অন্ধ সংস্কার এবং অভ্যাসের ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নামে এই 'জাৎ'-প্রথা পাথরের মত হিন্দুজাতির বুকের উপর দেবে বসেচে বলেই এর অধোগতি হচ্চে—ইহা নিঃসন্দেহ।

স্থানান্তরে বসন্তবাবু লিখচেন, 'মুসলমান অধিকারের অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বংশগত বর্ণাশ্রধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্ম, দর্শন, কাব্য, গণিত প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা এবং শিল্পে ভারতবর্ষ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। হিন্দু মনে করে—বংশগত ভাবে চর্চ্চা হয়েছিল বলেই এত উন্নতি হয়েছিল।' মানবজাতির সভ্যতার সেই অরুণ-

প্রভাতে ভারতবর্ষ এবং আরও দু'চারটী দেশ কেন যে এরূপ উৎকর্ষলাভ করেছিল—পৃথিবীর আদিম সভ্যজাতির ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই সে কথা জানেন ; সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে' প্রবন্ধ বাড়াতে ইচ্ছা করি না। তথাকথিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গুণেই যে এরূপ হয়েছিল, এ কথা বলাও যেমন সত্য, দুর্নীতিমূলক এই জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত না থাকলে, ভারতবর্ষ অধিকতর উন্নতির অধিকারী হ'তে পার্ত্ত, এ কথা বলাও তেমনি সত্য। কোন জিনিষ না থাকলে কি হ'ত বা কোন জিনিষ থাকলে কি হ'ত এ নিয়ে যুক্তি চলে না। বর্ত্তমানে যা' প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্চে সেইটী অবলম্বন করে' উন্নতি-অবনতির বিচার করা সমীচীন। এই জাতিভেদ-প্রথা যে আমাদের জীবন-পথের বিঘ্ন ঘটিয়েচে বা ঘটাচ্চে, তা' বর্ত্তমানকালে তার কুফল দেখেই বুঝতে পারা যায়। এইখানে একটা কথা উঠতে পারে, আমাদের স্বকৃত অধঃপতনের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তথা জাতিভেদ-প্রথাকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু কোন নীতি, নিয়ম বা পদ্ধতির ভাল-মন্দের বিচার কর্ত্তে গেলেই, তার প্রভাব এবং ফলের দিকে নজর পড়ে। একটা চলতি কথা আছে "ফলেন পরিচীয়তে' ; অর্থাৎ ফল দেখে বিষয়বিশেষের পরিচয় বা গুণাগুণ জানতে পারা যায়। এ থেকে এ কথা কি বলা চলে না যে, যে ধর্ম্ম তার নীতি-নিয়মের মধ্যে তার অনুসরণকারীদের চিরদিন ধরে রাখতে পারে নি, সে ধর্ম্ম তার অনুসরণকারীদের পক্ষে চিরদিন পর্য্যাপ্ত নয় ? এক দিন যে অনুশাসন মানুষ মাথায় করে নিয়ে তার জীবনধারা সুনিয়ন্ত্রিত করেছিল, যুগ-পরিবর্ত্তন-প্রবাহে সেই মানুষই যদি সেই অনুশাসনের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ করে তাহলে কি বলতে হবে না যে, সে ধর্ম্ম বা নীতি-অনুশাসন বিবর্ত্তন-ধর্ম্মকে অস্বীকার করেচে, অথবা তার নিজের মর্ম্মার্থ হারিয়ে ফেলেচে ? মানবজাতির কোন অবস্থাবিশেষে বা কালবিশেষে কোন ধর্ম্ম, ধারা বা পদ্ধতি কার্য্যকরী হয়েছিল বলে' তা যে চিরকালই কার্য্যকর এবং হিতকর হবে এরূপ কথা বলার অর্থ—দেশ-কাল-পাত্র এবং পারিপার্শ্বিকের প্রভাবকে গায়ের জোরে অস্বীকার করা। কোন কাল বা স্থানবিশেষে প্রয়োজ্য নীতি-নিয়ম দিয়ে চিরকালের জন্য কোন মানুষ বা জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে না। জোর করে চালাতে গেলে মানব-প্রকৃতি বিদ্রোহের সূচনা করে। এই কথাটাই বোঝাবার জন্যে John St. Mill বলেচেন, "Human nature is not a machine to be built after a model, and set to do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develop itself on all sides according to the tendency of the inward forces which make it a living thing." এই জোর করে' চালানর ফলেই আমাদের সমাজের ভিতর জাতীয় শক্তিক্ষয়কারী অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েচে। বেদবিহিত উদার বর্ণধর্ম্মের মর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করে' আমরা গ্রহণ করেছি তার বিকৃত অর্থ এবং নাম দিয়েছি তার জাতিভেদ। এই জাতিভেদ প্রথার স্বপক্ষে যত যুক্তিতর্কই দেখাই না কেন, যত দিন সমাজের স্তরবিভাগ গুণকর্ম্মগত না হয়ে দৈবাধীন জন্মগত হয়ে থাকবে, ততদিন সে সমগ্র জাতির ভিতর ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি কর্ত্তে থাকবে ; যেহেতু, মানব-প্রকৃতি একমাত্র গুণ ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার নিকটই মাথা হেঁট করে ; আর কোন অনুশাসন বা নীতি-নিয়মের কাছে সে অবনত হয় না। শাসন বা ভয়ের দ্বারা তাকে অবনত কর্লে সুযোগ পাওয়া মাত্র সে বিদ্রোহ সূচনা করে, ইহাই বিশ্বপ্রকৃতির সনাতন নিয়ম।

পুস্তক-পরিচয়

গীতালি।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের এই গীতালি ১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৩২৯ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, আর এই ১৩৩৩ সালে তৃতীয় সংস্করণ হইল। আমাদের দেশ যে কেমন রস-পিপাসু হইয়াছে, বারো বৎসরে গীতালির তিনটী সংস্করণই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গীতালির কবিতার পরিচয় শিক্ষিত, কাব্যরস-পিপাসুর কাছে নূতন করিয়া দিতে হইবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া যাঁহারা দুঃখ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা গীতালি পড়িতে বলি। ইহার মধ্যে যতগুলি কবিতা আছে, তার সবগুলিই উঁচু সুরে বাঁধা—সে সুর অপার্থিব!

কৌতুক-যৌতুক।—শ্রীঅমৃতলাল বসু মুদ্রাঙ্কিত; মূল্য দুই টাকা।

অনেক দিন পরে রসরাজ বসু মহাশয় বাঙ্গালীর হাতে এই 'কৌতুক-যৌতুক' দিলেন; বাঙ্গালী যে পরম সমাদরে এই যৌতুক মাথায় করিয়া লইবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও আমরা রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের জুড়ি খুঁজিয়া পাই না। লেখার এমন মুন্সীগিরি, এমন হাস্যরসের প্রবাহ, এমন তীক্ষ্ণ অথচ সরস ও বিদ্বেষ-লেশ-শূন্য বিদ্রূপ বাঙ্গালীর মধ্যে রসরাজ ব্যতীত আর কাহারও হাত দিয়া বাহির হইতেছে না। তাই, তাঁহার এই যৌতুকের সকলগুলি প্রবন্ধই পূর্ব্বে পড়িলেও এখন দুই তিনবার পড়িয়াও আশা মিটে না। কোন্ দিক দিয়া বই শেষ হইয়া যায়, তখন মনে হয় ২৫৬ পৃষ্ঠা না দিয়া রসরাজ ৬৫৬ পৃষ্ঠা দিলেন না কেন? এই দুঃখ-দৈন্য-প্রপীড়িত দেশের লোক এই বইখানি পড়িয়া অন্ততঃ ঘণ্টাখানেকের জন্য সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইবেন, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

বঙ্গে চালতত্ত্ব।—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ সাহিত্যরত্ন প্রণীত, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত শেঠ মহাশয় একজন পাকা ব্যবসায়ী; তিনি 'মহাজন সখা' 'মহাজনী হিসাব' প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই চালতত্ত্বও তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। বাঙ্গালা দেশে কোন্ কোন্ জেলায় কি কি রকমের চাউল জন্মে, কি পরিমাণে জন্মে, কোন্ জেলার কোন্ কোন্ হাটে কোন্ রকমের চাউল পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সন্তোষ বাবুকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে না। সুধু ব্যবসায়ী কেন, গৃহস্থ-মাত্রেরই ঘরে এই পুস্তকখানি থাকা কর্ত্তব্য।

মহাত্মা তুলসীদাস।—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ২, টাকা।

মহাত্মা তুলসীদাসের নাম ভারতবাসী মাত্রেই জানেন; তুলসীদাসের রামায়ণ হিন্দীভাষী হিন্দুর অপূর্ব্ব সম্পৎ। তাঁহার ন্যায় সাধকশ্রেষ্ঠের জীবন-কথা জানিবার জন্য সকলেরই বাসনা হয়; শ্রীযুক্ত শচীশ বাবু সেই বাসনা পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা তুলসীদাসের জীবন অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ; যাঁহারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা এ গ্রন্থ পড়িয়া সুখী হইতে পারিবেন না। শচীশবাবু অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন; তাই তিনি সেই ভাবেই বিভোর হইয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, যুক্তিতর্ক-বিচারের ধার দিয়াও যান নাই। তাহা হইলেও বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেরই এই মহাত্মার কাহিনী পাঠ করা কর্ত্তব্য। সুলেখক শচীশ বাবুর পরিচয় আর বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না।

শেষ খেয়া।—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণ তাঁহার 'কোষ্ঠীর ফলাফল' হইতে প্রতি মাসেই পাইতেছেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী, তাঁহার বাক্‌পটুতা, তাঁহার রহস্যক্ষমতা বাস্তবিকই অসাধারণ। এই 'শেষখেয়া' সেই পাকা হাতের লেখা একখানি উপন্যাস। আমরা এই বইখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই গ্রন্থের নবীনের চিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রসিদ্ধ শিল্পীর ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন। বইখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।

শ্রীরামকেলী ও শ্রীশ্রীরূপসনাতন।—শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর আদর্শ চরিত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমন মহাপুরুষ-দিগের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে যে প্রকার ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার দরকার, গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশশী গোস্বামী মহাশয়ের যে তাহা প্রভূত পরিমাণে আছে, তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান। ভক্তশ্রেষ্ঠের জীবন-কথা ভক্তের মুখে যে কি সুন্দর শোনায়, তাহা এই বইখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

চীন যাত্রী।—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

এখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, অথচ ইহাতে চীনের কথা মোটেই নাই। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, সুলেখক কেদার বাবু সুধু পথের কথাই এই বইখানিতে লিখিয়াছেন, আর সে পথও স্থলপথ নহে, জলপথ; জাহাজে চড়িয়া চীন দেশে পদার্পণ করিয়াই কেদার বাবু কথা শেষ

করিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি যে কয়দিন জাহাজে ছিলেন, সেই কয়দিনের বিবরণ দিয়াই একেবারে ইস্তাফা দিয়াছেন। বইখানি পড়া যখন শেষ হইল, তখন বলিতে হইল 'ও বাঁড়ুয্যে মশাই, আর কৈ?" পাকা যাদুকর এই কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়,—তিনি ঠাট্টা তামাসা রহস্য করিয়া হাসাইতে হাসাইতে আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে চীনের বন্দরে উপস্থিত করিয়াই অমনি গা-ঢাকা দিলেন। কাজটা কিন্তু তাঁহার মত ওস্তাদের উপযুক্ত হয় নাই, এ কথা যিনি এই বই পড়িবেন, তিনিই বলিবেন।

উপাসিকা-চরিত।—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কির জীবন-কাহিনী এই 'উপাসিকা-চরিতে' বিবৃত হইয়াছে। এই মহিয়সী মহিলার জীবন-কথা-প্রসঙ্গে ঘোষ মহাশয় তত্ত্ববিদ্যা-মণ্ডলীর উদ্দেশ্যও অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্যা-মণ্ডলীর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা। ম্যাডাম ব্যাভাট্স্কির অপূর্ব্ব গ্রন্থ Isis Unveiled ও Secret Doctrine, এই দুইখানি পুস্তকে তত্ত্ববিদ্যাব সার আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করিলে যে সুধু থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রীরই জীবন-কথা জানিতে পারা যায়, তাহা নহে, উক্ত সোসাইটীর সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের লিপি-কুশলতায় পুস্তকখানি মনোরম হইয়াছে।

সন্ধ্যামণি।—শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত নিয়োগী মহাশয় এক সময়ে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমরা পরম আগ্রহে তাঁহার কবিতা পাঠ করিতাম। তাহার পর অনেক দিন তিনি নীরব ছিলেন; আমরা মনে করিয়াছিলাম বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তিনি বাণী-সেবা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু, এই 'সন্ধ্যামণি' দেখিয়া আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। সুকবি নিয়োগী মহাশয়ের কবি-প্রতিভা এখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই, বরং আরও উজ্জ্বল, আরও প্রখর হইয়াছে। আমরা এই সংগ্রহ-পুস্তকের প্রত্যেক কবিতাতেই তাঁহার কবি প্রতিভার প্রমাণ পাইলাম।

Raja Rammohan Ray's Misson to England. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এই পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। মোগল রাজ্যের নামমাত্র উত্তরাধিকারী সম্রাট মৈনুদ্দীন আকবর ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কোম্পানীর যে সকল সর্ত্ত হইয়াছিল, কোম্পানী তাহা রক্ষা করিতেছেন না বলিয়া তিনি এখানে দরবার করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া বিলাতে আবেদন করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় মহাশয়কে বিলাতে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে কোম্পানীর সহিত তাঁহার যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল এবং সরকারী দপ্তরে যে সকল কাগজপত্র ছিল, তাহার সন্ধান এতদিন কেহ পান নাই। শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া সেই সকল অপূর্ব্ব-প্রকাশিত কাগজপত্র সরকারী দপ্তরখানা হইতে উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতের একটী অবশ্য-জ্ঞাতব্য অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়া দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও একাগ্র অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়াই পারি না। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে ভবিষ্যতে ইতিহাসের আরও অজ্ঞাত উপকরণ সংগৃহীত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

মানস কমল।—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

এখানি ছোট গল্পের সংগ্রহ। গ্রন্থকার বিভিন্ন সময়ে মাসিক পত্রিকাদিতে যে সমস্ত ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে এগারটী গল্প দিয়া এই 'মানস কমল' ছাপাইয়াছেন। এই গল্পগুলি যখন নানা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কয়েকটী 'ভারতবর্ষে'ও ছাপা হইয়াছিল, তখন অনেকেই গল্পগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র-বাবুর লেখার প্রধান গুণ এই যে, তিনি ছোট গল্প ছোটই করেন, অথচ সেই ছোটর মধ্যেই তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হয়। এই কারণেই আমরা নরেন্দ্রবাবুর গল্প পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। তাঁহার মানস-কমল' তাঁহার 'ষড়-অবতারে'র ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

গুরুগীতা।—শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ বিবৃত, মূল্য ছয় আনা।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে গুরু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই ব্যাখ্যা এই পুস্তকে করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও গুরু সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে; গুরু শব্দের অর্থ, শিষ্যের কর্ত্তব্য, গুরুধ্যানের ফল প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। যিনি এই গুরুগীতা সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী হইয়াও প্রকৃত হিন্দু সাধকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তিই তাঁহাকে এই গুরুগীতা সম্পাদনে প্রণোদিত করিয়াছে।

সাহিত্যিকা।—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত—দাম দেড় টাকা।

গ্রন্থকারের ১২টি সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি যখন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখনই এগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং পড়িয়া গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতায় এবং বিশ্লেষণ শক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বাংলা সাহিত্যে সত্যকার সমালোচনা দুর্লভ। ভিতরে যে পাণ্ডিত্য থাকিলে সমালোচনা সাহিত্যে গঠনের রসদ যোগায়, সেই পাণ্ডিত্য লইয়া খুব কম লোকই আমাদের সাহিত্যের আসরে যোগ দেন। বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য, এদেশে যাঁহারা পড়েন তাঁহারা লেখেন না, যাঁহারা লেখেন পড়ার সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প। সেই জন্যই আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা হয় অত্যন্ত হাল্কা হইয়া পড়ে, না হয় ব্যক্তিগত গালিগালাজের ছাপে অপাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়। নলিনীবাবু এই দোষ হইতে মুক্ত। তাঁহার লেখা পড়িয়াই বোঝা যায়, তিনি লেখেন বটে কিন্তু লিখিবার আগে পড়াশুনা করিয়া বনিয়াদটা পাকা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মনও রস-পিপাসু।

সুতরাং সমালোচকের যে কাজ—রসের পরিচয় দেওয়া, সত্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো, সৌন্দর্য্যকে উদ্‌ঘাটন করা—এগুলির অজস্র পরিচয় এই গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মত অবশ্য সর্ব্বত্র আমাদের কাছে যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু এখানে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। সে আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রাখিয়াও এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় যে, তাঁহার 'সাহিত্যিকা' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রন্থের ভাষাও ভাব প্রকাশের উপযোগী। তবে স্থানে স্থানে রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত শিথিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ দোষ যে অক্ষমতার জন্য নহে অনবধানতার জন্য—তাহাও বুঝিতে দেরী হয় না। তাহা হইলেও এ দোষ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। কারণ pefect যে রচনা তাহা সমস্ত রকমের দোষের হাত হইতেই মুক্ত।

সপ্তস্বরা।—শ্রীসুকুমার দত্ত প্রণীত—দাম পাঁচ শিকা।

এখানি গল্পের বই। সাতটি গল্পের ভিতর দিয়া, লেখক প্রাচীন ভারতের তীর্থ স্থানগুলির ভিতর ভোগের যে অগ্নিশিখার ছবি দেখিয়াছেন, তাহাকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। শব্দের দ্বারা ছবি আঁকায়, বর্ণনার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে লেখকের বেশ ভালো হাত আছে। কল্পনা তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে; সুতরাং অতীত যুগের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার পক্ষে অনেক স্থলেই অসম্ভব হয় নাই। তাঁহার ভাষা ঐশ্বর্য্যময়; কিন্তু অতিরিক্ত রকমে ভারি এবং সংস্কৃতবহুল। কিন্তু তাহা হইলেও গ্রন্থখানির কাব্যমাধুর্য্য আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে—বইখানি পড়িয়া আমরা খুসী হইয়াছি।

ভারতের দাবী।—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রণীত। দাম বারো আনা।

এখানি রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই। ইহাতে সাতটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি সমস্তই সুলিখিত। লেখক বর্ত্তমানের কোনো রাজনৈতিক গণ্ডীর ভিতর পড়িয়া 'খেই' হারাইয়া ফেলেন নাই। তাই অনেক সমস্যা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার অবকাশ তিনি লাভ করিয়াছেন। আর সেই জন্যই প্রবন্ধগুলি সমস্ত রকমের গোঁড়ামীর ছাপ হইতে মুক্ত। তাহার লেখার ভিতরেও জোর আছে, যুক্তির ভিতরেও জোর আছে। তিনি দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যও চাহিয়াছেন জোরালো শক্ত মানুষ—"যে মানুষ টলে না, গলে না, ভোলেও না—যে নমে না, নামে না, থামেও না, অবশ্যম্ভাবী হইলে ভাঙ্গে।" গ্রন্থের ভিতর লেখকের দেশ-প্রীতির পরিচয়েরও অভাব নাই। এ যুগের ভাবপ্রবণ রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ, বহিবারণও ভারি চমৎকার হইয়াছে।

কোরাণ-তত্ত্ব (তৃতীয় খণ্ড)।—শেষ রচ্ছুল, মৌলবী মোবিনুদ্দিন আহমদ কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা।

মৌলবী সাহেব কোরাণ সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আমরা আজ কেবল তাঁহার প্রণীত কোরাণ তত্ত্বের তৃতীয় খণ্ডের কথাই বলিব। এই খণ্ডে তিনি শেষ রচ্ছুল হজরত মহম্মদের জীবনী সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। আদর্শ পুরুষের জীবনী আলোচনা করিলে তাহা হইতে এমন সমস্ত জিনিষ জানা যায়, যাহা পার্থিব জগতের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সাম্প্রদায়িক বাক্ বিতণ্ডার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া আমরা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আদর্শ মহাপুরুষগণের উক্ত অনেক কথাই ঠিক ভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে না, যদি তিনি স্বীয় জীবনে সেই উক্তিগুলি কিরূপে কার্য্যকরী করিয়াছেন তাহা জানা না যায়। কোরাণ সরিয়ত প্রভৃতি নানা কথার নানা রকম ব্যাখ্যা নানাজনে করিয়া থাকেন, এবং সেই ব্যাখ্যাগুলি লইয়াই পৃথিবীতে নানা মতামত সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু যদি আমরা একবার বিবেচনা করিয়া দেখি যে, হজরত মহম্মদ স্বীয় জীবনে সেই কথাগুলি কি ভাবে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বাকবিতণ্ডা হ্রাস পাইবে। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, আদর্শ পুরুষগণের জীবনী আলোচনা করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। মৌলবী সাহেব তাঁহার এই পুস্তকে হজরত মহম্মদের জীবনী যেরূপ সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। লেখক বলিয়াছেন ঐহিক বা আত্মসুখ লাভ কখনও তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। ধরাধামে অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনা প্রতিষ্ঠা, পাপনিমজ্জিত জগতের উদ্ধার সাধন, মানবসমাজে একেশ্বরবাদ, সাম্যবাণী, ভ্রাতৃভাব বিস্তার এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। উপসংহারে লেখক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা একান্ত প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "হজরত মহম্মদ মোস্তফার শ্রেষ্ঠতম বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিরূপে একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সহিত, এক পরিবার অন্য পরিবারের সহিত ও এক জাতি অন্য জাতির সহিত শান্তিতে বাস করিতে পারে এবং কিরূপে জগতের পরস্পর-বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে, তাহার বিশদ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হজরত মহম্মদের জীবনীকে এই ভাবে অন্য লেখক দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। পুস্তকখানির ভাষা অতি সরল ও সুন্দর। সাধারণ লেখাপড়া-জানা ব্যক্তিরা অক্লেশে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৩]

অগ্রহায়ণ মাস। কয়েক দিন হইতে খাড়া পাশ্চমা বাতাস দিতেছে বলিয়া শীতের প্রকোপ বেশ একটু বাড়িয়া উঠিয়াছে। সরমা তাহার এক বৎসর বয়সের শিশু-পুত্রটিকে স্তন্য-পান করাইয়া বারাণ্ডায় রৌদ্রের পার্শ্বে শুয়াইয়া নিকটে বসিয়া ছিল। শিশুটি রুগ্ন, শীর্ণ; অজীর্ণতার জন্য যথোচিত বৃদ্ধি নাই, এবং প্রত্যহ শেষ রাত্র হইতে দশ বার ঘণ্টা যকৃত-জনিত জ্বর ভোগ করে। এত স্বাস্থ্যহীনতার মধ্যেও মুখখানি কিন্তু হিমস্নাত ফুলের মত কমনীয়!

পুত্রের বিশীর্ণ মুখের উপর অপলক দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সরমা নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। স্নেহ-শঙ্কা-মথিত হৃদয়ের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা তাহার সকরুণ নেত্রদুটি ভেদ করিয়া অপরূপ মমতায় পুত্রের উপর বিকীর্ণ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সহসা মনে হইল, 'আসিয়াছে ত',—কিন্তু যদি চলিয়া যায়!' দুই ফোঁটা অশ্রু কোথায় আল্‌গা হইয়া ছিল—ঝরিয়া পড়িল! ভয়ার্ত্ত পক্ষী-জননী যেমন ত্রস্তভাবে পক্ষী-শাবককে নিজ পক্ষপুটের মধ্যে ঢাকিয়া লয়, সেইরূপে সরমা নত হইয়া দুই ব্যগ্র বাহুর মধ্যে পুত্রকে বেষ্টিত করিয়া ধরিল। তাহার পর পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া হাততালি দিয়া শিশুকে হাসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; মাতার আদর উৎপীড়নে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শিশু হাসিতে লাগিল।

পুত্রের মুখে হাসি দেখিয়া সরমার মন হইতে অমঙ্গল-চিন্তা অপসৃত হইল; সে সযত্নে দুই হস্তের উপর পুত্রকে তুলিয়া লইয়া নত হইয়া মুখ চুম্বন করিল; তাহার পর বাহুদ্বয় এবং বক্ষের মধ্যে পুত্রকে আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে দুলিতে দুলিতে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, 'ধন, ধন, ধন, ধন, সাত শ' রাজার ধন! এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন!'

হঠাৎ কি মনে হইয়া সরমা পিছন ফিরিয়া দেখিল নিঃশব্দ পদে রমাপদ কখন পশ্চাতে আসিয়া সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া আছে!

পুত্র-স্নেহের এই অকুণ্ঠিত অভিব্যক্তি অপরে দেখিয়াছে সেই লজ্জায় সরমার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সে ধীরে ধীরে শিশুকে শয্যায় শুয়াইয়া দিয়া বলিল, "ভারী অন্যায় কিন্তু!"

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "কি ভারী অন্যায়?"

"এই রকম চোরের মত এসে চুরী করে দেখা।"

রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "চোরের মত না এলে কি চুরী দেখতে পেতাম?"

রমাপদর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সরমা ফিরিয়া চাহিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "চুরী আবার কি দেখলে?"

পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে রমাপদ বলিল, "চুরী নয়? খাসা চুরী! কেমন নিঃশব্দে এই ক্ষুদে চোরটি আমার কাছ থেকে তোমাকে চুরি করে নিচ্ছে!"

এ অভিযোগের কোনো মৌখিক প্রতিবাদ না করিয়া সরমা শুধু একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, 'চুরী নয় বাটপাড়ী! চুরী ত আমাকে তুমিই প্রথমে করেছ!"

"আচ্ছা সরমা, একটা কথা বলবে?"

"কি কথা?"

"তুমি খোকাকে বেশী ভালবাস, না আমাকে বেশী ভালবাস?"

এক মুহূর্ত্তেই সরমা ভাবিয়া দেখিল প্রশ্ন সহজ নহে; তাই কঠিন সমস্যা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সে রমাপদকে পাল্টা প্রশ্ন করিল; বলিল, "তুমি কাকে বেশী ভালবাস, আমাকে, না খোকাকে?" সে আশা করিয়াছিল দুরূহ সমাধানের ভার রমাপদর উপর পড়ায় অতঃপর সে এ আলোচনা পরিত্যাগ করিবে।

কি এ কৌশল একেবারে ব্যর্থ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া অকুণ্ঠিত স্বরে রমাপদ বলিল, "আমি তোমাকে। তুমি ?"

ইহার পর সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল ! একবার সরমা বলিতে চেষ্টা করিল 'আমিও তোমাকে।' কিন্তু দ্বিধায়, লজ্জায়, সন্দেহে সে কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না ; বিমূঢ়ভাবে সে রমাপদর দিকে চহিয়া রহিল। কিন্তু রমাপদ যখন তাহার উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া বলিল, "আমি জানি তুমি খোকাকেই বেশী ভালবাস।' তখন সে আর কোন বিচার বিবেচনা না করিয়া সজোরে বলিতে লাগিল, "কখ্খনো না ! কখ্খনো না ! ভুল কথা !"

"কিন্তু তুমি নিজেই ত' সে কথা বলছিলে।"

"আমি বলছিলাম ?—কখন আমি বল্‌ছিলাম ?" গভীর বিস্ময়ে সরমা ঔৎসুক্যের সহিত রমাপদর দিকে চাহিয়া রহিল।

"একটু আগে ত' তুমি বলছিলে, এ ধন ঘরে না থাকলে তোমার জীবন বৃথা হ'ত ; অবশ্য আমি থাকা সত্ত্বেও !"

ভ্রূকুঞ্চিত পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সরমা হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "ওঃ, তাই বলা হচ্ছে ? কিন্তু সে ত' আর আমার নিজের কথা নয় ; ছড়ার কথা।"

রমাপদ বলিল, "তোমার নিজের কথা না হলেও, তোমার জাতের কথা। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মায়ে ওই ছড়া কেটেছে ; কেউ মুখে, কেউ বা মনে। আসল কথা কি জান সরমা ? এ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ হচ্ছে এই যে মেয়েদের প্রথম দৃষ্টি থাকে ফলের উপর, আর পুরুষদের থাকে মূলের উপর।"

সরমা ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ তুমি অন্যায় কথা বলছ !"

রমাপদ বলিল, "কিচ্ছু অন্যায় বলছিনে, ঠিকই বলছি। এ জন্যে তোমার দুঃখিত বা লজ্জিত হ'বার কোনও কারণ নেই, কারণ তোমার এ হৃদয়-বৃত্তির জন্য যদি কিছু দায়ী হয় ত' সে ভগবানের সৃষ্টিতত্ত্ব। ইতর প্রাণীদের মধ্যে তুমি এই বৃত্তিটা আরো স্পষ্ট এবং স্থূল ভাবে দেখতে পাবে। সন্তান রক্ষণের আগ্রহ অনেক স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে এমন প্রবল ভাবে আছে যে কোনো কোনো সময়ে—"

সৃষ্টিতত্ত্ব এবং প্রাণীতত্ত্বের কাহিনী শেষ করিবার সময় হইল না, গৃহদ্বারে ডাক-ওয়ালা হাঁকিল, "চিঠ্‌ঠি লিজিয়ে !"

রমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া একখানা চিঠি লইয়া পড়িতে পড়িতে ফিরিয়া আসিল।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি এল ?"

পত্র পাঠ করিতে করিতে রমাপদ বলিল, "সু-খবর সরমা ! বুধবারে কাশী থেকে নরেশবাবু আর তোমার দিদি আসছেন।"

দিদি অর্থাৎ সরমার একমাত্র সহোদরা সুকুমারী ; এবং নরেশবাবু সুকুমারীর স্বামী। ইহাঁর পুরা নাম শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিবাস কলিকাতা। কাশীতে বাড়ী আছে ; প্রতি বৎসর শারদীয় পূজার পর চার পাঁচ মাস তথায় অতিবাহিত করেন।

"দিদি আসছেন ! কই চিঠি দেখি।" বলিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে সরমা পত্রের জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মুখ হইতে আনন্দের দীপ্তিটুকু অপসৃত হইল ; চিন্তিতমুখে সে বলিল, "সু-খবর বড় নয় !"

"কেন ?"

মৃদু হাসিয়া সরমা বলিল, "গরীবের বাড়ী বড়লোক কুটুম্ব আসা সুবিধার কথা কি ?"

সরমার দুঃখ অনুভব করিয়া রমাপদ মনের মধ্যে গভীর ভাবে ব্যথিত হইল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "তা হ'ক সরমা, আমাদের সাধ্যমত আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি যাতে না হয় সে বিষয়ে আমাদের একান্ত দৃষ্টি রাখতে হবে। তার পর যা কিছু, তার জন্য আমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। তাঁরা যে আসছেন তা সু-খবর নিশ্চয়ই !"

যুক্তি-তর্কের দ্বারা সু-খবর প্রতিপন্ন করিয়াও সু-খবরের দুশ্চিন্তায় রমাপদ মনে মনে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ধনশালী বিলাসী শ্যালিপতিকে এই জীর্ণ কদর্য্য গৃহে কেমন করিয়া স্থান দিবে তাহা ভাবিয়া তাহার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল না ! দীর্ঘ ব্যবহারে সে গৃহ ক্রমশঃ সহনীয় হইয়া আসিয়াছিল, আজ এই নূতন প্রয়োজনের পরিকল্পনে তাহার দীনতা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ফুটিয়া বাহির হইল। যে দিকেই রমাপদ চাহিয়া দেখিল, দৈন্য এবং দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু পীড়িত হইল। বিবাহের পর কলিকাতায় উপস্থিতি-কালে একবার সে নরেশচন্দ্রের গৃহে নিমন্ত্রিত

হইয়াছিল। সেই সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকার কথা স্মরণ করিয়া তাহার এ বাস-গৃহকে সে-গৃহের গো-শালার উপযুক্তও মনে হইল না। রাত্রে আহারের পর শ্যালিকা সুকুমারী আচমনের জন্য তাহাকে বাথ-রুমের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয় ; সেই বিজলী-দীপোজ্জ্বল, বৃহৎ চিনামাটির বাথ-সংযুক্ত, নানাবিধ সাবান গন্ধদ্রব্য দর্পণ এবং অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য দ্বারা সজ্জিত প্রশস্ত স্নানাগারের কথা মনে পড়িল। তৎস্থলে এই গৃহে সুকুমারীকে স্নান করিতে হইবে অদূরবর্ত্তী উঠানের কলতলায় ; উপরে আচ্ছাদন নাই, চতুর্দ্দিকে যথোচিত আবরণ নাই, তিনদিকের টাটির বেড়া জীর্ণ হইয়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ! নিবিড় অশান্তিতে রমাপদর চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল ! নিজের জন্য সে ততটা বিচলিত হইল না যতটা হইল সরমার কথা ভাবিয়া ! দুই ভগিনীর অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য ! সরমা লজ্জিত হইবে ! সরমা অবনত বোধ করিবে !

চিঠি শেষ করিয়া রমাপদকে ফিরাইয়া দিতে গিয়া রমাপদর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ দেখিয়া সরমা বলিল, "অত ভাবছ কেন ? আমাদের পক্ষে এ ব্যাপার একটা ছোটখাট বিপদেরই মত বটে ; তবে দু-তিন দিনের কথা বই ত নয়, এক রকম করে চলে যাবে।"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদর বিষণ্ণ চক্ষু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল ; সে বলিল, "তা যাবে জানি,—আমি সে কথা তত ভাবছিনে। আমি ভাবছি তোমাকে আমি কি অবস্থায় রেখেছি সেটা তাঁরা বেশ ভাল করেই দেখে যাবেন !"

সরমাও কিছু পূর্ব্বে কতকটা এইরূপই কোনো কথা ভাবিতেছিল ; কিন্তু স্বামীর মুখ হইতে এ কথা শুনিয়া সে নিমেষের মধ্যে সমস্ত দুঃখ এবং লজ্জার চিন্তা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "তা দেখে যান ত' দেখে যাবেন ! সকলেই নিজের নিজের অবস্থায় যেমন আছে ভাল আছে। কিন্তু তা'ও বলি, শুধু বাইরের অবস্থা না দেখে ভিতরের অবস্থাটাও যদি একটু দেখে যান তা হলে তুমি আমাকে যে অবস্থায় রেখেছ তা দেখে আমার জন্যে দুঃখিত হয়ে যাবেন না তা' নিশ্চয় !"

রমাপদ একটু হাসিল ; বলিল, "এ রকম বাইরের অবস্থা দেখলে ভিতরের অবস্থা দলীল-পত্রে লিখে সই করে রেজেষ্ট্রী করে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না সরমা !"

সরমা বলিল, "দলীল-পত্র লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু চোখ থাকলে লোকে দেখতে পাবে। জামাইবাবুর চোখে পড়বে কি না বলতে পারিনে, কিন্তু দিদির চোখ এড়াবে না তা নিশ্চয়। তোমরা পুরুষেরা বাইরে নিয়ে থাক বলে বাইরেটাই তোমরা বেশী করে দেখ ; আমরা ভিতর নিয়ে থাকি, তাই ভিতরের অবস্থাটা আমাদের চোখে সহজে পড়ে।" বলিয়া সরমা হাসিতে লাগিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া সরমা পুনরায় বলিতে লাগিল, "তোমাকে আমি আগে অনেকবার বলেছি, এখনও বলছি, আমাদের এ দরিদ্র অবস্থার জন্যে আমার নিজের কিছুমাত্র কষ্ট নেই। আমার কষ্ট হয় তোমার জন্যে, আর খোকা হওয়ার পর থেকে খোকার জন্যে। মাসে মাসে বাড়ী-ভাড়া থেকে বারো টাকা পাওয়া যাচ্ছে—তা ছাড়া মাঝে মাঝে তুমি কিছু-না-কিছু উপার্জ্জন করছই ; তাতে ত' আমাদের একরকম ভালই চলে যাচ্ছিল। খোকা হওয়ার পর থেকে টাকার কথা একটু একটু মনে হয়। মনে হয় টাকা-কড়ির একটু সুবিধা হলে ওর একটু ভাল খাওয়া-পরা, একটু ভাল সেবা-চিকিৎসা হতে পারে। তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

"তা ছাড়া যে আর কিছু নয় তা' ত যে দিন থেকে তুমি সংসারের ভার নিয়েছ সেই দিন থেকেই দেখতে পাচ্ছি ! কিন্তু আমারও ত' সাধ হয় সরমা !"

সরমা শান্ত মুখে বলিল, "বেশ ত' সময় হলে সে সাধ মিটিয়ো। এখন উপস্থিত দিদিরা যে আসছেন সে বিষয়ে কি করবে বল ?"

তখন, ধনী অতিথিগণের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা কিরূপ এবং কিরূপে হইবে তদ্বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ আরম্ভ হইল। কিরূপ হইবে তাহা কতকটা সহজেই স্থির হইয়া গেল, কারণ রূপ এমন বস্তু যাহা কল্পনার সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে হইবে তাহা লইয়া গোল বাধিল। সরমা বলিল, "ভাড়াটের কাছ থেকে এক মাসের বাড়ী-ভাড়া আগাম নাও না ?"

রমাপদ বলিল, "ক্ষেপেছ তুমি ? মাসকাবারের পর আধা-মাস দু-বেলা তাগাদা করে যার কাছে ভাড়া পাওয়া যায় না, সে আগাম ভাড়া দেবে ? তার চেয়ে না হয় রহিম বক্স কাবুলীর কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা ধার নেওয়া যাক্।"

সরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আবার সেই টাকায় দু-আনা স্থদে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া! না, সে কিছুতেই হবে না। সেবার কুড়ি টাকা ধার নিয়ে কত টাকা স্থদ দিতে হয়েছিল তা মনে আছে?"

রমাপদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "মনে আছে; কিন্তু এ কথাও মনে আছে যে, সে টাকা না হলে তোমাকে হয় ত' বাঁচাতেই পারতাম না। সে টাকার স্থদ দিয়ে আমার মনে কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি!"

প্রসবের পর সরমার প্রবল জ্বর হওয়ায় চিকিৎসার ব্যয়ের জন্য রমাপদ রহিমবক্স কাবুলীর নিকট কুড়ি টাকা ঋণ করিয়াছিল।

সরমা সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি জান্‌তে পারলে কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে কখনও তোমাকে টাকা ধার নিতে দিতাম না। একবার কোনো রকমে সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আবার কেউ সাধ করে তাতে পা দেয়? তার চেয়ে মুদীর দোকানে বাকি রেখে যে-কদিন তাঁরা থাকেন চালিয়ে নোব, সে বরং ভাল।"

রমাপদ বলিল, "শুধু মুদীর দোকানই ত' নয় সরমা! কিছু কাপড় সেমিজও ত কিনতে হবে।"

"কাপড় সেমিজ কি হবে?"

"কাপড় সেমিজ না কিনলে কি করে তাদের সামনে তুমি দাঁড়াবে এই ছেঁড়া আর তালি নিয়ে?"

অবলীলা ভরে সরমা বলিল, "সে আমি বেশ দাঁড়াব, তুমি কিছুমাত্র ভাবিত হয়ো না। কিন্তু কাবুলীওয়ালার কাছ থেকে তুমি কিছুতেই টাকা ধার করতে পাবে না! কিছুতেই না, বুঝ্‌লে?"

চিন্তিতমুখে রমাপদ বলিল, "তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু কিছু টাকার যোগাড় ত' করা চাই; তা কেমন করে হয়?"

রমাপদর উদ্বেগ দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল; বলিল, "আচ্ছা, এ এমনই কি গুরুতর ব্যাপার যার জন্যে তুমি এতটা ভাব্‌তে লাগলে? টাকার যোগাড় হয়, তোমার কুটুম্বদের তুমি পোলাও কালিয়া খাইয়ো; আর টাকার যোগাড় না হয় ত' আমার কুটুম্বদের আমি ডাল ভাত খাওয়াব। কেমন, তা হলে হবে ত?"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদও হাসিতে লাগিল; বলিল, "তা হলে একরকম মন্দ হয় না; তবে ভয় হয় তোমার কুটুম্ব ডাল ভাত খেয়ে আমার নিন্দে না করে।"

সরমা সহাস্যমুখে বলিল, "তোমার কুটুম্ব পোলাও কালিয়া খেয়ে আমার স্থখ্যাতি করতে পারে সে ভয়ও ত' আছে!"

"হ্যাঁ, তা'ও ত' আছে! এ দেখছি উভয় সঙ্কট!" বলিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল।

[১৪]

রবিবারের অপরাহ্ন। ভাগলপুরের প্রধান বাণিজ্য-পল্লী স্থজাগঞ্জে "ভাগলপুর সিল্ক ষ্টোরের" প্রসিদ্ধ দোকান জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ক্রেতা, বিক্রেতা, তন্তুবায়, দালাল, দোকানদার, চালানদার, সকলেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য লইয়া ব্যস্ত; দোকানের মধ্যস্থলে বসিয়া ব্যবসায়ের অংশীদার এবং পরিচালক শ্রীযুক্ত তারাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে উচ্চ স্বরে কর্ম্মচারিগণকে খরিদ-বিক্রয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। আগন্তুকদের মধ্যে কেহ অনুযোগ করিতেছে, কেহ অনুনয় করিতেছে, কেহ আদান করিতেছে, কেহ প্রদান করিতেছে। তারাচরণ সহাস্যমুখের স্থমিষ্ট বাক্যে সকলকেই সন্তুষ্ট করিতেছেন।

রমাপদ ধীরে ধীরে দোকানে প্রবেশ করিয়া ভীড় দেখিয়া দ্বারের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইল।

তারাচরণ দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এস রমাপদ, দাঁড়ালে কেন? এই দিকটায় এসে বোস।"

একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া রমাপদ বলিল, "অন্য সময়ে আসব; এখন আপনি কাজের ভীড়ে রয়েছেন।"

"তোমাদের পাঁচজনকে নিয়েই ত' ভাই কাজের ভীড়। এস, এস, বোস। আমারও তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

আর ইতস্ততঃ না করিয়া রমাপদ তারাচরণের পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল।

একজন ক্রেতার সহিত অসমাপ্ত কথা শেষ করিয়া রমাপদর দিকে ফিরিয়া তারাচরণ কহিলেন, "এবার বল কি খবর; তোমার কথাই আগে শুনি।"

দূরদেশের গ্রাহকবর্গের সহিত পত্র-ব্যবহারের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে তারাচরণ একজন লোক খুঁজিতেছিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে দোকানে আসিয়া প্রয়োজনীয় চিঠি-পত্র লিখিয়া দিতে হইবে। অন্যত্র অপর কাজ করিয়াও এ কাজ করা চলে বলিয়া মাসিক পারিশ্রমিক মাত্র পনের টাকা। তারাচরণ রমাপদকে এ কাজের জন্য একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু বেতন অল্প বলিয়া তখন রমাপদ স্বীকৃত হয় নাই। রমাপদ জানাইল এখন সে সম্মত আছে; তবে বিশেষ কোনও প্রয়োজনের জন্য দুই মাসের বেতন সে অগ্রিম চাহে।

শুনিয়া তারাচরণ কহিলেন, "সে কাজে ত' একজন লোক বাহাল হয়েছে, অকারণে তাকে ত' ছাড়াতে পারিনে। তবে আমি এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা তোমার করে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে অন্য একটা কথা তোমাকে জানাতে চাই। আমাদের কারখানার সিল্ক প্রচার করবার জন্যে আমি একজন উপযুক্ত লোককে বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং অন্যান্য অঞ্চলে পাঠাতে চাই। উপস্থিত বেতন মাসিক চল্লিশ টাকা দোব, রাহাখরচ আর খাইখরচ অবশ্য স্বতন্ত্র। তা' ছাড়া সে নিজের চেষ্টায় আর পরিশ্রমে যে কাজ করবে তার লাভের তিন আনা অংশ দোব। আমার মনে হয় এ নিতান্ত মন্দ কথা নয়। তুমি রাজী আছ?"

একটু চিন্তা করিয়া রমাপদ জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দ কথা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কত দিন বাইরে থাকৃতে হবে?"

"যতদিন বাইরে থাকা লাভজনক হবে ততদিন। উপস্থিত প্রথমবার ত' তিন মাসের কম নয়।"

রমাপদ বলিল, "আপনি ত' জানেন আমার বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষমানুষ কেউ নাই; এত দিন বাইরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না তাই ভাবছি।"

রমাপদর কথা শুনিয়া তারাচরণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন—তাহার পর ঈষৎ প্রবলভাবে বলিলেন, "এ কিন্তু অন্যায় রমাপদ! তোমাদের মত লেখাপড়া-জানা যুবকেরা যদি (রাগ ক'রো না) এমনি আঁচল-বাঁধা হয়ে বাড়ী বসে থাকে, তিন মাসের জন্যে বাইরে যেতেও ভয় পায়, তা হলে তোমাদের নিজের উন্নতিই বা কেমন করে হয়, আর দেশের উন্নতিই বা কেমন করে হয়! বেরিয়ে পড় রমাপদ, বেরিয়ে পড়! বাধা-বন্ধন কেটে-কুটে বেরিয়ে পড়! দূর দূরান্তরে দেশ-দেশান্তরে চলে যাও! দেখবে তাতে বাড়ীর অকল্যাণ হবে না, কল্যাণই হবে।"

একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তারাচরণ বলিলেন, "বউমাকে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে রমাপদ বলিল, "সে হয় না;—সেখানে বিমাতার উপদ্রব।"

"তোমার বাঁধন তা হলে শক্ত দেখছি!" বলিয়া তারাচরণ মৃদু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা, উপস্থিত তোমার অন্য একটা ব্যবস্থা বোধ হয় আমি করতে পারি। আমার একটি বিহারী বন্ধু আছেন, নাম দেওকীলাল চৌধুরী—ভারী চমৎকার লোক—সাধুপ্রকৃতি। তাঁর একটি ছেলে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা পর্য্যন্ত একজন শিক্ষকের জন্য তিনি আমাকে বলছিলেন। উপযুক্ত লোক হলে তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজী আছেন। আমি তোমার কথা বলেছি। তুমি রাজী আছ কি?"

উৎফুল্লমুখে রমাপদ বলিল, "নিশ্চয়ই আছি!"

"তা হলে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি এখনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।" বলিয়া তারাচরণ একটা চিঠি লিখিয়া রমাপদর হস্তে দিয়া দেওকীলালের গৃহের সন্ধান বুঝাইয়া দিলেন।

রমাপদ কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া তারাচরণ বলিলেন, "এক মাসের বেতন আজই তোমাকে আগাম দিতে আমি লিখে দিয়েছি—তাতে হবে ত'?"

কৃতজ্ঞতায় এবং আনন্দে রমাপদর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; সে বলিল, "হবে। আপনি যে আমার কতটা উপকার করলেন তা আর আমি কি বলব!"

তারাচরণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কে কার উপকার করে রমাপদ! একমাত্র গুরুকৃপা ভিন্ন কেউ কিছু করতে পারে না। যাও, আর দেরী ক'রো না।"

দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রমাপদ তারাচরণের নির্দ্দেশ অনুসারে অনতিবিলম্বে দেওকীলালের গৃহ-সমীপে উপস্থিত হইল। পথে কয়েকজন বিহারী বালক-বালিকা খেলা করিতেছিল। রমাপদ তাহাদিগকে দেওকীলাল চৌধুরীর গৃহের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

এই আকস্মিক ব্যাঘাতে খেলা বন্ধ হইয়া গেল। একটি পনের যোল বৎসরের বালক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "চৌধ্‌রীজীকা মক্—কান? উয়ো কিয়া হ্যায়, পীপরকে পেড়্‌কে পাশ?"

রমাপদ চাহিয়া দেখিল অদূরে পথপার্শ্বে একটি অশ্বথ বৃক্ষ রহিয়াছে; তাহার উত্তরে একটি পাকা বাড়ী। গৃহ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল ভিতর হইতে সদর দরজা বন্ধ। কৌতূহলী বালক-বালিকার দলও তাহার পিছনে পিছনে আসিয়া জুটিয়াছিল।

রমাপদ তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এহি মকান?"

পূর্ব্বোক্ত বালক কহিল, "হাঁ, পুকারিয়ে জোর সে!"

রমাপদ উচ্চ স্বরে ডাকিল, "চৌধুরী জী হৈঁ?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

বালকেরা বলিল, "আউর্ জোরসে পুকারিয়ে!"

রমাপদ উচ্চ কণ্ঠে দুই তিন বার ডাকিল—কিন্তু কোনো ফল হইল না। না কেহ উত্তর দিল, না কেহ দরজা খুলিল। বালক বালিকার দল পুলকিত হইয়া হাসিতে লাগিল এবং পরস্পরের মধ্যে অনুচ্চস্বরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

রমাপদর সন্দেহ হইল তাহারা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে। সে ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে একটি বালককে বলিল "ঠীক বোলো, ইয়হ্ দেওকীলাল চৌধুরী জীকা মকান হৈ য়া নহি!"

"জরুর হ্যায়! আপ তো জোরসে পুকারতে হি নহি।"

এ অভিযোগ অসমীচীন বোধ করিলেও অগত্যা রমাপদ আরও উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, "দেওকীলাল বাবু ঘর মে হৈঁ?"

কেহ উত্তর দিল না, কিন্তু এবার দ্বার-পার্শ্বের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং তাহা দিয়া ঘরের ভিতর হইতে দশ এগার বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে পথে বালক-বালিকা-পরিবেষ্টিত রমাপদকে দেখিয়া যথেষ্ট কৌতুক উপভোগ করিতে লাগিল।

রমাপদ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেওকীলাল বাবু হৈঁ?"

প্রশ্নের উত্তর দিবার কিছুমাত্র উপক্রম না দেখাইয়া বালিকা রমাপদর দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

পথের ছেলেদের মধ্যে একজন বলিল, "দেওকী বাবু উ কা হৈঁ, খটিয়া পর বৈঠল?"

রমাপদ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কক্ষের ভিতর খাটিয়ার উপর বসিয়া একটি গৌরবর্ণ বৃদ্ধ কৌতুকোদ্ভাসিত মুখে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল! একবার ভাবিল দুই চারিটা কটুবাক্য বলিয়া প্রস্থান করে; কিন্তু মনে পড়িল গরজ তাহারই! তাহা ছাড়া, ব্যাপারটা যে প্রতারণা নহে, একটা কোনো রহস্য ইহার সহিত জড়িত আছে, এ কথা তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছিল।

এই কৌতুক অভিনয়ের উপভোক্তা কেবলমাত্র পথের বালক-বালিকার দল এবং কক্ষের বৃদ্ধ এবং বালিকাই ছিল না। পথের অপর দিকের গৃহ-গবাক্ষ দিয়া একদল রমণী সোৎসুক নেত্রে এই প্রহসন দেখিতেছিল। তন্মধ্যে একটি যুবতী রমাপদর দুর্দ্দশায় দয়াপরবশ হইয়া উচ্চাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আরে শিউপরকাশ, বাবুকো বহুৎ দিক্ মৎ কর্—বতা দে, বতা দে!"

শিউপর্‌কাশ সে আদেশ অমান্য করিল না; বলিল, "বাবু, উপ্‌পর্ দেখিয়ে।"

রমাপদর ধৈর্য্য বিচ্যুতির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল; সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কিয়া উপ্‌পর্ দেখেঁ!" কিন্তু হঠাৎ সদর দ্বারের উপর দেওয়ালে দৃষ্টি পড়ায় সে সকৌতূহলে দেখিল বড় বড় দেবনাগর অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

সীতারাম বোলে, তব কিবাড়ী খুলে।

পথ দিয়া একজন বিহারী ভদ্রলোক যাইতেছিলেন; অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া তিনি রমাপদকে বলিলেন, "বাবুজী, সীতারাম না বললে এ বাড়ীর দরজা খোলে না। আপনি একবার সীতারাম বলুন না, দরজা তখনি খুলে যাবে।"

এত কাণ্ডর পর এ অনুজ্ঞা পালন করিতে রমাপদর মনে ক্রোধ, লজ্জা, বিরক্তি, সঙ্কোচ, সমস্ত এক সঙ্গে আসিয়া দেখা দিল;—কিন্তু তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন এ সকল বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "সীতারাম!" রমাপদ মনে মনে হাসিয়া বলিল, "গরজ বড় বালাই!"

নিমেষের মধ্যে ঘরের ভিতরের বালিকাটি দ্বার উন্মুক্ত করিল, এবং সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দেওকীলাল হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ছমা কিজিয়ে বাবুজী! আপকো বহুৎ কষ্ট দিয়া। পরন্তু নাম জী ভী তো হো গিয়া; ইৎনাহি আনন্দ্ হ্যায়! অব্ আজ্ঞা দিজিয়ে আপ্‌কী কৌন্‌সী সেবা করঁ।"

পথের বালক-বালিকার দল তিনবার সজোরে সীত্‌তা-রাম বলিয়া মহোল্লাসে প্রস্থান করিল।

ক্রোধ এবং বিরক্তি অনেকটা অন্তর্হিত হইলেও তখনও মনের যা বিচিত্র মিশ্র অবস্থা ছিল তাহাতে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া রমাপদ পকেট হইতে তারাচরণের চিঠি-খানি বাহির করিয়া দেওকীলালের হস্তে দিল।

চিঠি পড়িয়া বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; বলিলেন, "তব্ তো আউর্ আনন্দ হুয়া! হররোজ আপকো মজকুরন্ এক বারে সীতারাম বোলনা পড়ে গা!" বলিয়া উচ্চ স্বরে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "পচ্চীশ্ রূপয়ে লাও।"

নরেশচন্দ্র এবং সুকুমারী প্রস্থান করিলে যাহাতে অধ্যাপনা আরম্ভ হয় সেই আন্দাজে রমাপদ কয়েক দিন পিছাইয়া লইল।

টাকা পাইয়া রমাপদ একটা রসীদ লিখিয়া দিবার কথা তুলিল।

দেওকীলাল হাসিতে লাগিলেন, "নহী, নহী বাবুজী, রসীদ মৎ লিখিয়ে। জিৎনী লিখাপঢ়ি—জিৎনে দস্তাবেজ—উৎনাহী বখেড়া!"

সন্ধ্যার পর রান্না চড়াইয়া সরমা তাহার পুত্রকে ঘুম পাড়াইতেছিল, রমাপদ আসিয়া তাহার নিকট একটা বাণ্ডিল ফেলিয়া দিল।

বাণ্ডিলটা হাত দিয়া নাড়িয়া সরমা বলিল, "এ এত কি আনলে?"

"কিছু জামা কাপড়।"

একটু ব্যগ্রভাবে সরমা বলিল, "রহিম বক্সের কাছে ধার করে না ত?"

উৎফুল্ল মুখে রমাপদ বলিল, "এবার আর রহিম নয় সরমা—এবার স্বয়ং রাম!" বলিয়া আদ্যোপান্ত 'সীতারাম' কাহিনী সরমাকে শুনাইল।

শুনিয়া সরমা হাসিতে লাগিল। তাহার পর প্রশান্ত-মুখে বলিল, "এইবার দেখো, সীতারাম তোমার অর্থের দরজা খুলে দেবেন!"

রমাপদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, আলিবাবা সীসেমের মত!"

পরদিন রমাপদ রাজমিস্ত্রী লাগাইয়া সমস্ত বাড়ী চূণকাম আরম্ভ করিয়া দিল, মজুর দিয়া জঙ্গল কাটাইল, বিশুয়ার সাহায্যে আসবাবপত্র যথাসম্ভব ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল। দোকানে গিয়া সাবান, তোয়ালে, সুগন্ধ তৈল, মাজন প্রভৃতি কিনিয়া আনিল। চটি মেরামত করাইল, শেওলা ঘষিয়া উঠাইল, এবং আরো কি করিতে হইবে সে জন্য সরমাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। (ক্রমশঃ)

দরদী

বন্দে আলী মিয়া

এই রোদেরি বিদায় চাওয়া দীর্ঘ রাঙা মায়া
এতক্ষণে মোদের আঙিনাতে
জট্‌লা করে দাঁড়িয়ে গেচে—ফেল্‌চে তাদের ছায়া
দখিণ মুখী পূবদুয়ারী ছাতে।
পুকুর পাড়ে যেখানটাতে পতিত জমি আছে
কেওড়া ঘেরা সারি কয়েক বাঁশের ঝোপের কাছে,
মা বুঝি মোর একলা বসে বিকাল এমন ক্ষণে
আমার কথা নানান্ ভাবে ভাব্‌চে আপন মনে।
হয়তো রোদে পিঠ পুড়িচে মাথায় আঁচল নাই
একের বাদে ফাঁকা সকল ঠাঁই।
একটি ছেলে তাহারে তাও বিদেশে দিয়ে হায়
দিবস-রাতি কাট্‌তে নাহি চায়।

চলে এলাম বিদায় লয়ে চোকের ভেজা পাতায়
কুয়াশ-ঢাকা শীতের সকাল বেলা—
মা' যে আমার গাছের আড়ে দাঁড়িয়ে তখন ঠায়
কাঁদন চেপে কেবল একেলা।
আজ বিদেশে পড়াশুনায় সকল কাজের মাঝে,
কর্ণপুটে স্নেহভরা ডাকটি তাহার বাজে,
করুণ অতি বেদনা-মাখা ভুল্‌তে সে মুখ নারি
জননী মোর দেবীর দেবী—অমৃত ক্ষীর-ঝারি।
হয় গো মনে সকল ফেলি পালাই তাহার বুকে
আঁচল কোণে রাখি আমায় লুকে,
ওমা তোমার দুষ্টু ছেলে শান্ত এখন বড়ো,
একলা কাঁদি ক্ষমা আমায় করো।

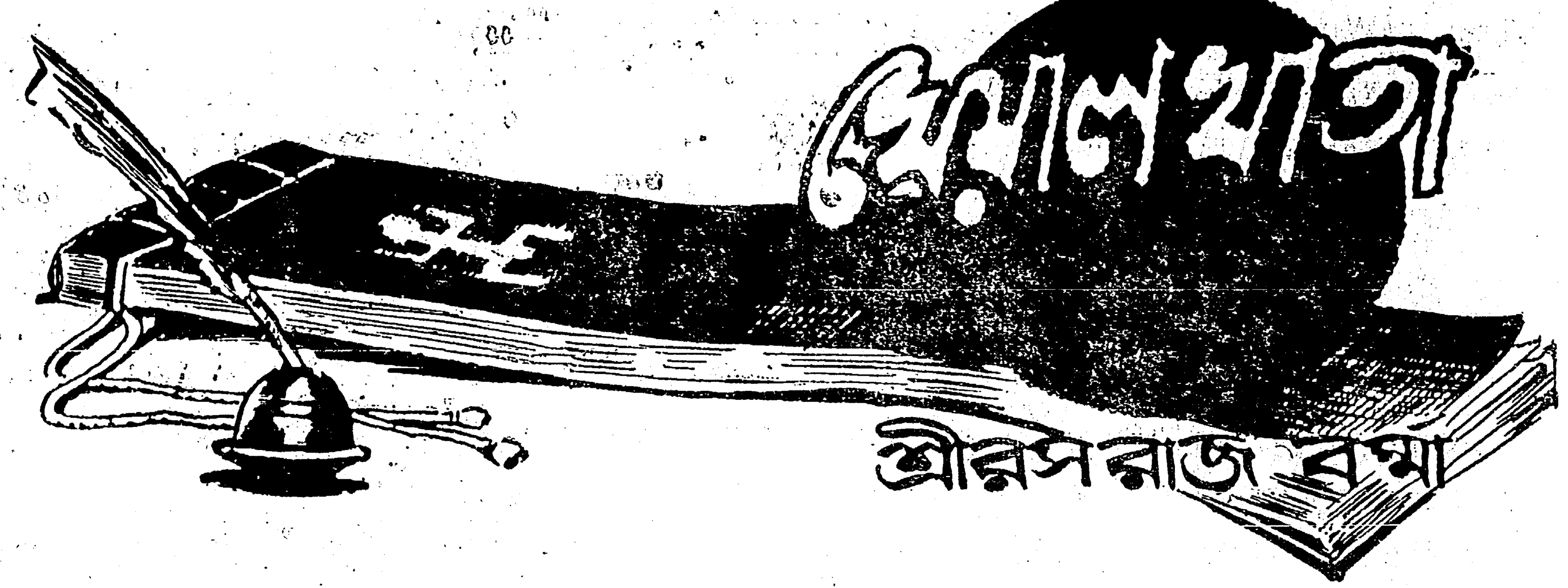

চরকার প্রভুত্ব

সেদিন এক খবরের কাগজে পড়লাম, একজন লিখেছেন—

"এত জিনিষ থাকৃতে চরকাকে সকলের উচ্চে স্থান দেওয়া হো'ল কেন? চরকা প্রত্যক্ষভাবে যেমন বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করে, তেমনি ঢেঁকি আমাদের ও যাঁতা পশ্চিমের লোকের অন্ন-সমস্যার সমাধান করে থাকে। অন্ন-সমস্যাই মানুষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা তার পরে। সর্ব্বোচ্চে স্থান দিতে হোলে ঢেঁকিকে বা যাঁতাকেই দেওয়া উচিত— চরকাকে নয়!"

বিষয়টা নিয়ে চিন্তা না করে থাকৃতে পারলাম না।

* * * * *

অন্ন-সমস্যাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। আগে যখন বাঙ্গলার প্রতি ঘরেই ঢেঁকি ছিল, তখন আমাদের অন্নের কোনই অভাব ছিল না। এখন আমরা সেই ঢেঁকির আদর না করেই অন্নকষ্টে পড়েছি। আমরা যদি নিজেদের বাঁচাতে চাই, স্বরাজ লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের আশু কর্ত্তব্য প্রতি ঘরে ঢেঁকির প্রচলন করা। আমরা অনর্থক দ্বিগুণ দাম দিয়ে চাল কিনছি, অথচ অর্দ্ধেক দামে ধান কিন্‌তে পাওয়া যায়। বাড়ীতে ঢেঁকিতে সেই ধান একটু পরিশ্রম করে ভেঙ্গে নিলেই আমাদের প্রধান খরচ—চাল কেনার খরচ—অর্দ্ধেক কমে যায়। আসল খরচটা কমে সারতে পারলে, কাপড় বা অন্য জিনিসের জন্য খরচ একটু বেশী হলেও বড় এসে-যায় না। কথা উঠ্‌তে পারে—ঢেঁকি হোল, ধানও এলো, এখন ভাঙ্গবে কে? আমি বলি, সকলেই ভাঙ্গবে! অনেক দিন অভ্যাসটা ছেড়েছি বলে' প্রথম একটু কষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু সে জন্য পিছোলে চল্‌বে না। অন্ন-সমস্যার সমাধান করতে হলে, তথা স্বরাজের পথ পরিষ্কার করতে হলে, ধান ভাঙ্গা চাই-ই। প্রত্যেক দিন পনের মিনিট করে ধান ভাঙ্গলেই চল্‌তে পারে, তাতেই যে চাল তৈরী হবে, তা এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট।

সেকালে বাঙ্গালীর মেয়েরা সকলেই ধান ভাঙ্গতে পার্‌ত, তাদের সকলের স্বাস্থ্যও সেজন্য খুব ভাল ছিল। আজকাল যেমন বাঙ্গলার সর্ব্বত্র নারী-নির্য্যাতন ঘট্‌ছে, তখনকার দিনে তা ঘটবার সম্ভাবনাই ছিল না। কথায় আছে "লাথির ঢেঁকি কি চড়ে ওঠে?"—ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গতে রীতিমত লাথির চালনা করতে হো'ত। ধানভাঙ্গা পায়ের অভ্যস্ত লাথির ভয়ে দুর্ব্বৃত্তরা নারীদের কাছে অগ্রসর হতেই সাহস করত না। এখন যদি ঘরে ঘরে আবার ঢেঁকির প্রচলন করা যায়, তাহলে নারী-নির্য্যাতনের সম্ভাবনাও দূর হয়ে যাবে।

সেকালে কেবল নারীরাই ধান ভাঙ্গত, এখন কিন্তু নার পুরুষ দুজনকেই ধান ভাঙ্গতে হবে। কারণ দুজনেরই স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়া সমান দরকার। আজকাল প্রায়ই বিদেশী লোকের জোর লাথিতে আমাদের দেশের লোকের পীলে ফাট্‌তে দেখা যায়। আমরা যদি ধান ভেঙ্গে লাথির জোর করে নিতে পারি, তাহলে তারা উণ্টা লাথি খাবার ভ আর ও-কাজটা করতে সাহস পাবে না।

বাঙ্গালী নারীরা ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গছেন

ঢেঁকিতে অন্ন-সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য লাভ ত হবেই, অধিকন্তু ঢেঁকি গৃহস্থকে চোর, ডাকাত, দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকেও রক্ষা করবে! বীর আশানন্দ ঢেঁকি যে কি করে ঢেঁকির সাহায্যে ডাকাত তাড়িয়েছিলেন, সে কথা আমাদের দেশের কারও আর অজানা নেই।

ঢেঁকি থাকৃলে অর্থাৎ অন্ন-সমস্যা না থাকৃলে, ভগবানকে পাওয়াও সহজ হয়ে যাবে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, দেবর্ষি নারদ ঢেঁকিতে চড়ে ত্রিভুবনে হরিগুণ গান করে বেড়াতেন। এত বাহন থাকৃতে তিনি ঢেঁকিতে চড়তে গেলেন কেন? এটা রূপক মাত্র। আসল অর্থ এই যে, তাঁর ঘরে যথেষ্ট অন্ন ছিল, তাঁকে সে জন্য ভাবনা করতে হোত না, তিনি নির্ভাবনাতেই ভগবানের নাম করে বেড়াতেন। আমরাও যদি ঢেঁকিকে বাহন করতে, অর্থাৎ ঢেঁকির সাহায্যে অন্ন-সমস্যার সমাধান করতে পারি, তা হলে আমরা নির্ভাবনায় দেবর্ষি নারদের মতই হরিগুণ গান করে সময় কাটাতে পারবো।

সকল দিক দিয়ে ভাল করে বিবেচনা করে দেখ্‌লে, ঢেঁকিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া এবং যাতে ঘরে ঘরে তার প্রচলন হয় সেজন্য সকলের প্রাণপণ চেষ্টা করা অবশ্য করা কর্ত্তব্য।

আমাদের কাছে যেমন ঢেঁকি, তেমনি পশ্চিমে যাঁতা। যাঁতাতেই গম ভেঙ্গে পশ্চিমের লোক অন্ন-সমস্যার সমাধান করে থাকে। আগে সেদিকে ঘরে ঘরে যাঁতা ছিল, লোকে অর্দ্ধেক খরচেই ইচ্ছামত আটা ময়দা তৈরী করে নিত। এখনকার মত দ্বিগুণ দাম দিয়ে সাদা মাটি বা নরম পাথর গুঁড়া মিশান অখাদ্য কিনে খেতে হোত না। যাঁতার আদর কমেই পশ্চিমের লোকদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাদের এখন নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে হোলে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে স্বরাজের দিকে সমানভাবে অগ্রসর হতে হোলে, অচিরেই ঘরে ঘরে যাঁতার প্রচলন করা উচিত।

মেয়ে পুরুষ উভয়েরই প্রতিদিন পনের মিনিট করে

যাঁতা ঘোরান উচিত, তাতে নিজের খোরাকের মত গম ভাঙ্গা ত হবেই এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ও হাতে খুব জোর হবে। হাতের জোর হলেই যাঁতাও ক্রমশঃ খুব জোরে ঘুরতে থাকবে। "যাঁতা ঘোরে হাতের জোরে" এই সার কথাটার সত্য উপলব্ধি করতে তখন আর কারও কষ্ট হবে না। যাঁতা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখ, দারিদ্র্য

দেবর্ষি নারদ ঢেঁকি চড়ে শূন্যপথ দিয়ে যাচ্ছেন

ও দুর্ব্বলতা দূর হয়ে গিয়ে লোকে নূতন জীবন লাভ করবে।

পশ্চিমে যাঁতাই যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারী এবং ঘরে ঘরে এখনই যে যাঁতার প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক, সে বিষয়ে কোনই দ্বিমত থাকতে পারে না।

চরকা বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করে বটে, কিন্তু সেটা অন্ন-সমস্যার সমাধানের পরের কথা। অন্ন-সমস্যার সমাধান করতে পারলেই, ক্রমশঃ অনেক অন্য সমস্যার সমাধান আপনা হতেই হয়ে যাবে। পনের মিনিট করে চরকা কাটলে খানিকটা সূতা তৈরী হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে ব্যায়াম বা হাতের জোর কিছুই হবে না। আমরা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি; আমাদের এখন উচিত, যাতে আমরা স্বাস্থ্যবান ও সবল হতে পারি সেই রকম একটা কিছু অবলম্বন করা। ঢেঁকি বা যাঁতার সাহায্যেই এই উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে! চরকা কাটা যেন নিষ্কর্ম্মার বা দুর্ব্বলের (যার দ্বারা ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গা বা যাঁতায় গম পেশা সম্ভব নয়) কাজ। ওটাতো পুরুষের উপযোগী কাজই নয়, সেকালে মেয়েরাই অবসর সময়ে একটু আধটু করতো। কথায় আছে, "হয় ছেলে ধর, নয় চরকা কাট্!"—অর্থাৎ অবসর সময়ে ছেলেকে ধরতে বা চরকা কাটতে হোত।

সেকালে যারা অন্য কিছু কাজ করতে পারতো না, তারাই নেহাৎ চুপ করে বসে না থেকে সূতা কাট্তো। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে তাদের শরীরও ক্রমশঃ সূতার মত পাকিয়ে যেত। অন্ন-সমস্যার সমাধান না করতে পেরে আমরা ত ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পড়েছি, এর ওপর যদি আমরা আবার চরকা ধরি, তা হলে সেকালের কাটুনিদের মতই আমাদের শরীর পাকিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ স্বরাজের আশাও আকাশকুসুম হয়ে দাঁড়াবে।

ঢেঁকি ঘুরিয়ে বা যাঁতার পাথর দুখানা ছুড়ে মেরে সেকালে যে কত যায়গায় দুর্ব্বৃত্তদের তাড়ান হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। চরকার দ্বারা কিন্তু এরকম কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। ছুড়ে মারা ত দূরের কথা, অসাবধানে

ধাক্কা লাগ্লে বা পড়ে গেলেই চরকার টুক্‌রো কাঠগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তখন সেগুলো জ্বালানি করা ছাড়া আর কোন কাজেই আসে না।

মাথার গোল ঘটে না থাকলে লোকে চরকাকে কিছুতেই ঢেঁকি বা যাঁতার ওপরে স্থান দিতে পারে না!

* * * * *

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সব সরল হয়ে এসেছে। কাল যা স্থির করেছিলাম, সে সবই ভুল। ঢেঁকি বা যাঁতাকে কিছুতেই উচ্চে স্থান দেওয়া যেতে পারে না। চরকাকে যে সকলের উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে, সেইটাই ঠিক হয়েছে।

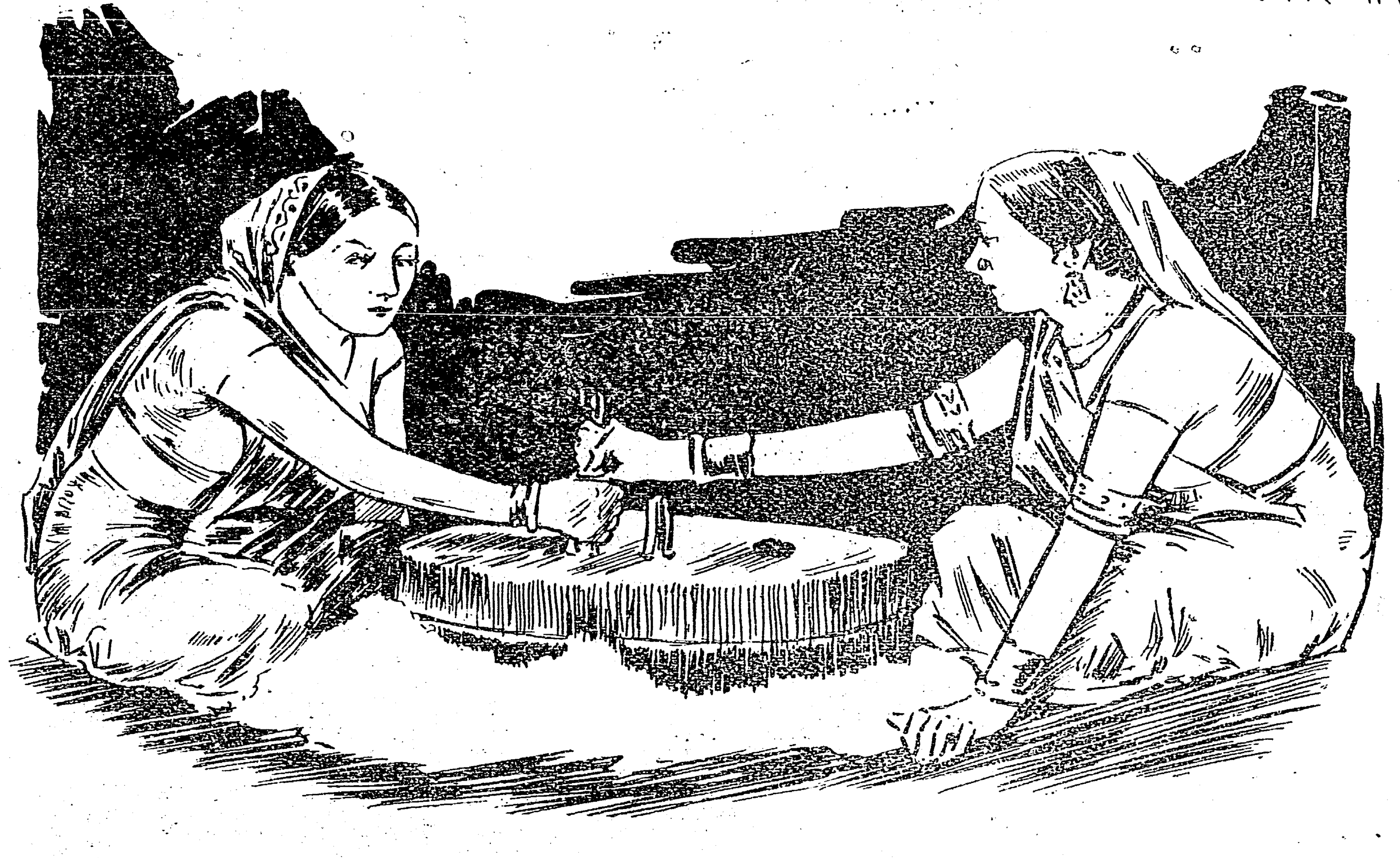

পশ্চিমা নারীরা যাঁতা ঘোরাচ্ছেন

অসভ্যতার যুগে অন্ন-সমস্যাই প্রধান সমস্যা থাকলেও এখন এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে তা আর নেই। বস্ত্র-সমস্যাই এখন সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করতে সভ্য মানুষে একবারে অস্থির হয়ে পড়েছে। আগেকার যুগে বস্ত্র না পেলেও মানুষে কিছু অসুবিধা ভোগ করতো না, তখন পেট ভরে খেতে পেলেই সকলে সন্তুষ্ট থাক্‌তো। এখনকার দিনে অন্ন না জুট্‌লেও বস্ত্র চাই-ই। বস্ত্রই সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। যে জাত যত বেশী বস্ত্র পরিধান করে, সেই জাত তত বেশী সভ্য। পেটে অন্ন পড়েছে কি না সে কেহই দেখ্‌তে যায় না, কিন্তু অঙ্গের বস্ত্রের দিকে সকলেরই প্রখর দৃষ্টি থাকে। এখনকার দিনে আমাদের যতই বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হবে, ততই আমরা সভ্যতার পথে, তথা স্বরাজের পথে অগ্রসর হতে থাক্‌বো। চরকাই আমাদের অগ্রসর করে দেবে, ঢেঁকি বা যাঁতা কিছুতেই এ কাজ সাধন করতে পারবে না।

আমাদের দুর্ব্বল শরীর ক্রমশঃ আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়লেও স্বরাজ পাবার কোন বাধা হবে না। কারণ, চরকা ঘোরাতে কোন রকম বলের দরকার করে না। শরীরে ম্যালেরিয়া, অম্বল বা যক্ষ্মা যে কোন রোগই থাক না কেন লোকে বসে বসে স্বচ্ছন্দে চরকা কাট্‌তে পারবে। বিশেষতঃ অনাহারে উপবাসে মাথাটা হাল্‌কা হয়ে থাক্‌লে, হাতে সূতাও খুব সূক্ষ্ম হয়ে বের হবে! দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে চরকা যেন ভগবানের দেওয়া অমোঘ অস্ত্র—এই অস্ত্রের জোরেই জয় অবশ্যম্ভাবী।

ঢেঁকি বা যাঁতা কোনটিকেই উচ্চে স্থান দেওয়া, অথবা দুর্ব্বল অধীন জাতের মধ্যে তাদের প্রচলন হওয়া কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। দুর্ব্বল শরীরে ঢেঁকি বা যাঁতার ব্যবহার আরম্ভ কর্‌লেই আমরা ক্রমশঃ আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়বো।

বিশেষতঃ একালের নারীরা ও দুটার প্রচলনের কথা শুনেই মূর্চ্ছা যেতে পারেন, এ রকম সম্ভাবনাও আছে।

ঢেঁকি বা যাঁতা প্রচলনের চেষ্টায় আরও বিপদ আছে। আমরা অধীন জাত, ও দুটো মারাত্মক জিনিষ চালনা করতে গেলে হয় ত বা অস্ত্র আইনের আমলে পড়ে যাবো। কারণ, ওদের সাহায্যে আত্মরক্ষা বা যুদ্ধ যে করা যেতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। চরকাতে কিন্তু সে ভয় কিছুই নেই, যত ইচ্ছা নাড়াচাড়া কর অস্ত্র আইন কাছ দিয়ে আগাতেও পারবে না।

চরকার আরও সুবিধা যে তাকে বড় মাঝারি, ছোট বা ফোল্ডিং নানা আকারের করা যায়। পকেট্ এবং ট্যাক্ চরকাও যে দুদিন পরে দেখ্‌তে পাবো এ রকম আশা খুবই আছে। কিন্তু ঢেঁকি বা যাঁতার বেলা এ-সব একেবারেই অসম্ভব। নানারকম সুবিধা আছে বলেই, আজ মহারাজা মহারাণী থেকে মজুর মজুরণী সকলের হাতেই সমান ভাবে চরকা ঘোরা সম্ভব হয়েছে।

চরকার সুন্দর আকৃতিই তাকে সকলের চিত্তজয়ী করে তুলেছে। আজ এই কারণেই আমরা নিশানের ওপরে,

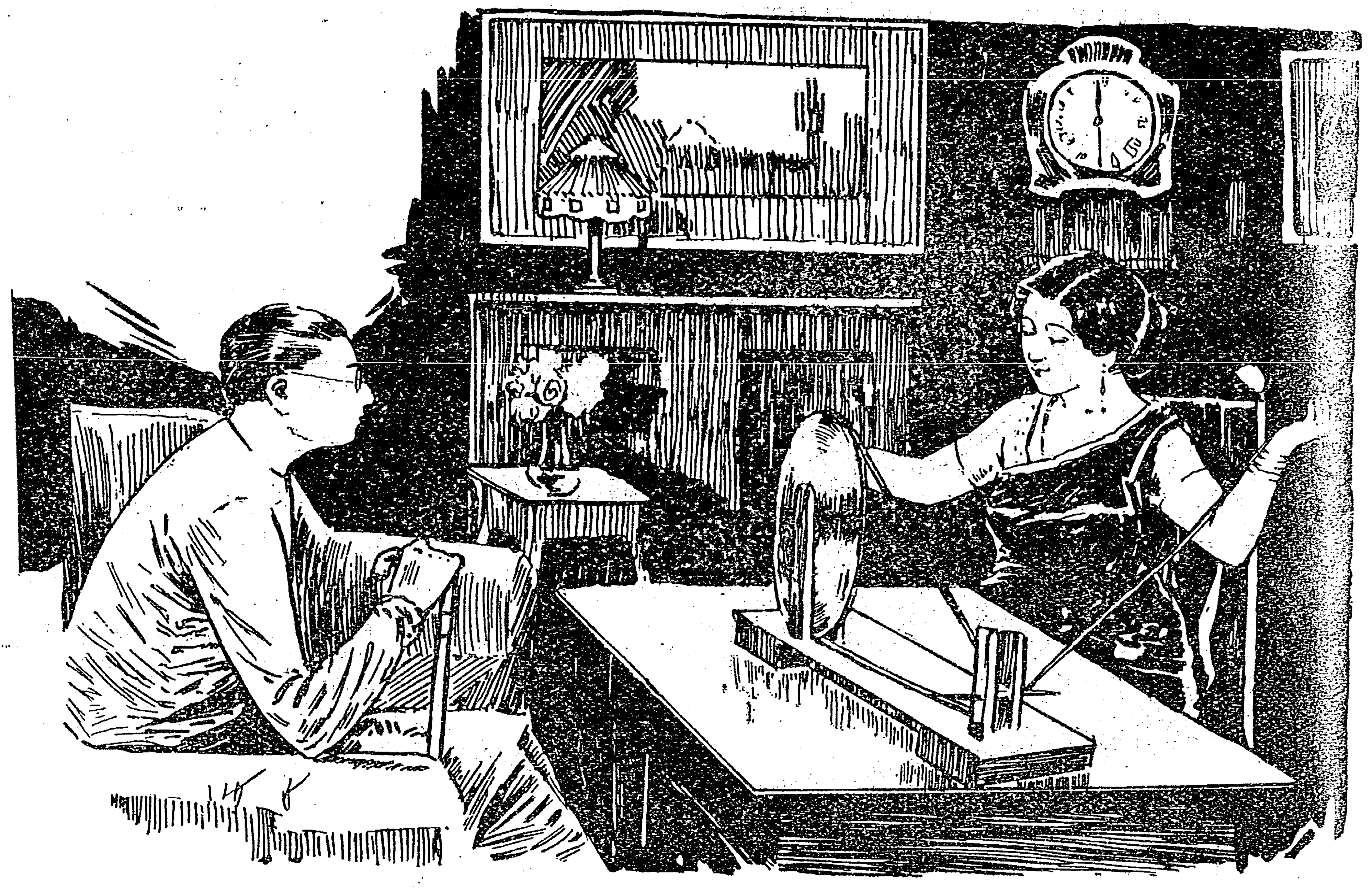

সুসভ্যা সুসজ্জিতা নারী ড্রয়িংরুমে বসে চরকা কাট্‌ছেন

ঢেঁকি বা যাঁতা প্রচলনের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা, ও-দুটার আকৃতি ও প্রকৃতি বড় অসভ্য ধরণের। ওদের চালনার সময় সভ্যতা বজায় রাখা অসম্ভব। চরকাতে সে দোষ কিছুই নেই, বেশ সভ্য ও সৌখীন ভাবেই চরকা চালনা করা যায়। সভ্যা নারীরা ড্রয়িং বা বেড্‌রুমে, চেয়ারে, সোফায় বসে, ভাল শাড়ী জ্যাকেটে সুসজ্জিতা অবস্থায় অবলীলাক্রমে চরকায় সূতা কাট্‌তে পারেন। চরকা একটু ভাল করে তৈরী করালে, সেটা একটা সুন্দর আসবাবে পরিণত হয়ে ঘরের শোভা বৃদ্ধিও করে থাকে।

চিঠির কাগজ বা খামের মাথায়, ডিজাইনে, ট্রেড মার্কে চরকা অঙ্কিত হতে দেখ্‌ছি। নারীদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রী অলঙ্কারের মধ্যেও চরকা নিজের স্থান করে নিয়েছে। সোনা, রূপা বা জড়োয়ার চরকা-ব্রোচ্ নারীরা আদরে অঙ্গে ধারণ করছেন। তাঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পুরুষেরাও আজকাল ঘড়ির চেনে চরকা-লকেট্ ঝোলাতে আরম্ভ করেছেন।

চরকায় যে আজ সকলের ওপর প্রভুত্ব করছে, সে তার নিজের নানা গুণের জোরেই। এত গুণ যার, সে ত প্রভুত্ব কর্‌বেই—তখন এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানই বৃথা!

শোক-সংবাদ

৺রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর

দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর বিগত ১৭ই জুন ১৯২৬, ২রা আষাঢ়, ১৩৩৩ বৃহস্পতিবার রাত্রি একটার সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে অপার শোক-সাগরে ভাসাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান

৺রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর

করিয়াছেন; এই নিদারুণ সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। অতি অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই দুই অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গেলেন,—রাজসাহী প্রদেশের দুই অত্যুজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ও পার্শ্ববর্ত্তী দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ আবাল্য বন্ধু ছিলেন, পরস্পরের সুখ দুঃখের সঙ্গী ছিলেন। তাই বুঝি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা প্রমদানাথ অল্পদিনের ব্যবধানেই প্রিয় বন্ধুর অনুগমন করিলেন। কিছুদিন হইতেই রাজা বাহাদুরের শরীর অসুস্থ ছিল; কিন্তু এত শীঘ্রই যে তিনি চলিয়া যাইবেন, ৫৩ বৎসর বয়সেই যে তাঁহার ভবের খেলা শেষ হইবে, ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজা প্রমদানাথ যখন বেদনা-কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন "যাও মহারাজ, আমিও আস্‌ছি" তখন আমরা তাঁহার এই কথা বন্ধু-বিয়োগ-কাতরতার মর্ম্মোচ্ছ্বাস বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু বিধাতা যে অলক্ষ্যে বসিয়া রাজার এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন, তাহা ত ভাবি নাই। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর, সদাশয়, অমায়িক, দানশীল মহাত্মাকে হারাইয়া উত্তরবঙ্গ কেন, সমগ্র বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না। রাজা প্রমদানাথ দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, অসহায়ের সহায় ছিলেন; রাজসাহী অঞ্চলের সকল দেশ-হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় পরলোকগত কুমার হেমন্তকুমার, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার ও শ্রীযুক্ত কুমার বসন্তকুমার রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গড়িয়া তুলিয়াছেন; এই সমিতির জন্য তাঁহারা অকাতরে অর্থ-ব্যয় করিয়াছেন। রাজা প্রমদানাথ কাউন্সীল অব ষ্টেটের সদস্য ছিলেন; সেখানে সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিতেন; তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, তাঁহার অমায়িক ভদ্র-ব্যবহার তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল। ধনী-দরিদ্র সকলের জন্যই তাঁহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন তাঁহার জন্মভূমিতে সৎকার করা হয়। তাঁহার সে অন্তিম বাসনা পূর্ণ করা হইয়াছে। আমরা স্বামী-শোক-কাতরা রাণী মহোদয়া, সানুজ কুমার প্রতিভানাথ, রাজা বাহাদুরের ভ্রাতৃদ্বয় ও অসংখ্য আত্মীয়-বান্ধবগণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺কুমার বিজনেন্দ্রনাথ রায়

দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথের পরলোক-গমনের পর দ্বাদশ দিন যাইতে না যাইতেই তাঁহার প্রাণাধিক দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিজনেন্দ্রনাথ পূজনীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে জীবনের পরপারে চলিয়া গেলেন; দিঘাপতিয়া রাজভবনে পুনরায় হাহাকার ধ্বনি উঠিল, কুমার বাহাদুরের আত্মীয়গণের

৺কুমার বিজনেন্দ্রনাথ রায়

শোক-কাতর ক্রন্দনরবে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। কুমার বিজনেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিলেন। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া এবং নিজেও অসুস্থ হইয়া বিলাতের চিকিৎসকগণের উপদেশ মত বিগত এপ্রিল মাসে তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিন মাসের মধ্যেই পিতাপুত্র দুইজনেই ১২ দিনের ব্যবধানে শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। মৃত্যু সময়ে কুমার বিজনেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৯ বৎসর হইয়াছিল। ঐ নিদারুণ শোকের সান্ত্বনা নাই! ভগবানের বিধান অবনত মস্তকে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর ত নাই!

৺চিররঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন পিতার পরলোক গমনের পর এক বর্ষ পূর্ণ না হইতেই অকস্মাৎ হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পুত্র-শোকাতুরা মাতা বাসন্তী-দেবীকে এ সময় আমরা কি বলিয়া প্রবোধ দিব? একমাত্র সন্তানের বিয়োগে বিধবা মায়ের প্রাণে যে কি বিষম বেদনা লাগে, তাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না। দেশবন্ধুর পরলোকগমনে তিনি অধীরা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীর অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি হৃদয়ে অমিত বলের সঞ্চার করিয়াছিলেন; প্রকৃত সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য তিনি বিস্মৃত হন নাই। এখন একমাত্র পুত্রের বিয়োগে তাঁহার উপর আবার একটী সংসারের ভার পড়িল, চিররঞ্জনের তিনটী শিশু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে বল-সঞ্চয় করিতে হইবে। তাঁহার ন্যায় মহিয়সী মহিলাকে আমরা আর কি সান্ত্বনা দিব; তাঁহার এক পুত্র গিয়াছে, শতসহস্র পুত্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

৺নিমাইচন্দ্র বসু

কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্ণী নিমাইচন্দ্র বসু মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; পুত্র পৌত্র, দুহিতা, দৌহিত্র, বহু আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়া অন্তিমে হরিনাম করিতে করিতে বসু মহাশয় চলিয়া গেলেন। এ মরণ ত সুখের; ইহার জন্য

শোক করিতে নাই। নিমাই বাবু কলিকাতার একজন গণ্যমান্য নাগরিক ছিলেন; এটর্ণীর কার্য্যে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং যেমন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি অকাতরে দুই হাতে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত এটর্ণীর কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরে দেশ হিতকর ও সকল অনুষ্ঠানেই নিমাই বাবু যোগদান করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার অমায়িকতায় সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্ম্মক্ষম ছিলেন। হাই-কোর্টের ব্যবহারাজীবগণ এবং বিচারপতিগণ নিমাই বাবুকে তাঁহার কার্যকুশলতার জন্য বিশেষ সম্মান করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া, পিতার ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।

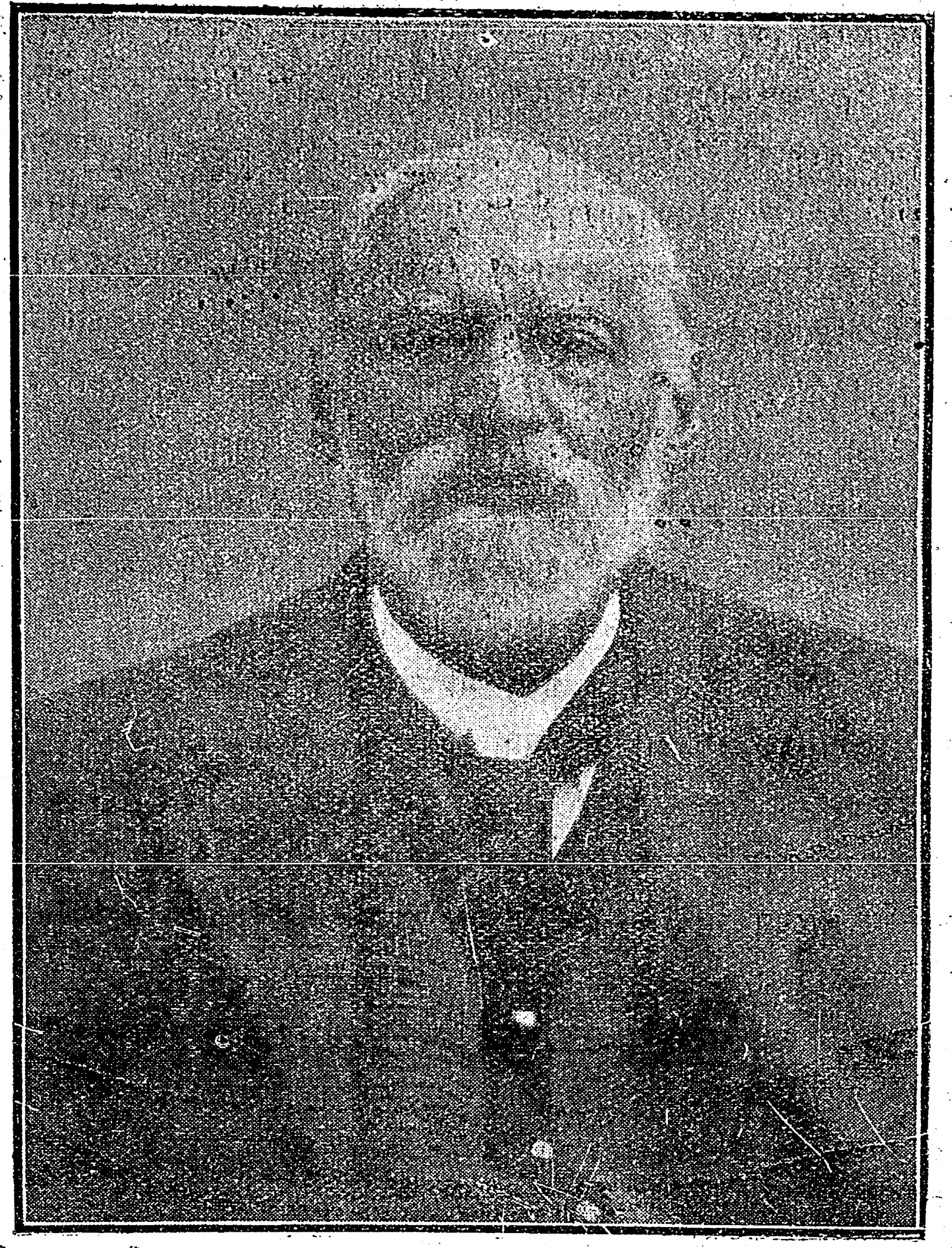

৺নিমাইচন্দ্র বসু

সাময়িকী

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল, তাঁহার নাম সকলের জানা থাকিলেও, অনেকে এই ধীমান পণ্ডিতের সম্যক্ পরিচয় অবগত নহেন। এই কারণে আমরা পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের জীবন-কথা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী সুঁড়ার এক প্রাচীন মিত্র পরিবারে রাজেন্দ্রলাল ১২২৮ সালের ফাল্গুন মাসের ৬ই তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলাল জন্মেজয় মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বাল্যকালে সেকালের প্রথা অনুসারে পল্লীর পাঠশালায় তাঁহার হাতে-খড়ি হয়। তাহার পর ১২৩৮ সালে তিনি ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং ১২৪১ সালে উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র বসাকের বিদ্যালয়ে যান। সেকালে ক্ষেম বসুর স্কুল ও গোবিন্দ বসাকের স্কুলই কলিকাতার দুইটী প্রসিদ্ধ ইংরাজী বিদ্যালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া রাজেন্দ্রলাল ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তিনি মেডিকেল কলেজে

ব্যাস্‌লি, গুডিভ্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও অধ্যাপকগণের বিশেষ স্নেহ লাভ করেন। ক্যামেরণ নামক একজন সাহেব রাজেন্দ্রলালের গৃহশিক্ষক ছিলেন। এই সাহেব তাঁহাকে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় যখন বিলাত গমনের আয়োজন করেন, তখন তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি মেডিকেল কলেজের পাঁচজন উৎকৃষ্ট ছাত্রকে নিজের ব্যয়ে বিলাতে লইয়া গিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া আনিবেন। সেই সময় তিনি রাজেন্দ্রলালকে এই কয়জনের অন্যতম নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু, পিতার অমত হওয়ায় রাজেন্দ্রলালের বিলাতে যাওয়া হয় না। ইহার কিছুদিন পরেই মেডিকেল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় রাজেন্দ্রলাল উপাধি গ্রহণ না করিয়াই মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং অল্পদিন পরেই আইন পড়িতে আরম্ভ করেন এবং যথাসময়ে আইনের পরীক্ষাও দেন; কিন্তু সেবার পরীক্ষার উত্তরের কাগজ চুরী যাওয়ায় তিনি পাশ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে ডাক্তার উসাঘনেসি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। ভবিষ্যতে তিনি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে যে অসামান্য খ্যাতি লাভ করেন, এইখানেই তাহার সূচনা হয়; সুতরাং ডাক্তার বা উকিল হইলে আমরা আর রাজা রাজেন্দ্রলালের ন্যায় প্রত্নতাত্ত্বিক পাইতাম না। এই সময় হইতে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে গভীর গবেষণামূলক ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং বিপুল অধ্যবসায়-বলে অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারস্য, উর্দ্দূ, হিন্দী, গ্রীক্‌, লাটিন, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তখন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মোট ১২৮ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে ১০খানি সংস্কৃত, ১৩খানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত; অবশিষ্ট সমস্তই ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রকৃতি-ভূগোল, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণ-প্রবেশ, রহস্যসন্দর্ভ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজির জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্রলালকে ডি-এল্‌ (Doctor of Law) উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহার সম্পাদিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক মাসিক পত্র সে সময়ের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রতি[illegible] লাভ করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত বুদ্ধ-গয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনত্ব বিষয়ক গ্রন্থদ্বয় রাজেন্দ্রলালকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রায় বাহাদুর, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সি-আই-ই এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উপাধি পান। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রলালই সর্ব্বপ্রথম এ[illegible]য়াটিক সোসাইটীর সভাপতি হন। ইনি পরে ব্রিটিশ [illegible]ণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনেরও সভাপতি হন। কলিকাতার [illegible]ards Institution নামক নাবালক জমিদারদিগের আবাস ইঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। ১৮৯১ [illegible]ষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই (১২৯৮, ১ ই শ্রাবণ) রাজেন্দ্রলাল পরলোকগত হন। এই মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট সুশোভিত করিয়া আমরা এই পণ্ডিত-প্রবরের স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

২৯শে জুন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বর্গারোহণের দিন। প্রতি বৎসর এই দিন প্রাতঃকালে কলিকাতাবাসী কবি ও সাহিত্যিকগণ মাইকেলের সমাধি-পার্শ্বে সমাগত হইয়া মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও উক্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় যে সেদিন মহাকবির সমাধি-পার্শ্বে ত্রিশ চল্লিশ জনের অধিক ভদ্রলোকের সমাগম হয় নাই। তবে, সেই দিন অপরাহ্নকালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে মাইকেলের স্মৃতি-সভার যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহাকবির স্মৃতি-পূজার জন্য প্রতি বৎসর এই দিনে যাহাতে মাইকেলের জন্মভূমি যশোহর সাগরদাঁড়িতে উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সেখানে কোন প্রকার সভা-সমিতি না করিয়া যদি একটা মেলা বসাইবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে এই উৎসবটী স্থায়ী হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার কবি ও সাহিত্য-সেবকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

গত ১১ই জুন লণ্ডনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সদস্যগণ এক প্রীতিভোজে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সম্বর্দ্ধনা করেন। লর্ড লী সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের মানব-হিতকর কার্য্যের ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসা করেন। তিনি জগদীশচন্দ্রকে উদ্ভিদ জগতের ডারবিন আখ্যা দেন। আচার্য্য বসু বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলেন—"ভারতের মত বিস্তৃত দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে; কিন্তু এই দুই কার্য্যের উন্নতি একমাত্র বিজ্ঞান দ্বারাই সম্ভবপর। দারুণ অর্থ [illegible]ষ্টই ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির কারণ। প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু ছাত্র বিজ্ঞানে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছে, কিন্তু তাহারা কার্য্য করিবার মত উপযুক্ত কোনরূপ কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেছে না। ভারতের এই আসন্ন অর্থ কষ্ট দূর করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের রীতিমত ভাবে সাহায্য করা দরকার।"

গত ১১ই ও ১২ই আষাঢ় শনিবার ও রবিবার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্থ উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্মেলনে মূল সভাপতি হইয়াছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের ন্যায় এই সম্মেলনেও চারিটী শাখার অধিবেশন দ্বিতীয় দিনে হইয়াছিল। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইবার কথা ছিল বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের, কিন্তু, তিনি উপস্থিত হইতে না পারায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত আসন গ্রহণ করেন; দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইবার কথা ছিল 'হিতবাদী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের; কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয়গণের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছিল, অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু, বঙ্কিম সম্মেলনে শাখা-সভার অধিবেশনের পক্ষপাতী নহি; বঙ্কিম-সম্মেলনে দেশের সাহিত্যিকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই শোভন হয়; অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। ভরসা করি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলনের উৎসাহী অনুষ্ঠাতৃগণ আমাদের প্রস্তাবটী সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং যাহাতে এই সম্মেলনে সাহিত্যিকগণ অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন, তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গ্রীভ্‌স্‌ মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যানসেলর। তিনি আগামী আগষ্ট মাসে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে যাইতেছেন। হাইকোর্টের বিচারাসন লইয়া কোন গোলই হয় নাই, হইবার কথাও নহে; কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যানসেলরের পদ লইয়া মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চ্যান্‌সেলর বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর এই পদে লোক নিয়োগের কর্ত্তা। লর্ড লিটন বাহাদুর চারি মাসের ছুটীতে বিলাত গমনের পূর্ব্বেই পাটনা কলেজের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সি-আই-ই মহোদয়কে উক্ত পদে মনোনীত করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এই নিয়োগের সংবাদ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বিশেষ দলাদলি কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলিতেছেন, অধ্যাপক সরকারকে নির্ব্বাচিত করিয়া লাট সাহেব উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন; অপর দল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সদস্য অধ্যাপক সরকারের নিয়োগের বিরুদ্ধবাদী। তাঁহারা বলেন, অধ্যাপক যদুনাথের নিয়োগ আইন-সঙ্গত হয় নাই, কারণ চ্যান্‌সেলর মহোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোদিগের মধ্য হইতেই যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন। অধ্যাপক যদুনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নহেন, এবং ফেলোদিগের

মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর অনেক ব্যক্তি আছেন। এ অবস্থায় যোগ্যতর ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা করিয়া, যিনি ফেলো নহেন এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করা আইন-বিরুদ্ধ এবং যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, লর্ড লিটন বাহাদুর পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যে লজ্জাজনক পরাজয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় তথা আশুতোষের ঘোর বিরোধী ও কঠোর সমালোচক অধ্যাপক যদুনাথকে এই পদে বসাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ণমেণ্টের করতলগত রাখিবার জন্যই এই চাল দেওয়া হইয়াছে। শুনিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অস্থায়ী গবর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই মনোনয়ন রদ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু সার ষ্টিফেন্‌সন বাহাদুর লর্ড লিটনের মনোনয়নে হস্তার্পণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। আরও শোনা যাইতেছে, এই মনোনয়নের বিরুদ্ধে বিলাতে লর্ড লিটনের নিকটও না কি আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অধ্যাপক যদুনাথের মনোনয়নে বিশ্ববিদ্যালয় মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক যদুনাথ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা সার আশুতোষের কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; তিনি যে বিশ্বপণ্ডিতদিগের অনেককেই প্রীতির চক্ষে দেখেন না, বরঞ্চ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করেন, এ কথাও তাঁহার সমালোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নিয়োগে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই প্রতিবাদ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক; এবং অধ্যাপক যদুনাথ ভাইস-চ্যান্‌সেলর হইলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক খ্যাতনামা সদস্য ও অধ্যাপকের সহানুভূতি ও সাহচর্য্য লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাও নিশ্চিত। আমরা বলিতে পারি যে, অধ্যাপক যদুনাথ গবর্ণমেণ্টের হাতের পুতুল হইবেন বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; অধ্যাপক যদুনাথ সে প্রকৃতির লোকই নহেন। তাহার পর, তাঁহার কঠোর সমালোচনার কথা; সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক; এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বাহির হইতে কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করা, দোষ ত্রুটী দেখান সহজ কাজ; কিন্তু হাতে-কলমে সেই বিপুল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালন করিতে বসিলে তখন আর সে কঠোরতাও থাকে না, সে সমালোচনাও থাকে না, তখন সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে কার্য্য সুপরিচালিত হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা করিয়া থাকেন। অধ্যাপক যদুনাথের মধ্যে এই বিজ্ঞতার অভাব আছে বলিয়া অনেকে মনে করিলেও আমরা করি না। তবে, এ কথাও বলি যে, বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সিনেট যে ভাবে গঠিত এবং যে প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সফলকাম হওয়া অধ্যাপক যদুনাথ কেন, তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রতিভাশালী, অধিকতর কার্য্যকুশল ব্যক্তির পক্ষেও সম্পূর্ণ অসম্ভব; সুতরাং অধ্যাপক যদুনাথের নিয়োগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য অধিকতর বিশৃঙ্খল হইবারই সম্ভাবনা; সুধু দলাদলি, বাগ্‌বিতণ্ডাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ব্যয়িত হইবে, প্রকৃত উন্নতি ও সংস্কার সুদূরপরাহত হইবে।

বিগত ১২ই আষাঢ় রবিবারে চন্দননগরের অধিবাসী, দানশীল, সুলেখক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার জননীর নাম চির-স্মরণীয় করিবার জন্য 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে'র দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে একটী উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। চন্দননগরের বিচারপতি মহোদয় এই উৎসব সভার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়া মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত দাতা হরিহরবাবু যে শিক্ষা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা সত্যসত্যই 'মন্দির' নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া হরিহরবাবু এই সুদৃশ্য শিক্ষা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষার জন্য চন্দননগরে যে 'নৃত্যগোপাল পাঠাগার' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এবং তাঁহার মাতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই 'কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির' সুধু চন্দননগরেই কেন, বাঙ্গালা দেশের অনেক প্রসিদ্ধ নগরেও দেখিতে পাওয়া যায় না। হরিহর বাবুর মাতৃপিতৃ-ভক্তি প্রকৃতপক্ষেই আদর্শস্থানীয়। ধনী ব্যক্তিরা নানা ভাবে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু হরিহর বাবু যেমন একদিকে আড়ম্বরশূন্য সদাশয় সাহিত্য-সেবক, আর একদিকে তিনি অর্থের সদ্ব্যবহারও করিতে জানেন। চুঁচুড়ায়

যে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন হইতেছে, হরিহর বাবু তাহারও সাফল্যের জন্য দেড়লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা হরিহর বাবুর ন্যায় পিতৃমাতৃভক্ত, সদাশয়, দানশীল মহাত্মার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

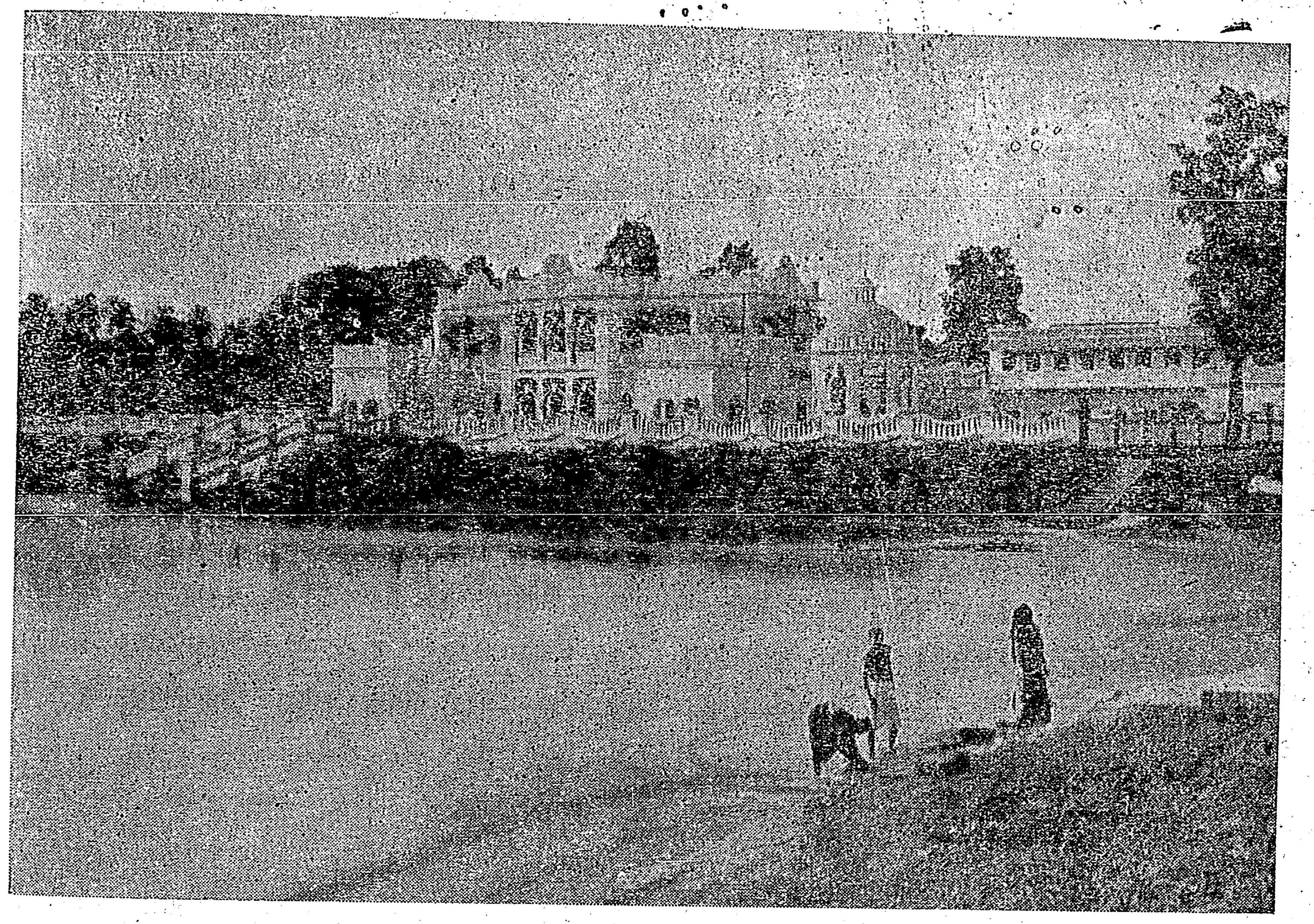

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির। চন্দননগর শিক্ষালয় ও ছাত্রী-নিবাস।

১৯২৪-২৫ সালে বঙ্গদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা অপেক্ষা ৪৯৩টি বাড়িয়া মোট ৩৭০৭১ হইয়াছে। বঙ্গের কোন্ বিভাগে প্রাথমিক বিদ্যালয় কত ছিল এবং আলোচ্য বর্ষে কত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বিভাগ।	১৯২৩-২৪ সাল।		১৯২৪-২৫ সাল।	
	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	স্কুল-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
বর্দ্ধমান	৮২৭৩	২৫৯০৮৪	৮৪৫৮	২৬৮২৮৬
প্রেসিডেন্সি	৬২১৫	২২৭৩৬৩	৬৩১১	২৩১১৫৯
কলিকাতা	৩৪৬	২০৫২৭	৪১০	২৪৯২২
ঢাকা	৯০৯১	৩২১৭৭৯	৯০৯০	৩২৬৫১৪
চট্টগ্রাম	৫৬৭৯	২০৯১১৭	৫৯১০	৩২৫৫২৮
রাজসাহী	৬৯৭৪	২১৮০৩৪	৬৮৯২	২২৩১৫৭
মোট	৩৬৫৭৮	১২৫৫৯০৪	৩৭০৭১	১৩০৯৫৫৬

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা দুইটি নূতন অধ্যাপক পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই আশুতোষ অধ্যাপক নামে পরিচিত হইবেন। প্রত্যেক পদের বেতন ৬০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা; প্রত্যেক দুই বৎসরে ৫০৲ বৃদ্ধি হইবে। সেনেটে ইচ্ছা করিলে, বিশেষত্ব বুঝিয়া, প্রথমেই ৬০০৲ টাকার অধিক বেতনেও লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আশুতোষ ভবনের নিম্নতলায় যে সকল ঘর দোকানদারদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার আয় হইতে অধ্যাপকদিগের বেতন প্রদান করা হইবে। ইহাতে টাকার অকুলান হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল হইতে টাকা দিয়া তাহা পূরণ করা হইবে।

আর যদি উক্ত দোকানঘরগুলির আয় হইতে অধ্যাপকদ্বয়ের বেতন দেওয়ার পরেও টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই টাকায় একটি স্বতন্ত্র তহবিল সৃষ্টি করা হইবে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে; কার্য্যকাল অতীত হইলে ইঁহারা পুনঃ নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অধ্যাপকদ্বয়ের একজন সংস্কৃত এবং অপর জন ইসলাম সাহিত্য শিক্ষা দিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে ইঁহারা নিজ নিজ বিষয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিবেন। ইঁহাদিগকে নিজেদের অবলম্বিত বিষয়ের গবেষণাকার্য্যও পরিচালন করিতে হইবে। প্রতি বৎসর জুলাই মাসে, প্রত্যেক অধ্যাপক পূর্ব্ব বৎসরে কি গবেষণা কার্য্য করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে কি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার বিবরণ প্রদান করিবেন।

ভারত-সচিবের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ভারত-সচিবের সম্মতি লইয়া স্থির করিয়াছেন যে, ১০ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ঔষধের প্রয়োজন ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে অহিফেন রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিবেন। এই দশ বৎসরে ক্রমে ক্রমে রপ্তানী হ্রাস করিয়া দেওয়া হইবে। গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী আর্ল উইণ্টারটন কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারত-সরকার ব্যবস্থা পরিষদের সম্মতি অনুসারে এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবেন। তিনি সে সময়ে বলিয়াছিলেন, কোন্ সময়ের মধ্যে অহিফেন রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইবে, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই; যাহারা অহিফেনের চাষ করে, তাহাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা হইবে। ভারত সরকারের এই নূতন নীতি ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও নিখিল-ভারত ব্যবস্থা-পরিষদ পর্য্যায়ক্রমে গত ১৬ই ও ১৮ই মার্চ্চ তারিখে অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমশঃ ঔষধের প্রয়োজন ব্যতীত, অহিফেন রপ্তানী বৎসরে শতকরা ১০ ভাগ হারে হ্রাস করা হইবে। তাহা হইলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর আর উহা রপ্তানী হইবে না। এই ব্যবস্থানুসারে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল হইতে কলিকাতায় অহিফেনের নীলাম বন্ধ করা হইয়াছে।

সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে ২৩ কোটি ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ২ শত ৫০ জন কৃষিজীবী কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আর ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৭ হাজার লোক শিল্পের সেবা করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুটীর-শিল্পের সেবা করে। ইহাদের আনুমানিক হিসাব মোট অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় সাড়ে দশ জন। ইহা ভিন্ন ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬ শত ২২ জন অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মোট অধিবাসী-সংখ্যার মধ্যে শতকরা পৌনে ৬ জনের কম লোক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি করিয়া থাকে। সরকারী চাকুরী, পুলিস ও সেনাবিভাগে ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৪ শত ৭৯ জন। অর্থাৎ সমগ্র লোক-সংখ্যার মধ্যে শতকরা দেড় জনেরও কম লোক এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। ৫০ লক্ষ ২০ হাজার ৫ শত ৭১ জন উচ্চ অঙ্গের বৃত্তিসেবা এবং পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্য করে। তন্মধ্যে ব্যবহারাজীবের সংখ্যা ৩ লক্ষ সাড়ে ৩৬ হাজার।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগকে ইংরেজি সাহিত্য ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহাতে ছেলেদের ইংরেজির জ্ঞান কমিয়া যাইবে কি না। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে ছেলেরা অধ্যয়নের বিষয়গুলিতে সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে এবং তাহাদের স্বাধীন চিন্তার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, এদিকে মাতৃভাষার জ্ঞানও উৎকৃষ্টতর হইবে, তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মাতৃভাষা প্রচলন করার মত স্থির হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ইংরেজি ভাষা জ্ঞান কমিয়া না যায়, ইহাও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অনেকেরই মত এই যে, ছেলেদের ইংরেজি ভাষা জ্ঞানও যাহাতে উৎকৃষ্টতর হয় তাহা করিতে হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হইলে ইহার ফলে ছেলেদের ইংরেজি ভাষা জ্ঞান কিরূপ দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার অধিবেশনে ম্যাট্রিক পরীক্ষার বিধি পরিবর্ত্তন বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা উঠিয়াছিল এবং সদস্যগণ বিভিন্ন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নব বিধি অনুসারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী-দিগকে ইংরেজিতে পাশ করিতে হইলে মোট নম্বরের মধ্যে শতকরা ৪০ নম্বর ইংরেজি প্রশ্নপত্রে রাখিতে হইবে।

দক্ষিণ ভারতে এবং প্রধানতঃ মহীশূর রাজ্যেই চন্দনকাষ্ঠের কারবার চলিয়া থাকে। সেখানে বিস্তৃত চন্দন-বন রহিয়াছে। কৈয়ম্বাটোর ও কুর্গ জেলাতেও এই বনের পরিমাণ মন্দ নয়। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্য মাদ্রাজ গবর্মেণ্টের সহিত একযোগে চন্দন কাঠ কাটিয়া বিদেশে পাঠাইতেন; দেশে আর সেগুলিকে "রিফাইন্" করা হইত না। পূর্ব্বোক্ত তিন জায়গার চন্দন কাঠ—মহীশূরে ২৫০০ টন, কৈয়ম্বাটোর ও কুর্গে ৫০০ টন—একুনে বৎসরে প্রায় ৩,০০০ টন হইত। তাহার মধ্য হইতে ৭৫০ টন স্বস্থানে এবং ২৫০ টন ভারতের অন্যান্য স্থানে ব্যবহৃত হইত। আর অবশিষ্ট ২,০০০ টন যাইত জার্ম্মাণিতে। বিগত যুদ্ধের সময় মহীশূরের এই চন্দন কাঠ রপ্তানীর ব্যবসা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ, জার্ম্মাণি তখন পৃথিবীর মধ্যে একঘরে। চন্দনতেল নির্ম্মাণের জন্য ১৯১৬ সালে মহীশূরে একটি এবং বাঙ্গোলোরে আর একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৭ সাল হইতেই কারখানা দুইটির কাজ ভালমত আরম্ভ হয়। এখন প্রতি বৎসর এখানে ২,০০,০০০ পাউণ্ড তেল উৎপন্ন হয়। আরো বেশী হইতে পারে বলিয়া অনেকে আশা করেন। মহীশূর আজ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চন্দন তৈল যোগাইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া ও সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দ্বীপে চন্দন তৈল তৈয়ারি হয়। কিন্তু মহীশূরের তৈল অপেক্ষা সে তৈল নিকৃষ্ট। এই মাল প্রচুর পরিমাণে আমেরিকায় যায়। জাভা ও সুমাত্রার "মাকাশার তৈল" মহীশূরের নিকৃষ্ট শ্রেণীর তৈলের সমান। তাহাও আমেরিকা এবং ইয়োরোপে যায়। মহীশূরের তৈল প্রধানতঃ জাপানে গিয়া থাকে। সেখানে ঔষধের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জননী জগৎতারিণী দেবীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে কিছু টাকা দিয়া গিয়াছেন। সেই টাকার সুদ হইতে বাঙ্গালা দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যোগ্যতর ব্যক্তিকে প্রতি বৎসর একটী স্বর্ণ-পদক প্রদানের ব্যবস্থা সার আশুতোষ করিয়া গিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুসারে একটী কমিটিও গঠিত করিয়া গিয়াছেন। সেই কমিটী প্রথম বৎসরে বিশ্বকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথকে এই স্বর্ণ-পদক প্রদান করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় বৎসরে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এই স্বর্ণ-পদক দিয়াছিলেন। এবার তৃতীয় বর্ষে উক্ত কমিটি রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে এই স্বর্ণ-পদক প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচনে আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। রসরাজ বসু মহাশয় সর্ব্বাংশেই এই সম্মানলাভের উপযুক্ত। বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকগণও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কৃপণতা করেন নাই; নৈহাটীতে যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে বসু মহাশয়কে সাহিত্য শাখার সভাপতির পদে বরণ করা হইয়াছিল। তাহার পর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিগত বীরভূম অধিবেশনে তাঁহাকেই মূল সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছিল। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালা দেশে—সুধু বাঙ্গালা দেশেই বা বলি কেন—সমগ্র ভারতবর্ষেই মুসলমান ও অ-মুসলমান (বর্ত্তমান সময়ে 'হিন্দু' বলিয়া কোন জাতি সরকার বাহাদুর স্বীকার করেন না, তাঁহারা ভারতবর্ষে মুসলমান ও অ-মুসলমান, এই দুই জাতিরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন) এই দুই জাতির মধ্যে গোলযোগ ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। পূর্ব্বে মুসলমানগণের ইদ্ পর্ব্বোপলক্ষে কোরবানি লইয়াই নানা স্থানে মধ্যে মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হইত, ছোট বড় দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইত; আর কোন ব্যাপার লইয়া সামান্য মতান্তর থাকিলেও সে সকল উপলক্ষ করিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তারক্তি হইত না। এখন দেখিতেছি সেই কোরবাণি লইয়া কোন

গোলমাল হইতেছে না। এই সেদিনও মুসলমানের ইদ্-পর্ব্ব হইয়া গেল ; তদুপলক্ষে বিশেষ কোন গোলযোগ কোথাও হয় নাই। কিন্তু, এখন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল ঢাকের বাদ্য। এখন প্রধান বচসা হইতেছে মস্‌জিদের সম্মুখে বাদ্যভাণ্ড লইয়া শোভাযাত্রা উপলক্ষ করিয়া ; এবং তাহারই জন্য বড় বড় সহরে মাত্র নহে, গ্রাম-পল্লীতে পর্য্যন্ত মারামারি, কাটাকাটি, শান্তিভঙ্গ, নারী-নির্য্যাতন, লুণ্ঠন প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এ কথা কোন মুসলমান বা অ-মুসলমানের মনেও উঠে নাই ; এখন তাহাই হইল প্রধান ব্যাপার। কলিকাতা সহরে যে এমন ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গেল, তাহা এই ঢাকের বাজনা লইয়াই। চড়কপূজায় যে ঢাকের বাদ্য মোটেই শোনা গেল না, বড়বাজারের রাজরাজেশ্বরী যে বাহিরে আসিয়াও শেষে ঘরে প্রবেশ করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনের শুভদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, তাহারও কারণ এই বাদ্যভাণ্ড, এই শোভাযাত্রা, এই ঢাক!

মুসলমান ও অ-মুসলমানের এই অপ্রীতিকর মনোমালিন্য এবং তাহার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রতীকার এই দুই দল মিলিয়া আপোষে করিয়া উঠিতে পারিলেন না, পারা অসম্ভব হইল। মুসলমান বলেন, তাঁহাদের মস্‌জিদগুলিতে অষ্ট প্রহরই উপাসনা হয়, সুতরাং দিবারাত্রির কোন সময়েই কোন বাদ্যভাণ্ড মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। হাজি গজনবী প্রমুখ মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করিতে চান যে, মুসলমানের উপাসনা-স্থানের সম্মুখ দিয়া কেহ কখন ঢাক বাজাইয়া শোভাযাত্রা লইয়া যান নাই, অতএব অ-মুসলমানগণের দাবী বাতিল ও নামঞ্জুর। অ-মুসলমানেরা বলেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে দেশের সর্ব্বত্র মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যসহ শোভাযাত্রা চলিয়াছে, কখনও কোন আপত্তি হয় নাই ; এখন সে আপত্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ; তাঁহারা নাগরিকের অধিকার কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না। এ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি একেবারেই অসম্ভব। কাজেই, তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন।

সুতরাং যাঁহারা দেশের শাসনকর্ত্তা, যাঁহারা দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য, সেই সরকার বাহাদুরকেই তৃতীয় পক্ষরূপে একটা রফা নিষ্পত্তি করিতে অগ্রসর হইতে হইল। বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লিটন উভয় পক্ষের মাতব্বরদিগকে একত্র করিয়া যখন শালিস করিতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজেই এ ভার গ্রহণ করিলেন এবং কলিকাতা সহর সম্বন্ধে এক আদেশ জারি করিলেন যে, কলিকাতা নাখোদা মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া কোন সময়েই বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা চলিবে না। অন্যান্য মস্‌জিদসম্বন্ধে তিনি কলিকাতার পুলিস কমিশনর বাহাদুরের উপর ব্যবস্থার ভার দিলেন। মফস্বলের হাকিমেরা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য মনে করিবেন, তাহাই করিবেন। লাট বাহাদুরের এই আদেশে মুসলমান ও অ-মুসলমান কেহই সন্তুষ্ট হইলেন না ; নানা স্থানে প্রতিবাদ সভাও হইল, হাঙ্গামাও চলিতে লাগিল। কলিকাতা ঠাণ্ডা হইল বটে, কিন্তু এই আগুন পূর্ব্ব-বঙ্গ ও উত্তর-বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল ; ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হইল, নিরীহ হিন্দুরা নির্যাতন ভোগ করিতে লাগিল ; দেবমন্দির ও দেবতার দুর্দ্দশা হইতে লাগিল। সম্প্রতি পাবনা জেলাতে ভীষণ ভাবে এই আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে নারী-নির্য্যাতনের সংবাদও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে ; সেদিনও নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া হইতে গুণ্ডা কর্ত্তৃক নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ আসিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা সহরের শোভাযাত্রার ব্যবস্থার ভার সহর-কোতোয়ালের উপর লাট সাহেব ন্যস্ত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সেদিনের টাউনহলের সভার সভাপতি মহাশয়ের কথায় বলিতে হয়, সরকার কোতোয়ালকে কাজির আসনে বসাইয়া দিয়াছেন। সেই সহর কোতোয়াল অর্থাৎ কলিকাতা পুলিশের কমিশনার বাহাদুর আপাততঃ এই জুলাই মাসের জন্য যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

পুলিশের হুকুম

গত ৫ই জুনের ৫৭২১পি নং গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুযায়ী কলিকাতার পুলিশ কমিশনার অনেক অনুসন্ধান করিবার পর কলিকাতার মুসলমানগণের নমাজের সময় নির্দ্দেশ করিয়া

দিয়াছেন এবং ঐ সময় ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে কোন মসজিদের সম্মুখ দিয়া কেহ গান বাদ্য সহ মিছিল লইয়া যাইতে পারিবে না।

ভোর ৪-৩৯ মিনিট হইতে ৫-২৪ মিনিট পর্য্যন্ত। মধ্যাহ্ন ১ ঘটিকা হইতে ১-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত (শুক্রবার ১২-৪৫ মিনিট হইতে মধ্যাহ্ন ১-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত।)

অপরাহ্ন ৪-৩০ মিনিট হইতে ৫-০টা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যা ৬-৪৫টা হইতে ৭-১০ মিনিট পর্য্যন্ত। রাত্রি ৮-৩০ মিনিট হইতে ৯-১০টা পর্য্যন্ত। এই সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে শুধু কলিকাতার সময়।

ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন যে সময় পরিবর্ত্তন করিবার জন্য দরকার কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সেই সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

পুলিশ কমিসনার বাহাদুর ত হুকুম দিয়া খালাস ; কিন্তু এমন চমৎকার হুকুম কেমন করিয়া যে প্রতিপালিত হইবে, তাহাই ভাবনার কথা। এই আদেশে একেবারে ঘণ্টা মিনিট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেকেণ্ড পর্য্যন্ত বলিয়া দিলে আরও ভাল হইত। পুলিশের আদেশে দেখা গেল যে, মস্‌জিদের উপাসনার সময় ভোর ৪-৩৯ মিনিট হইতে রাত্রি ৯-১০ মিনিট পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বাদ আছে। এই সময়ের মধ্যে যাহার যাহা শোভাযাত্রা আছে তিনি তাহা করিতে পারিবেন, অথবা রাত্রি ৯-১০ মিনিটের পর হইতে ভোর ৪-৩৯ মিনিট পর্য্যন্ত যথেষ্ট সময় আছে ; সেই সময়ের মধ্যে পিতামহীর গঙ্গাযাত্রা, শব-যাত্রা, বিবাহ-যাত্রা, প্রতিমা-বিসর্জ্জন প্রভৃতি করিবার বিধান হইল। এখন গোল বাধিল ঘড়ি লইয়া। কলিকাতায় ত দেখিতে পাই, একটা ঘড়ির সহিত আর একটা ঘড়ির মিল নাই, দুচার মিনিট তফাৎ থাকেই। এদিকে পুলিশের আদেশ ৪-৩৯ মিনিট—আটত্রিশও নয়, চল্লিশও নয়—ঠিক উনচল্লিশ। কোন মস্‌জিদের ঘড়ি যদি ঠিক না থাকে, আর সেই সময় যদি শোভাযাত্রা যায়—তবেই আর কি——!

এই সুন্দর ব্যবস্থার প্রতিবাদের জন্য সেদিন কলিকাতা টাউন-হলে অ-মুসলমানগণের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে ; অর্থাৎ আবহমানকাল সুশীল ও সুবোধ বালকেরা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই হইয়াছে। প্রস্তাবগুলি এই—

(১) গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি রাস্তার শোভাযাত্রা সম্পর্কে যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী।

(২) যাহারা আইন ভঙ্গ করে, গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং হিন্দুদিগকে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন।

(৩) যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট, মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ও দিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট মসজেদের সমক্ষে বাজনা বাজান সম্পর্কে যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাহার বিপরীত ইস্তাহার প্রকাশ করায় এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(৪) এই সভা সমগ্র হিন্দুজাতিকে বিধিসঙ্গত ভাবে সজ্ঘবদ্ধ হইয়া এই সমস্ত অনাচারের প্রতীকার করিতে অনুরোধ করিতেছে।

সভা হইল, সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবও পাশ হইল। তাহার পর ? সেদিনের সভায় শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী মহাশয় সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন —

"প্রতিবাদের পর কি হইবে ? সরকার যদি আমাদের সঙ্গত প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে ন্যায়সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত করেন, তবে হিন্দু কি করিবে ? টাউন্-হলের সভায় বক্তার পর বক্তা বলিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকারের আদেশ বে-আইনী ; কেন না, বাঙ্গালা সরকার আইনের বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং সে কাজ কেবল আদালতের অধিকারগত। কাজেই জিজ্ঞাস্য—যাঁহারা বাঙ্গালা সরকারের আদেশ বে-আইনী বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সে আদেশ অমান্য করিতে—সে আদেশ ভঙ্গ করিয়া তাহার আইন বহির্ভূত প্রকৃতি প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন কি না ? তাঁহারা পরীক্ষার জন্য নাখোদা মসজেদের সম্মুখ দিয়া কীর্ত্তনের দল লইয়া গাহিতে গাহিতে যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না ? রথের সময় কলিকাতার সহর-কোতোয়াল যদি চিরাগত প্রথার পরিবর্ত্তন করেন——যদি রথযাত্রার রাস্তা বাঁধিয়া দেন,—তবে সে আদেশ

লঙ্ঘন করিয়া রথ লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন কি না”— ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের এই প্রশ্নাবলির উত্তরে কে কি বলিয়াছিলেন তাহা সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয় নাই এবং যাঁহারা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরও কর্ণগোচর হয় নাই; বোধ হয় এ সকল কথায় কর্ণপাত করা এবং সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা নিরাপদ নহে; তাই সকলে নীরব ছিলেন, আমরাও তাই নীরব থাকিলাম।

সেদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। সভায় নূতন হাওড়া সেতু নির্ম্মাণ সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সিলেক্ট কমিটি হাওড়া সেতু সম্বন্ধে যে বিল গঠন করিয়াছেন, সভায় তাহা আলোচিত হয়। হাওড়া-সেতু-নির্ম্মাণ-কমিটি যে ভাবে গঠন করা হইয়াছে, কর্পোরেশন তাহাতেও এই মর্ম্মে আপত্তি করেন যে, ঐ ভাবে কমিটি গঠিত হইলে তাহাতে করদাতাগণের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। কর্পোরেশনের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় এবং সিলেক্ট কমিটি হাওড়া সেতু সম্পর্কে যে বিল তৈয়ার করিয়াছেন উহা আলোচিত হয়।—(১) কর্পোরেশন এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, কাউন্সিলের বর্ত্তমান অধিবেশনে হাওড়া সেতু সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া উহা অর্থ নৈতিক দিক্ হইতে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পুনরায় অর্পণ করা হউক এবং নূতন কাউন্সিল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শীতকালের প্রারম্ভে ঐ প্রস্তাব কাউন্সিলে উত্থাপন করা হউক। যদি ঐ প্রস্তাবানুযায়ী কাজ না করাও হয়, তাহা হইলেও যেন, ঐ সম্পর্কে কর্পোরেশনের নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহের সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়—(ক) কর্পোরেশন প্রাদেশিক রাজস্ব কমান প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং প্রস্তাব করিতেছে যে রাজস্ব কমাইয়া কলিকাতার করবৃদ্ধি করা কখনই সম্ভবপর নহে। হাওড়া সেতু ও পোর্টট্রাষ্ট সম্বন্ধে কর্পোরেশনের সুপারিশ যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলেই কর্পোরেশন শতকরা সিকি ভাগ হারে কর বৃদ্ধি করিতে রাজি আছেন। (খ) কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বৃদ্ধির নামে আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত হাওড়া সেতু সম্বন্ধে সভায় আরও কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। লেঃ বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বলেন, অল্প মূল্যের সেতু হইলে সরকার উহার নির্ম্মাণ কল্পে কোন সহায়তা করিবেন না, সরকারের এই যুক্তি ছেলেমি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন অল্প ব্যয়ের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ ১৬ লক্ষের মধ্যে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করা আবশ্যক। মিঃ ষ্টুরার্ট স্মীথ বলেন, কর্পোরেশন সেতু কর্ত্তৃপক্ষ কমিটিতে বেশী আসন লইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন বোঝা কঠিন; কেন না প্রকৃতপক্ষে কাজ যাহা কিছু তাহা ইঞ্জিনিয়ারগণই করিবেন। বক্তা বলেন, হাওড়া সেতুর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিকতর। এই কার্য্যে আমাদিগকে অধিক মাত্রায় অর্থব্যয় করিতে হইবে। আর কিছুকাল আলোচনার পর প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আমাদের সহহোগী ‘আর্থিক উন্নতি’ ভারতে বীমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—১৯১২ সালের ভারতীয় বীমা-বিষয়ক আইনটা শোধরাইয়া নতুন আইন কায়েম করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিগত আগষ্ট মাস হইতে এই আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভার নিকট পেশ আছে। এই আইন পাশ হইলে কতকগুলা নতুন প্রণালীতে বীমা ব্যবসায়ীরা কার্য্য চালাইতে বাধ্য হইবে। (১) নতুন কোনো কোম্পানী স্থাপিত হইবামাত্রই তাহাকে গবর্মেণ্টের নিকট মোটা হারে টাকা কড়ি আমানত রাখিতে হইবে। এখনও আমানত রাখিতে হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য হার বাড়িয়া যাইবে। (২) আজকাল বিলাতী বীমা কোম্পানীর ভারতীয় শাখাসমূহ ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট টাকা জমা রাখিতে বাধ্য নয়, কিন্তু নতুন আইনে তাহারাও স্বদেশী কোম্পানীর মতনই বাধ্য থাকিবে। (৩) জীবনবীমা ছাড়া আগুন-বীমা, দৈববীমা বা অন্যান্য বীমা-ব্যবসায়ে যে-সকল কোম্পানী লিপ্ত, তাহাদিগকেও টাকা আমানত রাখিতে হইবে। আজকাল যে নিয়ম আছে তাহাতে একমাত্র জীবন-বীমা-ব্যবসায়ীরাই বাধ্য। (৪) বিলাতী বীমা-কোম্পানার ভারতীয় শাখাসমূহ এতদিন ভারত-সরকারের নিকট ভারতীয় ব্যবসা হইতে পাওয়া টাকার স্বতন্ত্র হিসাব দিত না। নতুন আইন তাহাদিগকে ভারতীয় বীমাকারীদের নিকট হইতে পাওয়া

টাকার পৃথক হিসাব রাখিতে এবং তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবে। (৫) জীবনবীমা এবং মজুরদের ক্ষতিপূরণ-বীমা এই দুই ব্যবসার জন্য প্রত্যেক কোম্পানী স্বতন্ত্র খাতা-পত্র রাখিতে এবং হিসাব প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) কোন বীমা-কোম্পানীর কাজ-কর্ম্ম অসন্তোষজনক হইলে তাহার দুয়ার বন্ধ করাইবার ক্ষমতা বীমাকারীদের হাতে কিছু কিছু থাকিবে। অধিকন্তু, জনগণের স্বার্থ-রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্টের একতিয়ার বাড়িয়া যাইবে। (৭) কোনো বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে তাহার ম্যানেজার, ম্যানেজিং এজেণ্ট বা অন্য কোনো উচ্চপদস্থ কিম্বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী কখনো কোনো কর্জ্জ লইতে পারিবে না। (৮) প্রত্যেক বীমা-কোম্পানী পাশ-করা “অ্যাকচুয়ারি” বা হিসাব-পরীক্ষককে দিয়া নিজ আর্থিক অবস্থা যাচাই করাইয়া লইতে বাধ্য থাকিবে। ভারত-গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে জীবন-বীমা-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দুই লাখ টাকা পর্য্যন্ত আমানত আদায় করিতে অধিকারী থাকিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদেশী কোম্পনীর শাখা সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটিবে। তবে যে-সকল কোম্পানী ভারতেই গঠিত হইবে,—সেইগুলা স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক,—এই দুই লাখ টাকা এক বৎসরের ভিতর পাঁচ কিস্তিতে দিতে পারিবে। কিন্তু প্রথম কিস্তিতে এক লাখ দিতেই হইবে। আজকাল যে নিয়ম আছে তাহাতে প্রথম কিস্তিতে পঁচিশ হাজার টাকা দিলেই চলে। আগুন, সমুদ্র, মোটরকার অথবা অন্যান্য বিষয়ে যেসকল কোম্পানী বীমা-ব্যবসা চালায়, তাহাদের নিকট হইতে গবর্মেণ্ট প্রত্যেক দফায় আমানত দাবী করিতে অধিকারী। এইখানে জানিয়া রাখা মন্দ নয় যে, বিলাতে যে আইন আছে তাহাতে গবর্মেণ্ট যে কোনো বীমা-কোম্পানীর নিকট হইতে ২০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ আড়াই-তিন লাখ টাকা পর্য্যন্ত আমানত দাবা করিতে অধিকারী।

দেশবন্ধুর পরলোকগমনের পর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল! সেদিনের কথা এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে, যেদিন দেশবন্ধুর শবদেহ দার্জিলিঙ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করা হয়। ইহার মধ্যেই একটা বৎসর কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গেল! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বর্ত্তমান থাকিলে এই এক বৎসরে দেশের কত কাজই না হইতে পারিত! স্বরাজ-লাভের পথে দেশ কতই না অগ্রসর হইতে পারিত! সি, আর, দাশের gesture লইয়া ভারতের এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ এবং বিলাতের বহু রাজনীতিক কতই না উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন! অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, মনে হইয়াছিল—ভারত-সচিব মহোদয় আমাদের হাতে চাঁদ ধরিয়াই দেন বা! কিন্তু ভগবান আমাদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ, তাই তিনি নিতান্ত অসময়ে একান্ত অকস্মাৎ তাঁহার প্রিয় সন্তানকে কাছে ডাকিয়া লইলেন—ভারত অনাথ হইল! চিত্তরঞ্জনের কত সাধের প্যাক্ট! এই প্যাক্টের কল্যাণে ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্যগণের ক্ষমতা কতই না বাড়িয়া গিয়াছিল! আর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আজ সেই প্যাক্টের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে—হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে কামড়া-কামড়ি করিয়া মরিতেছে। সি, আর, দাশ বর্ত্তমান থাকিলে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ কখনই বাধিত না; বাধিলেও, এতটা প্রবল হইতে পারিত না! তাঁহার ন্যায় চতুর, বহুদশা, সুবুদ্ধিমান রাজনীতিক কোন না কোন একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়া অঙ্কুরেই বিরোধের অবসান ঘটাইতে পারিতেন। তাই আজ তাঁহার বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিনে আমরা তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। আর কি তিনি বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া আসিবেন না? কিম্বা অপর কোন রাজনীতিক কি তাঁহার তুল্য মনীষার অধিকারী হইয়া বাঙ্গলা দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না?

নিরুদ্দেশের যাত্রী

শ্রীবীণাপাণি রায় (মিসেস্ এন্-সি রায়)

নীল-সায়রের ওই পারেতে বাস করে কোন্ সন্ধানী,
আড়াল থেকে দেখ্‌চে আমায় গোপনে,
কিসের ব্যথায় এমন ক'রে ভাঙ্‌চে আমার বুকখানি
দীর্ঘ বেলা কাট্‌চে শুধুই রোদনে ?
পথটি যে এই পায়ে চলার—ক্রমেই ধীরে বাড়্‌চে রে
বন্ধুর যে—বাজ্‌চে আমার চরণে,
লুকিয়ে থেকে মেঘের আড়ে দেখ্‌চে শুধুই হাস্‌চে যে
বাজে না তার প্রাণটি—আমার বেদনে ?
বাদল-সাঁঝে চায় বিরহী পেতে আপন বন্ধুরে—
কেয়ার বাসে মন্‌টি যে তার উন্মনা,
বন্ধু কোথায়—পাই না দেখা—বাস করে সে কোন্ দূরে
অকরুণের পায় সন্ধান কোন্ জনা ?
ঝর্‌চে বাদল আজ অবিরল নীপের বনে ঘুম-হারা
মিটিয়ে পিয়াস উল্লসিতা চাতকী,
আজ বকুলের গন্ধে—আমার প্রাণে কিসের দেয় সাড়া,
বাঞ্ছিতেরে সাম্‌নে আমার পাব কি ?
রইতে নারি, ভেঙে আগল বাহির হ'লেম পথটিতে
নিরুদ্দেশের পথের আমি যাত্রী গো ;
খুঁজ্‌বো তারে জীবন-পণে কেমন গো সন্ধানী সে
মান্‌ব না ওই নিকষ-কালো রাত্রি গো।
প্রাণের মাঝের বেদনগুলি ফুলের মত ঝর্‌চে যে,
কখনো কি পোড়্‌বে না তার চরণে ?
হোমানলের ভীষণ-শিখা প্রাণের তলে জ্বল্‌চে রে,
জ্বল্‌বে না সে সেই শিখারই দহনে ?
ওই যে অসীম গগন-তলে হাজার তারা উঠ্‌চে গো,
সেই দিঠি কি জ্বল্‌চে না তার মাঝারে ?
অশ্রু-সাগর মথন কোরে বিন্দুগুলি ফুট্‌চে গো,
গাঁথুন সাধে ধ'রবে না মোর মালা রে ?
সাম্‌নে যে ওই নীলাম্বুধি, রাত্রি এল ঘনায়ে
পার হব তায় একলা আমি কেমনে ?
এই ত ছিল তরী তোমার, ফেল্‌লে কোথা লুকায়ে
হেথা আমায় আস্‌তে দেখে গোপনে ?
নাই বা খেয়া রাখ্‌লে তুমি—আমার তরে যতনে,
ঝাঁপ দেব এই অতল সাগর-মাঝারে,
আজ্‌কে আমার প্রাণ মেতেছে পেতে অরূপ রতনে
শঙ্কা কিসের ?—ভাস্‌ব অকূল-পাথারে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস 'যুগমানব'; মূল্য—৩
শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় প্রণীত 'অগ্নিশিখা' ; মূল্য—১॥০
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'কাঁদিনী' ; মূল্য—১
শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ঘোষ প্রণীত 'পল্লীসতী' ; মূল্য—১
স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রণীত 'বর্ণাশ্রম' ; মূল্য—॥০
শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'নারীর ঠাকুর' ; মূল্য—১॥০
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মমতার ফাঁসি' ; মূল্য—১
শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বক্সী প্রণীত 'হিন্দুনারী' ; মূল্য—১।০
শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 'আফ্রিকার সর্পদেবতা' ; মূল্য—৸০
ও 'সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র' ; মূল্য—৸০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

দোটানা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেনচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.